পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

(নব পর্য্যায়)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৩৪৯
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক - শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

সপ্তম বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক।

কোচবিহার।

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

সপ্তম বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
অকাল বোধন (সন্দর্ভ)	শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৩১২
অভিনব চিকিৎসা	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন	৪৫
আ		
আত্মপ্রতি (গান)	স্বর্গীয় কবি চণ্ডীদাস বাগচী	২৮
উ		
উদ্বোধন (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৫
ক		
কদম্বমূলে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	১৩৯
কবি ও বাজীকর (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৩২৩
কবি নজরুল ইসলাম (কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকা দাসী	২৭৬
কলাবিদ্যা ও বস্তুতান্ত্রিকতা (সন্দর্ভ)	শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৬৯
কামিনীগাছের তলায় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র	৭৩
কিসের অভাবে এ দশা?	শ্রী —	৩১

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
	খ	
খদ্দরের উপায়	"নবসঙ্ঘ"	১০৪
	গ	
গান	৺রামনিধি গুপ্ত	১০৬
গান	দীনসেবক ব্রহ্মানন্দদাস	৩১০
গোপন না প্রকাশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ,	২০৬
গ্রন্থ-সমালোচনা	সহঃ সম্পাদক	১৮৯
	জ	
জন্মাষ্টমী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুকুমার ভাদুড়ী বি, এস-সি,	২৫১
	ঝ	
ঝড়ের রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন	৩৫
	দ	
দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ,	১৩, ২৮৯
	ধ	
ধর্ম্মভাব	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন	২২৮
	ন	
নামাঙ্কন (কবিতা)	শ্রীমতী রেণুকা দাসী	১৮
নারী-প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
নারীর কথা	শ্রীযুক্ত অশ্রুমান দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল,	৮৭
	প	
পতিত জার্ম্মেণীর শিক্ষা সংস্কার	শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ রায় এম-এ	২০৭, ২৬৯
পাথেয় (কবিতা)	সম্পাদিকা	২২৩
প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা কি দোষাবহ	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	১০১
প্রতীক্ষমানা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন	৩৭৮

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
প্রাচীন ভারতে মদ্যপান	শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	২৩৮
প্রেম-স্বপ্ন (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	১২৯
	ব	
বিরাট পুরে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	২৫৭
বিপন্ন (চিত্র)	শ্রী—	৩৬
ব্যায়ামের দুই চারিটি সঙ্কেত	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু	৪৭
	ভ	
ভক্তিমন্ত্র (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ,	২৮৬
ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬৩
ভুল-ভাঙ্গা (গল্প)	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র প্রসাদ বসু	৩১৪
ভ্রম সংশোধন	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৫২
	ম	
মরণ-আড়াল (উপন্যাস)	শ্রী—	৫৭, ১১৮, ১৭৭, ৩৮০
মায়ের ডাক	অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ,	৯১
মদ্যপান সম্পূর্ণ অবৈধ (প্রতিবাদ)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ	৯২
মোগল-সন্ধ্যা (নাটক)	শ্রীযুক্ত অশ্রুমান দাশ গুপ্ত এম-এ, বি-এল, ও শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,	৭, ১০৬, ১৬৭, ৩৫৯, ৩০৬
	র	
রক্তাম্বরা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী	৭৪, ১৪০, ২১৪, ২৭৮, ৩২৪
রবীন্দ্র সদনে	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম-এ,	৩৫৭
রাজতরঙ্গিণী (ইতিহাস)	শ্রী—	১৯, ৬৭, ১৫৭, ৩৪৬
রামায়ণের ধর্ম্ম (আলোচনা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বিএল,	২৯৬
	শ	
শরতের গান (কবিতা)	সম্পাদিকা	২৬৮

বিষয়।	লেখক, লেখিকা।	পত্রাঙ্ক।
শোক-সংবাদ	সহঃ সম্পাদক	১৮৯, ৩২২
	স	
সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'এক কথা	শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ	১৯৩
সাময়িক প্রসঙ্গ	সহঃ সম্পাদক	১২৩, ১৮৪, ২৫৪
সুখের দিনের শেষে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৩৫
সুরভিআশ্রম (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	২২৬
স্ত্রীশিক্ষা	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৫৫
স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	২৯, ১৫৪
	ক্ষ	
ক্ষণিক সঙ্গীত (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম-এ,	৩৬১

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল। | ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নারী-প্রসঙ্গ।*

বড় ধন্য হয়েচি যে তোমাদের নিমন্ত্রণ পেয়েচি। আমাদের দেশে সর্ব্বত্র নারীরাই আতিথ্য করেন। তাঁরাই বাইরের লোককে ঘরের লোক করে নেন। এই তো তাঁদের 'বরণ'। এই বরণ করেই তাঁরা সর্ব্বদা অপরিচিতকে ঘরের লোক করেন। এই বরণ বা গ্রহণ করার ব্রত নারীর। এই নগরে পুরুষবন্ধুরা আমাকে সম্মানের সহিত স্বাগত করেচেন তবু যেন আমি এতদিন ঘরের বাইরেই ছিলাম। তোমাদের অন্তঃপুরে, দেশের হৃদয়ের মধ্যে এতদিন আমি আসি নাই।

* করাচী নগরে নারীসভায় কবি রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

দেশের হৃদয়ের মধ্যে নারীর বাস। দেশ তার প্রীতির ও আত্মীয়তার নিবেদন নারীর দ্বারাই জানায়। আজ এই কথাই বুঝলাম। যাহার পূর্ব্বে, ঠিক এই নগর থেকে চলে যাবার সময়ে তোমরা আমাকে ঘরে গ্রহণের মঙ্গলাচরণ করচ এতে আমার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়েচে।

জানি তোমরা বক্তৃতা চাও না। প্রীতি ও সমাদরে তোমরা জানিয়েছ যে, আমি দেশের জন্য কিছু করেচি। তোমাদের সস্নেহ অভ্যর্থনায় বলেচ যে, আমি তোমাদের আপন ঘরের আত্মীয়-জন। তাই দেশ-মাতার অন্তঃপুরে তোমাদের কাছে ডেকে নিয়েচ। এইটাই কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, বিশেষতঃ অন্য প্রদেশের অন্য ভাষার ভাষী লেখকের পক্ষে এ অভাবনীয় সৌভাগ্য।

তোমরা আমার কাছে কিছু হিতকথা শুনতে চেয়েছ, হৃদয়ের ভাব আজ কেমন করে বল্‌বো তা তো বুঝতে পারচি না। নারীর প্রতি, সর্ব্বদেশের নারীর প্রতিই আমি বড় শ্রদ্ধা রাখি। আমার প্রেরণা চিরদিন নারীর কাছ হতে পেয়েচি। যাঁরা আমাকে পোষণ করেছেন, জীবন দিয়েচেন তাঁদের কাছেই আমি আমার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণাও পেয়েছি। এইজন্যই তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার এই নূতন আরব্ধ কাজেও দেশজননীদের কাছে এই প্রেরণা চাই। আমার কাব্যে সেই প্রেরণা প্রিয়জনের কাছে পেয়েছি। তাঁদের প্রীতিতে তাঁদের সেবায় প্রেরণা পেয়েছি।

এই যে নূতন কাজ হাতে নিয়েচি, ইহা তরুণ বয়সে লেখা সাহিত্য-সেবার কাজ নয়। আমার সাহিত্য বাংলাতে লেখা। তার সুকুমার সম্পদ অন্য ভাষাতে প্রকাশ করা যায় না। সেই ভাষায় চাবি বিনা এই রসের ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খোলে না। কাব্য অনুবাদ করা চল্‌তে পারে, তবে তার রমণীয় রস ও সুকুমার সৌন্দর্য্যের সম্পদ কখনই অনুবাদে আসে না। কাজেই বাংলা জানা ছাড়া আমাকে জানার অন্য উপায় নাই।

আমার এই নূতন (বিশ্বভারতীর) কাজে বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগের একটি ভাব আছে। বিশ্বজগতকে সেবা করবার এই সাধনা একলা আমার সাধনা নয়, ইহা সর্ব্বভারতের। বিশ বাইশ বৎসরের চেষ্টায় আমি একটি শিক্ষার তীর্থ রচনা করেছি। বহুকষ্টে বহুসাধনায় আমার অন্তরের সেই আকাঙ্ক্ষার যেন একটু চেহারা এখন দেখা দিয়েচে। আমার অন্তরের আদর্শটা ক্রমশ যেন প্রকাশ হয়ে আসচে। তাই বলছিলাম, এই কাজে দেশ-ভগ্নীদের কাছে প্রেরণা

চাই। ইহা যেন পুরুষদেরই সৃষ্ট না হয়। যদি আমার এই প্রস্তাবকে তোমরা যথার্থ ভারতীয় করতে চাও তবে এই সাধনাকে তোমরা নিজের সাধনা বলে গ্রহণ কর। এই ব্রতেও নারীর সেবার আবশ্যকতা সর্ব্বকাজে অনুভব করি।

যে-কোন সাধনাতে প্রেরণা-দানের শক্তিটি নারীর শক্তি। শিক্ষায় রাজনীতিতে নারীর অন্তরের প্রেরণা না পেলে কখনও শক্তি সত্য ও গভীর হয় না। আমি চিরদিন নারীর প্রেরণা পেয়েচি। আমার ভাগ্য ধন্য যে তোমাদের নগরে এসেও তোমাদের কাছ থেকে নতুন করে আমি প্রেরণা পেলাম।

এর অর্থ এ নয় যে সবাই তোমরা আশ্রমে এসে সাহায্য করতে পার। তবে আমার এই কাজে যদি যথার্থ প্রীতি ও শ্রদ্ধা তোমাদের থাকে, তবে তাতেই এই কাজ ধন্য হবে। অন্য সকল সেবকদের মধ্যে তোমাদেরই শ্রদ্ধা মূর্ত্তিমান হবে ও তাদের সেবায় দিনের পর দিন জোর দেবে। আমাদের সব অনুষ্ঠানেই নারীর কর্ত্তব্য, নারীর সাধনা অনেক পরিমাণে দরকার। সেইটে যদি বাদ পড়ে, শূন্য থাকে তবে অনুষ্ঠান একপেশে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার প্রাণশক্তি ফুটে ওঠে না। মানব-সভ্যতার সাধনা এত দিন পুরুষের সাধনা-মাত্র ছিল। কাজেই কেবল মাত্র পুরুষের সেবা পেয়ে এই সভ্যতার প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত, অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বর্ত্তমান সভ্যতা নারীর সেবা হতে বঞ্চিত এবং কেবল পুরুষের চেষ্টাজাত বলে তার মধ্যে লোভ, দম্ভ, নিষ্ঠুরতা এ-সবই দেখা দিয়েচে। আজ তাই সর্ব্ব জগৎ পীড়িত ও ব্যথিত। পুরুষ কেবল তন্ত্র ও যন্ত্র নিয়েই কাজ করে। ব্যক্তিদের দিকে চায় না। তাই শক্তি, লাভ, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র লক্ষ্যের কাছে এই "ব্যক্তিত্বকে" বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তিদের দুঃখ বোঝবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত হৃদয় পুরুষদের নেই। তারা বিচ্ছিন্ন আসমানী তত্ত্ব (abstract truths) মাত্র বোঝে। ব্যক্তিত্বের দরদ বোঝে না।

যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে থাকার দুঃখ, আমি বুঝতাম। সেখানে দুঃখ কিসের? স্কুলে বড় দুঃখ, কারণ তাতে ক্লাশ আছে, ব্যক্তিগত ছাত্র নাই। ফললোভী মাষ্টার ক্লাশ দেখেন, ছাত্র দেখেন না—ব্যক্তির দরদ বোঝবার হৃদয় স্কুলের নাই, কাজেই এই রীতি নিষ্ঠুর। আমি বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়ে স্কুল ছাড়লাম। স্কুল পুরুষের সৃষ্টি, ব্যক্তির হৃদয়ের দরদ বোঝবার শক্তি তার নেই।

সভ্যতার যন্ত্রের দরকার আছে, তবে তার ব্যক্তিগত দরদ বোঝবারও দরকার আছে। ব্যক্তিও যেন বাদ না পড়ে, এটাও তার বোঝা দরকার! আমি এই যন্ত্রের নিষ্ঠুরতা বুঝেচি; তাতেই আমার আশ্রমের সেবায় এই নারীর সেবাকে চাই। আমার কাজের হৃদয়ে তাঁদের চাই।

নারীর যে মহাশক্তি আছে, তা কেবল তাঁদের গৃহ সংসারই লুটে নিচ্চে, দেশ আর নারীর সেবাকে পাচ্ছে না। কাজেই বঞ্চিত দেশ দরিদ্র হয়ে গিয়েচে। হৃদয়ের রস ও কর্ম্মের শক্তি ঘরে ও সংসারেই রয়ে গিয়েচে। এই হেতু দেশ বড় দুঃখগ্রস্ত। নারী পিছে থেকেও প্রেরণা দান (iuspire) করে। এই প্রেরণার অভাব হলেও সেই অভাব সব সময় পুরুষরা বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু সব কাজেই তারা শক্তিহীন হয়ে আসে। তাই তো দেশের কাজে শক্তি হচ্চে না।

এই জন্যই আমি চাই আমার কাজ নারীরা নিজের বলে গ্রহণ করুন। আমি সহর থেকে সহরে যাচ্চি, পুরুষদেরই বলচি। নারীদের বল্‌তে পারচি না কোথায় নারীরা, কোথায় বোনেরা আজ তোমাদের যদি বা পেলাম, কিন্তু তোমারে কাছে হৃদয় প্রকাশ করবার মত ভাষা কই? এই যে ইংরাজীতে তোমাদের কাছে বলচি এই ভাষা না—তোমাদের, না—আমার তবু তোমাদের সামনে যে এসেচি এও ঢের। এই অতিথিকে কখনও তোমরা ভুলবে না, এই আশা মনে রাখি।

আমার কথার উপসংহারে পুরাণের একটা গল্প বলি। নারী পত্নী-সাবিত্রী তাঁর স্বামী সত্যবানকে মৃত্যুলোক হ'তে ফিরিয়ে আনেন। একথা সত্য যে আমাদের দেশ যুগ যুগ ধরে মৃত্যুগ্রস্ত। সত্য-সাধনা যে নেই। নানা মৃত আচারে, অনুষ্ঠানে ভিতরের সত্য চাপা পড়ে গিয়েচে। আজ সত্য দেখাই যায় না। ঋষিদের লক্ষ্য ভুলে গিয়েচি, ভারত তার সত্য হারিয়েচে। তোমরা এই দেশের কন্যা আমাদের ভগ্নী ও মাতা। তোমরা সাবিত্রী তোমাদের শ্রদ্ধাতে, সাধনাতে ও তপস্যাতে ভারতের সেই গভীর জীবনকে, সত্যকে বাঁচাও। সরল প্রেমের জোরে সত্যকে, সাধনাকে মৃত্যুর দ্বার হতে ফিরাও। নূতন জীবন তাকে দাও। আমরা পুরুষেরা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে তার বিরাট প্রকাণ্ড পার্থিবতার মোহে মুগ্ধ হয়েচি। তাই সত্য লাভে বড় বাধা হয়েচে।

তোমাদের মিনতি সরল শ্রদ্ধায় তোমরা ভারতের সনাতন সত্য-সাধনার নূতন জীবন দাও। গভীর অধ্যাত্ম জীবন (spiritual life) দিয়ে সাধনার জীবনকে বাঁচাও। এই পার্থিব শক্তির পদদলন থেকে আমাদের দেশের সাধনাকে রক্ষা কর। অন্ততঃ ভারত একমাত্র সেইরূপ দেশ হোক, যেখানে আত্মার সত্য পার্থিব সত্য হতে বড়। লোভ, অতি-উৎপাদন, নিষ্ঠুরতা-জর্জ্জরিত, বৈষয়িক-বুদ্ধি-কলুষিত, জরা-জীর্ণ, বিশ্বাসহীন জগৎকে শ্রদ্ধার দ্বারা, আশার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা বাঁচাও। শ্রদ্ধাতে সাধনার জীবনকে জাগ্রত রাখ।

পরের অনুকরণ, স্বার্থান্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, প্রতিদিন আমাদের দুর্ব্বল করেচে। তাদের সভ্যতার সুরা পান করে কেমন মত্ত হয়েছি তা দেখলে ভবিষ্যতের জন্য নিরাশা ও অবসাদ আসে। জানি এই দুর্গতি আসবে ও যাবে, তোমরা যদি তোমাদের তপস্যার জ্যোতি দাও, তোমাদের শ্রদ্ধার জীবন দাও, প্রাচ্যের আত্মাও জাগ্রত হবে। আমাদের মৃতপ্রায় আচার, ভারগ্রস্ত সত্য, তোমাদের সাধনার বলে প্রকাশিত হবে। নিত্যসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আবার জাগবে। তোমরা জীবন দাও, যাতে ভারতের যথার্থ জীবনের প্রকাশ হয়। যাতে দুর্ভিক্ষগ্রস্থ, ক্ষুধিত, তৃষ্ণিত, আহত প্রতীচ্য এদেশে এসে এই প্রাচ্যের সাধনার আশ্রমে জীবনে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে।

'শ্রেয়সী'।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

উদ্বোধন।

—:০:—

চির সুন্দর হে

জাগো !

মম বিরহ বেদন অবসানে।

চপল কানন বীথি,
আকুল মিলন গীতি,
সজল নয়ন নিতি
ছল ছল অভিমানে ;
শিথিল কবরী পাশ,
মলিন নিচোল বাস,
ব্যথিত নীরব ভাষ
কেঁদে ফিরে সারাপ্রাণে।
চির বাঞ্ছিত হে
জাগো !
মম মরম মুখরি' গানে গানে।
বাসক শয়ন পাতি'
কুসুম মালিকা গাঁথি'
জাগিয়া কাটাই রাতি
চেয়ে চেয়ে আঁখি পানে ;
যামিনী বহিয়া যায়,
মালিকা শুকানো হায়,
কাঁদিয়া দখিন বায়
কত ব্যথা বহি আনে !

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

মোগল-সন্ধ্যা।

—:০:—

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র সময়—স্তিমিত জোৎস্নালোক

জাহান, হামিদ খাঁ ও আহত আজীম।

জাহান। হামিদ, যুদ্ধক্ষেত্র আজ কি ভয়ানক দেখাচ্ছে! অনেক যুদ্ধ জয় করেছি, যুদ্ধক্ষেত্রও অনেক দেখেছি, কিন্তু এত রক্তের খেলা ত কোন দিনই দেখি নি। রাজপুত সৈন্যের বীরত্ব চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্য যে এত নির্ভিক সে ত জানতম না। একটী সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেনি—মৃত্যুকে সমস্ত আকাঙ্খার সঙ্গে বরণ করেছে। হামিদ, ঐ শোন কোন্ আহত সৈন্যের আর্ত্ত চীৎকার। মুমূর্ষুর কাতরতা থেকে থেকে এ ভীষণ রাত্রির নীরবতায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। উঃ কি ভীষণ, আকাশে নিশ্চল তারাগুলি আগের মতই মিটি মিটি হাস্‌ছে। নিথর আঁধার স্থানে স্থানে কালো হয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে আর নদী সেই পুরাতন কল্ কল্ স্বরে বয়ে চলেছে।

(একজন সেবাব্রতচারীর প্রবেশ; সঙ্গে জলপূর্ণ চামরার থলে)

কে তুমি যুবক এ আঁধারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুড়ে বেড়াচ্ছ?

হামিদ। নিশ্চয়ই চোর, শাহজাদা! মৃত সৈনিকদের সম্পত্তি চুরি কর্ত্তে এসেছে।

যুবক। আমি চোর নই—স্বামী প্রেমদেবের শিষ্য। তার সঙ্গে এ যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা কর্ত্তে এসেছি।

হামিদ। তবে তোমার হাতে ওটা কি?

যুবক। এর ভেতর জল।

জাহান। হামিদ, নিজের কলুষিত মনের আলোকে জগতটাকে দেখ না। যাও যুবক তোমার কাজ কর।

চন্দ্রের আলায় ঐ বেদনা কাতর মুখখানা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। হামিদ দেখে এসো ও মোগল না বাঙ্গালী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

(হামিদের অগ্রসর হওন ।)

হামিদ। তাইত, এ যে শাহজাদা আজিম।

জাহান। (ছুটিয়া গিয়া) কি! দাদা আজিম! হামিদ, এখনও জীবন আছে, শীঘ্র শিবির হতে আলোক ও পাল্কী নিয়ে এস।

(হামিদের প্রস্থান)

(উচ্চৈঃস্বরে) দাদা! দাদা! (ঝুঁকিয়া পড়িয়া)

আজিম। কে? সি-য়া-র

(আজিমের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু)

জাহান। (উপবেশন) একি হল, হায় আর ত নিঃশ্বাস পড়ছে না (নাকে হস্তার্পণ করিয়া) প্রদীপ নিভেছে—একটুখানি দীপ্ত দেখিয়ে চির আঁধারে ডুবে গেল।

(আজিমের মস্তক অঙ্কে স্থাপন করে)

দাদা, ক্ষমা চাইবার অবসরটিও আমায় দিলে না? এ আমারও ঠিক্ শাস্তি। আজ চোখে জল আস্‌ছে না, কেন আসবে? স্নেহ, দয়া, ভালবাসা এ জগতে আর কিছুই নেই—আছে শুধু পর্ব্বতের মত প্রকাণ্ড লোভ। ছোট বেলায় সিয়ার আর আমি তোমার কাছে বসে কত খেলাই খেলেছি, কত স্নেহই তুমি করেছ কিন্তু সব ভুলে গিয়ে যুদ্ধে এসেছিলাম। তাই খোদার এই কঠোর বিধান।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ, আর কিছুই দরকার নেই, সাঁজের মেঘের কোলের বর্ণরাগ, প্রভাতের গরিমা আজ ঝরে গেছে; দাদা, দাদা! ক্ষমা করো। মৃত্যুর পরে যদি জীবন থাকে সেখান থেকে তোমার ছোট ভাইটিকে ক্ষমা পাঠিয়ে দিও।

(পটনিক্ষেপন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল উদ্যানবাটিকা। কাল—অপরাহ্ন।

ফরাকসিয়ার ও জুলেখা দণ্ডায়মান।

জুলেখা। কার কথা ভাবছিলে, সিয়ার! বল না, আমি কখনো রাগ করবো না; বল তোমার পায়ে পড়ি।

সিয়ার। তুমি রাগ কর্লে ত আমার বয়ে ভারী বয়ে যাবে। আমি কেন বল্‌ব—কি সুন্দর তার কালো কালো দুটো চোখ——

জুলেখা। থাম, থাম, আর তোমার বল্‌তে হবে না। আমি সব বুঝেছি, আমায় ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে—ক'দিন হতে দেখছি তোমার মুখে হাসি নেই, কেবল ভাবনা, সত্যি করে বল।

সিয়ার। হাঁ সত্যি করে বল্‌ছি—ঢেউ খেলানো মিশ্‌মিশে কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা চুল।

জুলেখা। বেশ বলে যাও।

সিয়ার। টুকটুকে গালের উপর কালো তিলটী ছোট্ট একটুকু।

জুলেখা। ভারি দুষ্টু তুমি, সোজা করে বল্লেই হোত আমাকে ভাবছিলে। আচ্ছা, সিয়ার! বাবা বল্‌ছিলেন তুমি বাদশা হবে, বাদশা' হলে তুমি ভালবাস্‌বে তো?

সিয়ার। তুমি যে তখন আমার বেগম হবে, তোমায় কি না ভালবেসে থাকতে পারি জুলি!

জুলেখা। শুনেছি বাদশা'দের অনেকগুলো করে বেগম থাকে—আমি যেমন পায়রা পুষেছি, কারো নাম মতি, কারো নাম চুনী, কারো নাম বা হীরে ঠিক তেমনি বাদশারা সুন্দর মেয়ে ধরে এনে বেগম-মহালের খাঁচায় অনেক বেগম পোষে, একি সত্যি সিয়ার?

সিয়ার। হাঁ সত্যি।

জুলেখা। তবে তুমিও বাদশা' হয়ে ওরকম অনেক বেগম পুষবে, নয়?

সিয়ার। (একটু কৌতুকের হাসি হা'সয়া) নিশ্চয়ই।

জুলেখা। যাও, তবে আর আমি তোমার বেগম হচ্ছিনা। যদি প্রতিজ্ঞা করো যে তোমার বেগমমহাল শুধু আমার রূপেই আলো পাবে তবেই আমি তোমার বেগম হতে স্বীকার করব। তা ছাড়া কখ্‌খনো না।

সিয়ার। জুলি, তুমি বুঝি ভাব তুমি খুব সুন্দরী।

জুলেখা। হাঁ ভাবি বৈ কি? আগে ভাবতুম না। তুমি যেদিন থেকে আমায় ভালবাস্‌তে সুরু করেছ ঠিক্ সেদিন থেকে।

সিয়ার। কেন?

জুলেখা। বাঃ বেশ, এও তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে তুমি যে ভারী সুন্দর, যারা নিজে সুন্দর তারা সুন্দরীকেই ভালবাসে।

সিয়ার। ও তাই তুমি বড় ভুল করেছ। আমি তোমার চোখে সুন্দর হতে পারি কিন্তু সকলের চোখে নয়।

জুলেখা। আলবৎ সকলেরই চোখে। যে বলবে না, তার চোখ নেই—থেকেও নাই।

সিয়ার। তোমার কথামত যারা কুৎসিত তারা কুৎসিতকেই ভালবাস্‌বে না?

জুলেখা। সে কেন হতে যাবে। সুন্দরকে যে সবাই চায়। সুন্দর যারা তারাও চায় আর কুৎসিত যারা তারাও, তবে যারা সুন্দরী তারাই শুধু সুন্দরদের পেয়ে থাকে।

সিয়ার। বেশ, তোমার আগেকার কথার সাথে পরের কথায় মিল রইল কোথায়? সব ভুল করে ফেলেছ।

জুলেখা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কর্‌তে চাই না। বেশ ত আমায় যদি সুন্দরী বল্‌তে তোমার ইচ্ছে না হয় তবে নাই বা বল্‌লে।

সিয়ার। নিশ্চয় বল্‌ব তুমি সব চাইতে সুন্দরী। জুলি, সৌন্দর্য্য আমার কাছে শুধু দেহের রূপ নয় সে যে একটা ভাব প্রতি অঙ্গে অঙ্গে যে ভাব ফুটে উঠেছে।

জুলেখা। বাঃ আমি একটা ভাব?

সিয়ার। জুলি, সত্যই তুমি এটা ভাব। ঐ যে রাজমহলের শীর্ণ গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে বক্ষের উপর বসন্তের মত নিঃশ্বাস সম্রাড়িত ক্ষীণ তরঙ্গের কম্পন-রেখা ধারণ করে পর্য্যন্ত

অপ্রগল্‌ভ সৌন্দর্য্য শান্তি, মহিমায় করুণ ওর মধ্যে যে ভাব তোমার মধ্যেও সেই ভাব। শীতের কুহেলিকাজাল যখন পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ভেসে যায়, ধরিত্রী মুখখানি পবিত্র, মৌন, রিক্ত সৌন্দর্য্যে ভরে ওঠে সেই রূপের সঙ্গে তোমার রূপ এক সুরে বাঁধা। জুলি, তোমার এই স্নিগ্ধ ভাব-সুষমাই আমার চোখে তোমায় সুন্দর করেছে।

জুলেখা। বেশ তুমি ত এক নিঃশ্বাসে একটা প্রকাণ্ড রকমের বক্তৃতা করে ফেল্লে, এর পাল্টা জবাব দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। এত মুখের জোর আমার নেই আর এতক্ষণ দম আটকিয়ে রাখ্‌তেও আমি পারব না। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখি—ঐ যে সাগর আপনার বিশাল উন্মুক্ত বক্ষ বিস্তার করে নব বধূর মত মৃদুগুঞ্জনা, কম্প্রচরণ গামিনী প্রেয়সী গঙ্গাকে নীরবে ডাক্‌ছে সেই স্থির সাগরের মত হবে তুমি। কেমন হয়েছে ত?

সিয়ার। বাঃ বেশ বলছে, তুমিও যে কবি হয়ে উঠ্‌লে।

জুলেখা। পরশ পাথরের স্পর্শে যেমন সব সোনা হয়ে যায়।

সিয়ার। পরশ পাথর কে? তুমি না আমি? আমি ত আগে কবি ছিলুম না তুমিই আমার প্রাণে সুরের আগুন জ্বেলে দিয়েছ। জুলি, এখানে এসে ঐ দেখ পশ্চিম আকাশে কেমন রঙের খেলা। একের পর আর এক রঙ্গ পাপ্‌ড়ীর মত যেন ঝরে পড়ছে আবার কখনও বা সকল রঙ্ মিশে একই সঙ্গে ফুটতে চাচ্ছে। এ যেন একটা সঙ্গীত 'সা' থেকে 'নি' পর্য্যন্ত প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ্বনিত হয়ে পরে একই সঙ্গে ঝঙ্কৃত হবার প্রয়াসী। জুলি, একটা গান গাইবে?

জুলেখা। তুমি যখন বল্‌চ তখন নিশ্চয়ই গাইব।

(গীত)

কি গান তোমার কণ্ঠে বাজে কোন্ তানে।
ক্রন্দন উঠে গুঞ্জরী নব যৌবন অবসানে॥
বেদনা-ব্যাকুল হৃদিটী বয়ে যায় কত দূর।
মায়াল মরণ চাও গাহিয়া ঐ সে করুণ সুর॥
ঘন নির্ঝর বাদলের গান শোনালে গোপন স্বপনে।
ব্যথা তোমার কম্বে কিগো মিলিয়ে যাবে কলতানে॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠস্থ প্রবেশদ্বার। কাল—প্রভাত।

আহান হামিদ খাঁ ও রুস্তমদিল খাঁ দণ্ডায়মান।

আহান। হামিদ, নগরের তোরণ দেশে ত একটা লোকও দেখ্‌ছি না।

হামিদ। তাই ত, সব গেল কোথায়? এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করে আসলেন, জনাব, আর একটা প্রাণীও আজ আপনাকে অভিবাদন কর্ত্তে আসে নি। সব বেয়াদব; নেমখারামের দল।

আহান। ঐ দেখ নগর যেন এ কয় দিনের কিসের উৎসবে মত্ত হয়ে আজ তন্দ্রাহত হয়ে পড়েছে। তোরণ দ্বারের ফুলের মালাগুলি শুকিয়ে গেছে, কত প্রমোদ রজনীর জাগরণে সুদৃশ্য প্রাসাদগুলির শোভা যেন একটু মলিন, পরিচিত আভরণগুলি যেন স্বস্থানচ্যুত, রাজপথ জনহীন, ব্যপার কি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, হামিদ।

হামিদ। ব্যপার আর কি বুঝ্‌তে চান, সংসারের যে ব্যপার চিরকাল ঘটে থাকে এখানেও তাই ঘটেছে।

রুস্তম। মনে হয় কারও যেন অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে—

আহান। অভিষেকোৎসব? কার হবে!

হামিদ। ঐ যে সেনাপতি জুলফিকার আসছে এবার সব খবরই পাবেন।

জুলফিকার। বন্দেগী শাহজাদা!

আহান। বন্দেগী জুলফিকার খাঁ।

জুলফিকার। শাহজাদা! যুদ্ধে ত আপনার কোন অস্ত্রাঘাত লাগে নি।

আহান। না সেনাপতি, আপনাকে ধন্যবাদ।

জুলফিকার। কি হামিদ, তোমাকেও যে অক্ষত দেখছি আমি যে কৌশলটা শিখিয়ে দিয়েছিলাম সেইটেই বোধ হয় অবলম্বন করেছিলে?

আহান। ক্ষমা করবেন, জুলফিকার খাঁ। আপনার উপদেশ মত কাজ করবার সুবুদ্ধি আমাদের হয় নি। হামিদ বলছিল বটে।

জুলফিকার। আমি উপহাস করে শুধু ওকথাটা হামিদকে বলেছিলুম।

জাহান। এ যে আপনার উপহাস মাত্র তা আমি বেশ জানি। (স্নেহ জড়িত-স্বরে)

জুলফিকার। কি রুস্তম যে।

রুস্তম। হাঁ খাঁ সাহেব আবার আপনাদের দেখতে এসেছি।

জুলফিকার। হামিদ! যুদ্ধ হতে ফিরে আসলে পর আপনার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হবার কথা ছিল।

জাহান। হাঁ কিন্তু সে আপনাদের মরজী।

জুলফিকার। শাহজাদা জাহান্দার রাজ্যে প্রচার করে দিয়েছেন যে তিনিই এখন মোগল-সাম্রাজ্যের একমাত্র সম্রাট তাই আপনার অভিষেকের পরিবর্ত্তে গত—পরশুদিন তাঁরই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছে, আর বর্ত্তমান দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হলেন ইমতিয়াজ বেগম।

হামিদ। কে? সেনাপতি?

জুলফিকার। সেই—বিখ্যাত গায়িকা অপূর্ব্ব-সুন্দরী বাইজী লালকুমারী।

(হামিদ এই কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল)

শাহজাদা সম্রাটের আদেশে এ খবর জানাবার ভার আমার উপরেই পড়েছে। কিছু মনে মনে করবেন না আমি শুধু সম্রাটের আদেশ পালন করলুম।

জাহান। (দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া)

জুলফিকার খাঁ! দেখুন দেখি ভ্রাতৃরক্তে এ হাত কতটা কলঙ্কিত হয়েছে? অবাক হয়ে রইলেন যে, দেখুন!

জুলফিকার। শাহজাদা আমার কোনই দোষ নেই মনে কিছু করবেন না।

জাহান। মনে আর করব কি! এ অভ্যর্থনাই আমার উপযুক্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জুলফিকার খাঁ! এ মুখোস আপনি কবে ছাড়বেন? বয়স ত আপনার কম হয় নি। আমায় ভাঁড়াবার চেষ্টা বৃথা। আমি জানি আপনার যথার্থ রূপটা কি ঘোর কুৎসিত, কি বীভৎস! সেই বীভৎসতাটাকে আপনি আরও বাড়িয়ে তুলছেন আপনার ঐ ছিন্ন সছিদ্র ছদ্মবেশটা পরে'।

জুলফিকার। শাহজাদা! সম্রাটের আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম—

জাহান। মিথ্যা কথায় ঐ জায়গার বাতাসটাকে আর কলুষিত করবেন না। সম্রাটের আদেশ পালন আপনার ধর্ম্ম—! তবে বাহাদুর বাদশার আদেশটা রক্ষা করা ধর্ম্ম বলে মনে হয় নি কেন?

জুলফিকার। আপনাদেরই মঙ্গলের জন্য।

জাহান। আমাদের মঙ্গলের জন্য? যা করেছ সবই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। সাপের মত খল, ক্রুর, বিশ্বাসহন্তা! তোমাকে জাহান্দার বাদশা চিনে নি কিন্তু জাহান চিনেছে।

জুলফিকার। (রাগতঃ স্বরে) শাহজাদা!

জাহান। আমার সম্মুখ থেকে এখনই তুমি চলে যাও। তোমার মত হীন, ঘৃণিত, নরপশুর রক্তে এ তরবারি কলুষিত করতে চাই না—সে জন্যই এতক্ষণ সহ্য করে আছি।

জুলফিকার। উদ্ধত যুবক! তোমার পতনের আর বেশী দেরী নেই। এসো হামিদ!

হামিদ। আদাব শাহজাদা!

জাহান। যাও, হামিদ! তোমাদের একই সঙ্গে থাকা উচিত। কিন্তু মনে রেখো হামিদ! যে পথে চলেছ সে পথে কখনই তোমার মঙ্গল হবে না।

(জুলফিকার ও হামিদের প্রস্থান)

জাহান। রুস্তম, আমি মিথ্যা প্রলোভনে পড়েছিলাম। সাফল্যের মোহ আমার চোখের সামনে সুখের মরীচিকা সৃষ্টি করে—আমার কত নীচে নাবিয়ে নিয়ে গেছে। আমার মতিভ্রম হয়েছিল—যার স্নেহের অঙ্কে আমার শৈশবের সুখের দিনগুলি কেটে গেছে—স্নেহশীল দাদা আজিম! তোমায় কি না জীবনের ওপারে মৃত্যুর দেশে রেখে এলুম। রুস্তম! মিথ্যাকে জীবনে বরণ করেছিলাম তাই এ শাস্তি আমার যথার্থ পাওনা—এ আমার যথার্থ পুরস্কার!

পটপরিবর্ত্তন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী প্রমোদ ভবন। সময়—রাত্রি।

লালকুমারী, জাহান্দার, জুলফিকার খাঁ ও হামিদ খাঁ।

লালকুমারী। আমার সব সাধ পূরেছে—বন্দিজা ছিলুম, বেগম হয়েছি। লালকুমারী আজ বেগম, না কে সেই লালকুমারী, সে ত মরেছে। আমি আজ দিল্লীর সম্রাজ্ঞী ইমতিয়াজ। এখন কিছু দিন ধরে দুনিয়াটাকে শাসন করতে হবে, দেখব কে আমার ক্ষমতাটাকে বাধা দেয়। যে বাধা দিতে আসবে মৃত্যুদণ্ড তার মাথার উপর আকাশের বাজের মত অকস্মাৎ ভেঙ্গে পড়বে। এ সাম্রাজ্যে শুধু একটা আইন আমার হুকুম। আমার হুকুমে লোক বসবে আর আমার হুকুমে দাঁড়াবে। জুলফিকার খাঁ! তুমি ভেবে দেখেছ যে জাহান্দার বাদশা প্রেমের স্রোতে ভেসে চলবে—আর এ দুনিয়াটার কর্তৃত্ব তুমি করবে। হাঁ জাহান্দার বাদশা ভেসে চলবে বৈ কি যত দিন আমার এ যৌবন আর এ রূপ। কিন্তু ইমতিয়াজ বেগমকে ভুলিয়ে রাখবে কি করে? সে অনেক দিন লক্ষ্য করেছে তোমার ঐ ভাণকরা সরলতার দৃষ্টির আড়ালে একটা ধারাল ছুরি ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। তোমারি সাহায্যে সিংহাসনটাকে দৃঢ় করে তারপর তোমায় একদিন নিপাত করব—তবেই আমি ইমতিয়াজ বেগম।

(জাহান্দারের প্রবেশ)

জাহান্দার। ইমতিয়াজ তোমার ঐ দেহটাকে ঘিরে কি আগুণ জ্বালিয়ে রেখেছ—ও আগুণে যে আমার সব পুড়ে গেছে। আমার কত কালের সাধনা, আমার কত সাধের ধর্ম্ম চিন্তা ভাব সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ইমতিয়াজ। নাথ! এ ভাবনা আজ তোমার এল কেন?

জাহান্দার। তাই ত, এ ভাবনা আজ ভাবছি কেন? এ যে অতীতের সুর। অতীতকে চোখের সামনে হতে একেবারে মুছে ফেলেছি এখন শুধু আমার একমাত্র সত্য সুন্দর বর্তমান। অগাধ অনন্ত সমুদ্রের জ্যোৎস্না হিল্লোলের হাসিটুকু নিয়ে বর্তমানের চিরচঞ্চল ঢেউগুলি হৃদয়কূল আঘাত করে' যেমন আঁধারের দেশ হতে এসেছিল তেমনি আবার ছায়ার দেশে চলে যাচ্ছে। ইমতিয়াজ! তোমায় ছেড়ে যখন দূরে থাকি তখনই

এ দুর্ভাবনাগুলি আমায় চেপে ধরে—আবার তোমার কাছে এলেই সব ভুলে যাই—কত সুন্দর তুমি!

ইমতিয়াজ। হাঁ আমি আবার সুন্দর! তোমার বর্ত্তমান কত সুন্দর।

জাহান্দার। অভিমানিনি! আমার বর্ত্তমান তুমিই সৃষ্টি করেছ; তোমার ঐ অপরূপ রূপের নিত্য নবীন উন্মেষে আমার কামনার দীপ সহস্র শিখায় জলে উঠছে,' রূপে এত জ্বালা, ভোগে এত অতৃপ্তি। ইমতিয়াজ! আমায় সব ভুলিয়ে দাও স্মৃতির দাহন থেকে আমায় মুক্ত করে' জগৎটাকে আমার বেফাঁক করে দাও। পারবে?

(জুলফিকার খাঁ ও হামিদ খাঁর প্রবেশ ও কুর্নিশ করিয়া অবস্থান)

ইমতিয়াজ। কি জুলফিকার খাঁ! খবর কি?

জুলফিকার। আজাম এসেছে।

ইমতিয়াজ। তাকে খবর দিয়েছ?

জুলফিকার। হাঁ সম্রাজ্ঞী! কিন্তু.........

ইমতিয়াজ। "কিন্তু" বলে—কথা শেষ না করেই থেমে পড়লে যে? বল খবর পেয়ে তার ভাবটা কি রকম হয়েছিল?

জুলফিকার। বড় সুবিধার নয়। তার ভাবে বোধ হল যেন সে বিদ্রোহ করবে। কি বলো হামিদ!

হামিদ। হাঁ...না...তবে একটা গোলযোগ যে ঘটবে সে নিশ্চয়।

জুলফিকার। সে নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্র করে' দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে চেষ্টা করবে।

জাহান্দার। না জুলফিকার খাঁ! আজাম আজান যদি কিছু করে সে ষড়যন্ত্র নয়, প্রকাশ্য যুদ্ধ।

ইমতিয়াজ। সে একই কথা সম্রাট!

জুলফিকার খাঁ! যাও আজানকে বন্দী করো; আমার হুকুম শীঘ্র তাকে বন্দী করো।

জুলফিকার। সম্রাজ্ঞীর আদেশ শিরোধার্য্য,—চলো হামিদ!

(কুর্নিশ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ)

জাহান্দার! জুলফিকার খাঁ, দাঁড়াও।

লালকুমারী। কেন, বাদশা।

জাহান্দার। একটু ভেবে নি।

ইমতিয়াজ। ভাবনার এতে কিছুই নেই সম্রাট! সিংহাসনকে দৃঢ় করতে হলে রক্ত দিয়ে মাটী ভেজাতে হবে—যাও জুলফিকর খাঁ! দাঁড়িয়ে রইলে যে এখনি যাও, হুকুম পালন কর।

(জুলফিকার ও হামিদের প্রস্থান)

জাহান্দার। ইমতিয়াজ!

ইমতিয়াজ। কি সম্রাট?

জাহান্দার। সম্রাট! ইমতিয়াজ! সম্রাট!

(অবরুদ্ধ রোষে প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। হুকুম দেবার কি নেশাটাই আজ আমায় চেপে ধরেছিল—একটু বেশী দূরে চলে গেছি বোধ হয়। না, ঠিকই করেছি। এ সিংহাসন আমায় রক্ষা করতেই হবে,—যখন বেগম হয়েছি এ যেন দু'দিনের খেলা হয়ে দু'দিনেই না ফুরিয়ে যায়।

পটক্ষেপণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নামাঙ্কন।

—:•:—

দেশ বিদেশে যখন গেছি যেইখানে
নামটী তোমার লিখেছিলাম সেইখানে—
লতায় ঘেরা খসরুবাগের মন্দিরে
নামটী তোমার ক'রেদিছি বন্দী রে।

শাঁরদীয় পূর্ণিমার এক পক্ষতে
লিখেছিলাম যমুনারই বক্ষতে
জলের বুকে জলের লেখা অক্ষরে
নামটী লিখি—এমন নহি দক্ষ রে!

নব নীপের তরুণ শাখের অঙ্কেতে
লিখেছিলাম নামটী তোমার সঙ্কেতে;
কেউ হেসেছে—কেউ বলেছে মন্দ রে—
তবুও লেখা হয়নি আমার বন্ধরে।

প্রণয় যেথা মূর্ত্তি ধরি' মর্ম্মরে
প্রচার করে বিশ্বপ্রেমের ধর্ম্ম রে;
পঞ্জীভূত প্রণয় যেথা নিশ্বাসে—
নামটী তোমার লিখি সেথায় বিশ্বাসে।

"যদি কোথাও স্বর্গ থাকে সংসারে
এইখানেতে—নয়কো কোন দূরপারে"—
স্বর্গ এমন বিশ্বমাঝে যেইখানে
যত্নে লিখি নামটী তোমার সেইখানে।

সাগর কূলে যেথায় ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী
বৃথাই গেছে পরশমণি অন্বেষি—
বিজন বেলা-ভূমির প'রে নির্জ্জনে
নামটী তোমার লিখেছিলাম একমনে।

বিশ্ববুকে যে নাম তোমার অঙ্কিত
হৃদয় তারে সে নাম সদাই ঝঙ্কৃত—
গানটী যবে থামবে হৃদি-যন্তরে,
নামটী রবে বিশ্ব বুকের অন্তরে।

শ্রীরেণুকা দাসী।

রাজতরঙ্গিণী।

—:০:—

গোনন্দের পর বিভীষণ (প্রথম) ৫৩ বৎসর, ৬ মাস (কাশ্মীরে) রাজত্ব করেন। তৎপর ইন্দ্রজিৎ ও তাঁহার অভাব হইলে, তাঁহার পুত্র রাবণ সিংহাসনারূঢ় হন। রাবণের স্থাপিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই লিঙ্গ বিবিধ চক্র পরিশোভিত এবং মন্দিরাভ্যন্তরে স্থাপিত। লিঙ্গ দেব ভবিষ্যত বাণী, প্রত্যাদেশপরায়ণ। রাবণ রাজ তাঁহার সমগ্র বিষয়-সম্পত্তি ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাবণ ও তদীয় পিতার রাজ্যকাল ৩৫ বৎসর ৬ মাস।

তৎপর রাবণের পুত্র বিভীষণ (দ্বিতীয়) ৩৫ বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন।

বিভীষণ লোকান্তরিত হইলে তদীয় পুত্র নর (১ম) রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গলার্থ যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বিচার শক্তির অভাবে, প্রজাবর্গের অশেষ দুঃখের কারণরূপে পরিণত হইয়াছে। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার প্রাসাদ সন্নিকটে বাস করিত। পাপাত্মা তাঁহার রাণীকে মোহজালে আবদ্ধ করিয়া রাণী সহ পলায়ন করে; রাজা এই ব্যাপারে এরূপ মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ধর্ম্মালয় ভস্মসাৎ না করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন না। কাশ্মীর হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণকে চিরনির্ব্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজা বৌদ্ধমন্দিরগুলি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং বিতস্তা তটে একটি সুন্দর নগরী স্থাপন করিলেন। এই নগরী বহু প্রশস্ত বর্ত্মে, মূল্যবান বিপণী-বীথিকায় সুসজ্জিত ছিল। মনোহর উদ্যান ও নানা প্রকার স্থপতি কলায় পরিশোভিত হইয়াছিল। নগরী মধ্য প্রবাহিতা বিতস্তা-বক্ষে অসংখ্য বাণিজ্য তরণী ভাসমান থাকিত।

এই নগরী মধ্যে জনৈক অনুপমা ব্রাহ্মণ কামিনী বাস করিতেন। তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যকাহিনী সর্ব্বত্র গীত হইত, (তিনি নাগদুহিতা ছিলেন—প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হওয়া ব্রাহ্মণকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন।) অসামান্যা ব্রাহ্মণ বধূর রূপ-বার্ত্তা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা তাঁহাকে হস্তগত করিতে অধীর হইয়া পড়িলেন। কলঙ্ক ভয় দুরাত্মাকে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। আর একটি ঘটনা ঘটিয়া রাজার চিত্তদমন চেষ্টা অসম্ভব করিয়া তুলিল। এক দিন ব্রাহ্মণী গৃহ-অলিন্দে উপবেশন করিয়াছিলেন। গৃহ বহির্দ্দেশে কতকগুলি শস্য আতপতাপে শুষ্ক হইতে দেওয়া হইয়াছিল; একটী অশ্ব আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী অশ্বকে বিতাড়িত করিতে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন; তৎকালে তাহারা কেহই গৃহে উপস্থিত ছিল না। তিনি স্বয়ং অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া অশ্বসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া সজোরে তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। তাঁহার হস্তচিহ্ন অশ্বগাত্রে সুবর্ণ চিহ্নে অঙ্কিত হইয়া গেল। রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে প্রাপ্ত হইতে অধিকতর ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে বহু ধন রত্নের প্রলোভনে পতিতা করিবার জন্য দূত নিযুক্ত করিলেন, সকল চেষ্টাই

নিষ্ফল হইল। ইহাতে সেই কামান্ধ নির্লজ্জ রাজা নিরস্ত হইল না। স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার স্ত্রীরত্নকে প্রার্থনা করিলেন। স্বামী রাজ অত্যাচারে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণীকে হস্তগত করিবার মানসে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গুপ্ত দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া সে যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করিলেন ও নাগরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুহিতার অপমান নির্য্যাতন-কাহিনী শ্রবণ করিয়া নাগরাজ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। নরের বিতস্তা নগরী আক্রমণ করিতে অচিরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তাঁহার ক্রোধ-বহ্নিতে বিতস্তা ধ্বংস মুখে পতিত হইল। পলায়নপর নাগরিকগণ চক্রধরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। নগরী ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, বিতস্তা নগরী শত সহস্র মৃত দেহে কলঙ্কিতে অপবিত্র হইল। নর রাজ সমরে প্রাণ হারাইলেন।

ইতিমধ্যে নাগরাজ ভগিনী রমণী বহু সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, ভ্রাতার সাহায্যার্থ গিরি-কন্দর হইতে বহির্গতা হইলেন। সমর ক্ষেত্রের এক যোজন ব্যবধানে থাকিতেই তিনি ভ্রাতার সাফল্যের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রমণী স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্তা হইলেন। তাঁহার উন্মত্ত সৈন্যগন পঞ্চ যোজন মধ্যস্থ পল্লীগুলি মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিল; কেহই পরিত্রাণ পাইল না। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন উক্ত প্রদেশে দৃষ্ট হয় বহু শিলাস্তূপ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ও সেই প্রদেশ এখনও রমণী-অটবী নামে অভিহিত হইতেছে।

বহু লোকের প্রাণসংহার করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ নাগরাজার আপনার প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জনপদ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর গিরি আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি সরোবর খনন করেন। অমরেশ্বর যাত্রা পর্ব্ব উপলক্ষে এই সরোবর বর্ত্তমান কালেও দৃষ্ট হয়। এই সরোবর সন্নিকটে আর একটি তড়াগ দৃষ্ট হয়—ইহা জামাতৃসর নামে অভিহিত। নাগরাজ জামাতা উক্ত ব্রাহ্মণ এই সরোবর খনন করাইয়াছিলেন।

রাজার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা অজ্ঞানতার হেতু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু রাজার দুর্ব্বলতায় প্রজাকুল যেরূপ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয় অত কিছুতেই তদ্রূপ হয় না। রাজা যখন প্রজা পালনের ছল করিয়া অন্যায় আচরণে লিপ্ত হন, তাঁহার মৃত্যু তাঁহার অজ্ঞাতে আগমন করে। কারণ ইহা নিশ্চিত যে সতী স্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও দেবতার অভিশাপে ত্রিলোক

ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। কত কাল হইয়া গিয়াছে, তবুও চক্রধর গিরি সন্নিকটস্থ ভস্মাচ্ছাদিত গৃহের স্মৃতি অদ্যাপি মনুষ্যগণকে, সকল কথা স্মরণ করাইয়া সাবধান করাইতেছে! নর ৩৯ বৎসর ৯ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই স্বল্পকাল মধ্যে কিন্নরপুর গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

ঘটনাক্রমে যুদ্ধকালে, নররাজ তনয় যুবরাজ সিদ্ধ, রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বিজয় ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার জীবন রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া বিধ্বস্ত রাজ্যের পুন শ্রীবিধান করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি ধর্ম্মগতপ্রাণ ছিলেন ও নির্ম্মল নিষ্পাপ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন শান্তিতে কাটিয়াছিল। তাঁহার পিতার দুর্ভোগ-কাহিনী তাঁহার উপদেশ স্বরূপ হইয়াছিল। যদিও তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিলাস স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তত্রাচ তিনি সকল প্রকার প্রলোভন হইতে, নিজকে সাবধানে রক্ষা করিতেন। তাঁহার ধনস্পৃহা ছিল না ও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার ইষ্টদেব মহাদেবকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন। ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি সশরীরে মহাদেব লোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। সপ্তদিবস তাঁহার এই মহত্বের পুরস্কারবার্ত্তা দুন্দুভি সহযোগে সর্ব্ব স্থানে ঘোষিত হইয়াছিল। নরের ভৃত্যবর্গ নরের সহিত একত্র অবস্থানাদি করায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন ও নিন্দনীয় হইয়াছিল। নরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারাই জগতের আপামর সকলের প্রশংসা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। যে যেরূপ আশ্রয় গ্রহণ করে, ভালই হউক মন্দই হউক, সে আশ্রয়দাতার ভাগ্যবৎ ভাগ্য ভোগ করে। তাহারাও সিদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গলাভে সমর্থ হইয়াছিল। রজ্জু হইলে তৃণকে নিম্নতল কূপে নিপতিত ও নিমজ্জিত হইতে হয়, আবার সেই তৃণই পুষ্প সহবাস প্রাপ্ত হইলে দেবতার শিরোদেশে উঠিতে সমর্থ হয়।

তদীয় পুত্র উৎপলাক্ষ তৎপর ৩৬ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। উৎপলাক্ষের নয়নযুগল কুমুদের ন্যায় সুন্দর ছিল, তাহা হইতে তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল।

তারপর তাঁহার পুত্র হিরণ্যাক্ষ সিংহাসনারূঢ় হন। হিরণ্যাক্ষ তাঁহার নিজনামে একটী নগরী স্থাপন করেন। ৩৭ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন তদীয় পুত্র হিরণ্যকুল ষষ্টিতম বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর হিরণ্যকুলাত্মজ বসুকুল সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার

রাজত্বকালও ষষ্টিতম বৎসর। ইঁহার রাজত্বকালে ম্লেচ্ছগণ কাশ্মীর আক্রমণ করে। মুকুলের দেহান্তে তদীয় পুত্র মিহিরকুল পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। মিহিরকুল মৃত্যুর ন্যায় নৃশংস ছিলেন। তাঁহার আদেশে রাজ্যে দিবারাত্রে নরহত্যার ইয়ত্তা ছিল না। এমন কি আনন্দ উৎসবেও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইত এমন কি শিশু, নারী ও বৃদ্ধ হত্যায়ও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার রাজ্যে হত্যার সংখ্যা এতই অধিক ছিল যে কাক ও শকুনী উড়িতে দেখিয়া লোকে তাঁহার ও তদীয় সৈন্যগণের আগমন অনুমান করিত। একদা তিনি তাঁহার রাণীর বক্ষে স্বর্ণ-রেখায় অঙ্কিত পদ চিহ্ন দর্শন করিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন ও অন্তঃপুর-রক্ষীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিয়াছিল 'মহারাণীর অঙ্গাবরণ সিংহল দেশীয় কৌশিক বাসে প্রস্তুত। ঐ বস্ত্রে সিংহলরাজের পদাঙ্ক অঙ্কিত আছে। সেই চিহ্নই মহারাণীর বক্ষে লিপ্ত হইয়াছে। ইহা অবগত হইয়া নররক্তপিপাসু মিহিরকুল তৎক্ষণাৎ দক্ষিনাবর্ত্ত সসৈন্যে যাত্রা করিয়া সিংহল আক্রমণ করেন। সিংহলের রাজা হত হইলেন; তৎস্থলে একৈক নৃশংস ব্যাক্তিকে স্থাপন করা হইল। রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উষাদেব নামক সূর্য্যের একখানি আলেখ্য সিংহল হইতে আনয়ন করেন। তিনি ফিরিবার কালে চোল, কর্ণাট, নাট প্রভৃতি প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সকল প্রদেশের রাজন্যবর্গ তাঁহার আগমন সংবাদ অবগত হইবা মাত্র স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। মিহিরকুল রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া যাইবার পর তাঁহারা হতশ্রী রাজ্যে পুনরাগমন করেন। যৎকালে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে ছিলেন তখন তাঁহার শত হস্তী, গর্ত্তে পতিত একটী হস্তীর আর্ত্তনাদে বিচঞ্চল হইয়া উঠে। রাজা সেই অপরাধে শত হস্তীকে বিনষ্ট করিতে আদেশ করেন।

পাপস্পর্শে দেহকে কলুষিত করে; পাপকথা বর্ণনে ইতিহাসও কলঙ্কিত হয়। একদা রাজা মিহিরকুল যখন চন্দ্রকলা নদী পার হইতে ছিলেন তৎকালে এক খণ্ড ভারী প্রস্তর তাঁহার গন্তব্য পথে অবরোধ করে। দেবতার স্বপ্নাদেশ হইল—এই প্রস্তরে যক্ষ বাস করেন, সতী নারী ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। রাজা নগরের স্ত্রীগণ দ্বারা ইহা পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন কিন্তু সকলেই বিফল মনোরথ হইল। অবশেষে কুম্ভকার পত্নী চন্দ্রাবতী প্রস্তর স্থানভ্রষ্ট করিতে সমর্থা হইলেন। রাজা এতগুলি অসতী স্ত্রীর পরিচয় পাইয়া

এরূপ ক্রোধান্বিত হইলেন যে তিনি স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতা সহ ঐ স্ত্রী সকল বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তিন কোটী নরহত্যা সম্পাদিত হইল। এই ঘটনা অনেকের চক্ষে প্রশংসনীয় হইতে পারে কিন্তু নরহত্যা সর্ব্বদা নিন্দার্হ। প্রজা রাজার বিরুদ্ধ এরূপ নৃশংস ব্যবহার দেখিয়াও যে বিদ্রোহী হয় না, তাঁহাকে হত্যা করে না তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কেননা দেবতা রাজাকে রক্ষা করেন। যাহা হউক রাজা যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যকার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুযায়ী নামকরণ করিয়া মিহিরেশ্বর নামক বিগ্রহ তিনি শ্রীনগরে স্থাপন করেন এবং মিহিরপুর নামক সুবৃহৎ নগরটী তাঁহার রাজ্যকালে তাঁহার নামানুযায়ী স্থাপিত হয়। তিনি তাঁহারই মত দুর্দ্ধর্ষ নিষ্ঠুর গান্ধারবাসী ব্রাহ্মণগণকে কতকগুলি গ্রাম দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ এরূপ নির্লজ্জ যে তাহারা সহোদর ভগ্নী ও পুত্র বধূগণ সহ সহবাস করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছ স্বভাব সম্পন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয়—এরূপ ব্যক্তিগণও ধ্বংসমুখ না হইয়া জীবিত থাকে। তাহারা তাহাদিগের স্ত্রীগণকে তৈজষ পত্রের ন্যায় বিক্রয় করিত এবং তাহাদের স্ত্রীগণও এরূপ নির্লজ্জ ছিল যে অন্যের সহবাসে কুণ্ঠাবোধ করিত না। বর্ষাঋতু সমাগমে শিখীকে আনন্দিত করে, শরতের শুভ্র নির্ম্মল আকাশে হংসগণের অসীম আনন্দের কারণ,—দাতা ও গহীতা সমধর্ম্মাবলম্বী।

পৃথিবীর মহাত্রাস নৃশংস এই নরপতি বৃদ্ধ বয়সে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একবারে অচল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন ও অগ্নি প্রজ্জলিত করাইয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। মৃত্যুকালে তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন। যে রাজা তিন কোটী নরহত্যা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই তিনিও স্বর্গগত হইলেন কেন না তিনি নিজ দেহকেও নির্দ্দয় ভাবে নির্য্যাতিত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করায় তাঁহার পাপের নিরাকরণ হইয়াছিল। ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণগণ তাহার রাজ্যময় বিস্তৃত হইয়াছিল সত্য কিন্তু আর্য্যোচিত অনেক ক্রিয়াকর্ম্মও তাঁহার রাজ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; পরিশেষে তিনি তপঃ পরায়ণ হইয়াছিলেন ও অগ্নিতে আত্মাহুতি দান করিয়াছেন। তিনি গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে সহস্রাধিক গ্রাম দান করেন। এইরূপে একটি রাজা যিনি অলিবারা প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে হৃদয়ে অসহ অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন অগ্নি প্রবেশে তিনি

স্বয়ং অগ্নিজ্বালা অনুভব করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। সত্তর বৎসর ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর প্রকৃতিবর্গ যুবরাজ বককে সিংহাসনারূঢ় করাইলেন। বক অতি অমায়িক রাজা। প্রথমে লোকে তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। তদীয় পিতার ন্যায় লোকে তাঁহাকেও সংশয়ের চক্ষে দেখিত কিন্তু সময়ে সকলেরই চক্ষে তিনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বর্ষা অন্তে গ্রীষ্ম ঋতুকে যেমন মানুষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া লয় তাঁহাকেও তদ্রূপ বরণ করিয়া লইয়াছিল। পুণ্য যেন অন্য লোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অর্থবিত্ত সম্বন্ধে প্রকৃতিপুঞ্জ পুনঃ নিরাপদ হইয়াছিল। আবার রাজ্যে সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি লবণোৎস নামক নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে ভট্ট নামক জনৈকা উপাসিকা একদা রাত্রে সুসজ্জিতা রমণী বেশে রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহার গৃহে ধর্ম্মোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু কোন প্রকার উৎসব পর্ব্বের পরিবর্ত্তে তিনি দেখিতে পাইলেন ভট্ট একটি মাত্র পুত্র ব্যতীত তাহার অপর পুত্র ও পৌত্রগুলিকে বলি দিতে ব্যস্ত। অবশেষে সে নিজেও দেবী সমক্ষে আত্মঘাতী হইয়াছিল। কি ভয়ানক কথা! আজও এই ভীষণ কাহিনী ক্ষীরা আশ্রমে কথিত হয়। রাজা ৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর ক্ষিতীন্দ্র ৩০ বৎসর ও তদীয় পুত্র বসুনন্দ ৪২ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব করেন। তৎপর তৎপুত্র দ্বিতীয় নর ৬০ বৎসর ও নরের পুত্র অশোক ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি অক্ষভালা নামক তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। অশোক পুত্র গোপাদিত্য ৬০ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্ব কালে সত্যযুগ যেন ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি বহু গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ রসুন প্রভৃতি অখাদ্য ভোজন করিত ও ভিন্ন দেশীয় আচরণভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে আনয়ন করিয়া বৃশ্চিক প্রভৃতি স্থানে স্থাপন করিতেছিল তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। রাজা জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক দেবতার স্থাপন করেন। দেবোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্যথা পশুবলি তাঁহার রাজ্যে নিষিদ্ধ ছিল। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গোকর্ণ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোকর্ণ তাঁহার নামানুযায়ী গোকর্ণদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৫৩ বৎসর ১১ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রাদিত্য

অতঃপর রাজা হন। তিনি ভূতেশ্বর নামক দেবতা ও অক্ষোহিনী নামক দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার গুরু অগ্রদেব উগ্রেশ নামক দেবতা ও মাতৃচক্র নামক দেবীর দশটী বিভূতর প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর এই পুণ্যশীল রাজার দেহান্ত হইলে তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠির সিংহাসনারূঢ় হন। তাঁহার চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র থাকায় লোকে তাঁহাকে অন্ধ রাজা বলিত। তিনি অতি সতর্কতার সহিত পিতৃরাজ্য শাসন করিতেনএবং পুরাতন আইনকানুন মানিয়া চলিতেন। কিন্তু কিছুকাল রাজত্বের পরে তিনি তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতাগর্বে এরূপ গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে মূর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তিগণকে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী আমাত্যবর্গকে অবহেলা করিতেন। অনুগ্রহ বিতরণে তিনি মূর্খ ও জ্ঞানীর পার্থক্য একবারেই রক্ষা করিতেন না এবং তাঁহার সুধী অমাত্যগণ ক্রমে ক্রমে বিরক্তিসহকারে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমদর্শিতা সন্ন্যাসীর পক্ষে গুণস্বরূপ কিন্তু রাজার পক্ষে অতি মারাত্মক দোষ। স্তাবক ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগের হস্তে ক্রীড়নক রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই তরল স্বভাবে ব্রাহ্মণগণ প্রজার ত্রাস রূপে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার অনুগ্রহও ছিল ক্ষণস্থায়ী। তিনি যেসমস্ত ব্যক্তিকে অসাক্ষাতে নিন্দা করিতেন সাক্ষাতে আবার তাহাদেরই প্রশংসা করিতেন। এই রূপে তিনি জনগণের নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার সিংহাসনকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মন্ত্রীগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন ও সৈন্যগণকে তাঁহাদের স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া রাজত্ব পার্শ্বস্থ রাজাগণকে রাজ্যধ্বংস করিতে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারাও শকুনীর মত কাশ্মীরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন। রাজা রাজ্যরক্ষা করিতে অসমর্থ ছিলেন; তিনি প্রথমে বিদ্রোহী মন্ত্রীগণের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য বৃথা চেষ্টা করেন। মন্ত্রীগণ সন্দেহ করিয়াছিল যে তিনি রাজ্যে পুনঃ সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদিগকে বধ করিবেন। তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল এবং তাহাদের গতির প্রতিরোধ সম্ভবপর ছিল না। মন্ত্রীগণ সসৈন্যে রাজপ্রসাদ আক্রমন করিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে রাজপ্রসাদ শীর্ষে তাহাদের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। রাজা অবশেষে

পরাস্ত মানিলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগে স্বীকৃত হইলেন। তিনি অন্তঃপুরের মহিলাবর্গ এবং ধনরত্ন সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া ধুলিময় রাজবর্ত্ম অতিবাহিত করিয়া—স্থানান্তরে চলিয়া যান! প্রজাবর্গ তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল না। আক্রমণকারীগণ—তাঁহর ধনরত্ন ও স্ত্রীগণের অধিকাংশই আত্মসাৎ করিয়াছিল। তিনি পর্ব্বত মধ্যে অবিরত পরিভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম করিতেন আবার উদ্দেশ হীন যাত্রা আরম্ভ করিতেন। কখন তিনি দুরস্থ শত্রুগণের চীৎকারে নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠিতেন এবং গভীর গুহা মাঝে লুকাইয়া শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতেন। অবিরত গহন বন ভ্রমণে, নদ্যাদি অতিক্রমের কষ্টে তাঁহার সুকোমালাঙ্গী রাণীগণ মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন, কখন তাঁহারা অতীত সুখস্মৃতিময় রাজ্যের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতেন। তাঁহাদিগের অশ্রু নির্ঝরের ন্যায় প্রবাহিত হইত। কখন তাঁহারা গিরিশিখর হইতে সুন্দর কাশ্মীরনগরী অবলোকন করিতেন। এই কাশ্মীর একদিন তাঁহাদের সুখের বাসর ছিল। এক্ষণে তাঁহাদিগকে তথা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এমন কি বনের পক্ষীগণও তাঁহাদের ক্রন্দনে ক্রন্দন করিত। অবশেষে নিকটস্থ জনৈক রাজা যুধিষ্ঠিরের দুঃখে দ্রবীভূত হন ও তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া—তাঁহার দুঃখাপনয়নে চেষ্টিত হন।

ইতি—কাশ্মীরের প্রধান অমাত্য চম্পক প্রভুপুত্র কহ্লন প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর প্রথম সর্গ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ক্রমশঃ—

শ্রী—

আত্মপ্রতি।

—:০:—

[রচনা—স্বর্গীয় কবি চণ্ডীদাস বাগ্‌চী]

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥

যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস-রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥

হায় অভাগিনী, পরের অধীনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে॥

অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

স্বরলিপি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

—:✱:—

[শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

কীর্ত্তন (ধানেশ্রী)—জলদ একতালা।*

স্থায়ী।

০ ১ ২´
II{গঋা গা পা | ঋাপা দা ঋাদনা I দা পঋা ঋাদনা | পঋা গঋা গা |
হি০ য়া র মা০ ঝা রে০০ য ত০ নে০০ রা০ খি০ ব

০ ১ ২´ ৩
| গঋা পদা দপঋা | পঋা ঋাগা গঋা I গা –ঋা –গা | দা –ন্া –সা} |
বি০ র০ দ০০ ম০ নে০ র০ ক ০ ০ থা ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| {নর্সা ঋা সর্না | না ঋাদা –ননা I ঋাপা পদা দা | পঋা গঋা গা |
ম০ র ম০ না ভা০ ০রে ধ০ র০ ম বা০ থা০ নে

০ ১ ২´ ৩
| পঋা ঋানা পঋা | পদা পঋাগা গা I ঋা –গঋা –গঋা | সন্া –ঋসা –ন্সা} II
সে০ আ০ র০ বি গু০০ ণ ব্য ০০ ০০ থা০ ০০ ০০

* নানুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী সাঁকুলিপুর গ্রাম নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়া বাবাজীর সুর ও তাল অবলম্বনে লিখিত। লেখিকা।

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II{পক্ষা দপদা নর্ঋা | র্সা –না র্সা I র্ঋা র্ঋা র্ঋর্সা | র্ঋনা র্সনা –র্সর্সা |
যা০ রে০০ না০ দে ০ খি জ ন ম০ স্ব প ০ ০নে

০ ১ ২´ ৩
| নর্ঋা র্ঋর্সা র্গর্ঋা | র্গা র্ঋর্গা র্গর্ঋা I না –র্ঋনা –র্সা | র্সা –না –র্সা} |
না০ দে০ খি০ ন য়০ ন০ কো ০০ ০ ণে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| {ক্ষা দা র্ঋনা | র্সা র্সনা র্সা I নদা দা পদনা | পক্ষা ক্ষাপক্ষা গা |
অ বু ধ০ সে জ০ নি দি০ ব স০০ য়০ জ০০ নী

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষাপা ক্ষাদা –না | পক্ষা দপা ক্ষাগা I ঋা –গা –ঋা | সা –ঋা –সা}II
স০ দা০ ই প০ ড়ি০ ছে০ ম ০ ০ নে ০ ০

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
II{ন্সা ঋসা গঋা | গঋা ন্ঋা সন্সা I ন্ া ঋা ন্সা | সন্ া ঋগা ক্ষাপা |
হা০ য০ অ০ ভা০ গি০ নী০০ প রে য়০ অ০ ধী০ না০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষাপা দক্ষা নদা | ক্ষাপা ক্ষাগা ক্ষাগা I ক্ষা –পা –ক্ষাদা | পা –ক্ষা –পা |
স০ কঁ০ লি০ প০ রে০ য়০ ব ০ ০০ শে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| ক্ষাপা দপা দা | র্ঋা নর্সা র্সা I নর্সা র্ঋর্সা নর্সা | নদা দা পক্ষা |
স০ দা০ ই এ ধ০ নি প০ রা০ ণ০ পো০ ড় নি৬

০ ১ ২´ ৩
| গা গক্ষাদা দা | নদা ক্ষাপা ক্ষাগা I গা –া –ঋা | সা –া –া} |
ঠৈ কি০০ সু পি০ রী০ তি০ য় ০ ০ সে ০ ০

আভোগ।

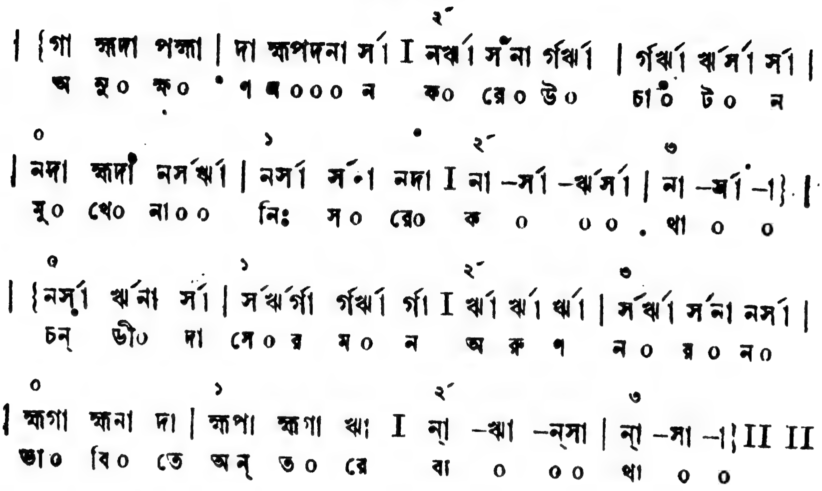

কিসের অভাবে এ দশা?

এদশা দুর্দ্দশা না সুখের অবস্থা? অতীতের তুলনায় বঙ্গ আজ উন্নতির পথে অগ্রসর না পশ্চাৎপদ, সুখ-সমৃদ্ধি তার বৃদ্ধি পাইয়াছে না বঙ্গ আজ শ্রীহীন, হত-সম্পদ, সুখশান্তি স্বাস্থ্য বিবর্জ্জিত, ধ্বংসোম্মুখ? কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের ত কথাই নাই,—বিলাতী সভ্যতালোকে ঝলসিত-আঁখি শিক্ষিতের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল, অবাধ উন্নতি—বিলাতী সভ্যতার পরা-গতি বসনে ভূষণে, বিলাস-উপকরণে, যাতায়াতের সুবিধায়, রেল, টেলিগ্রাফ, ডাকঘরে উন্নত শিক্ষার সুবিধানে, এক কথায় পৃথিবীর সহিত বঙ্গের শুভ সম্মিলনে, ভাবের আদান-প্রদানে বঙ্গের যে চিত্র শিক্ষিত বঙ্গবাসীর চক্ষে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল মোহনীয় বরণীয় নহে শ্লাঘ্য! আজও সেই মোহনীয় উন্নতির অতি উন্মততায় বিগলিত, বাষ্পে, পরিণত হইয়াও সে উন্নতি-

অবনতি সমস্যার সমাধান হইয়াছে কিনা সন্দেহ! কে অস্বীকার করিবে বঙ্গের সে অন্ধকার যুগের কথা! বিদেশ গমন অর্থে ছিল দেহপাত, পথের অসহ ক্লেশ, বিষম অসুবিধা, দস্যু-তস্করের হস্তে অকাল মৃত্যু! বিদেশস্থ আত্মীয়ের সংবাদ প্রাপ্তির আশা ছিল দুরাশা! কি ভীষণ অবস্থা! রোগের চিকিৎসা বলিতে ছিল অশিক্ষিত হাতুড়ে বৈদ্যের বড়ি—টোট্‌কার প্রসার! বিদ্যালয় বলিতে ছিল—কুড়িখানি গ্রামের মধ্যে একটি গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা,—শিক্ষা দেওয়া হইত জোড়—বোধোদয়, ধারাপাত, শুভঙ্করী, জমীদারী-মহাজনী; নীতি শিক্ষা হইত—পিতার তাম্রকূটের তহবিলের বংশনাশ!—কল্কির আগুন উস্কাইয়া ধূম্রমুখী করিয়া গুরু-সেবার উপযুক্ত করিয়া দিবার কারিগরী!—বালক হইত অকাল ধূম্রপায়ী! কোথায় ছিল এ সুকুমারমতি বালকের মতি বুঝিয়া রসের এ কিণ্ডারগার্টেন! ছড়ির ঘায় ছিল সর্দ্দার-পোড়ের সাদর-সম্ভাষণ! পাঠশালা হইতে পলায়নের ছিল মজাটা কেমন,—বৃক্ষশাখায় ঘন পত্রান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়াও ছিল না পরিত্রাণ! পড়া ত খুব,—দলে দলে পোড়ো পাঠাইয়া করা হইত পলাতকের অব্যর্থ-সন্ধান! পলাতকের পরিণাম ছিল কি ভয়াবহ! গুরু মহাশয়ের গুরু বেত্রাঘাতে তাহার দেহ হইয়া যাইত চিত্র-বিচিত্র! ভুক্তভোগীর পৃষ্ঠে আজও সে চিহ্ন অবিনশ্বর! দফে দফে কত উল্লেখ করা যায় সে অন্ধকার যুগের অসুবিধা, অনুন্নত অবস্থার কথা - কোথায় ছিল প্রাণমন তৃপ্তিকারী ক্ষুধাহারী এ চা-সুধা—হুঁকা-কল্কি-চকমকিসর্ব্বস্ব তাম্র-কূটের পরিবর্ত্তে এ অশেষ সুবিধার আধার—অহিফেণবারিসিক্ত রাসাগ্রাস নামধেয় স্বল্পদামী সিগারেট! ছিল কি—হইয়াছে কি! ছিল না অনেক—সভ্যতা-ভব্যতা রক্ষার মত হইয়াছে আজ অনেক, উন্নতি—উন্নতি—বিদেশের সংস্পর্শে অশেষ উন্নতি—আরও চাই উন্নতি! চাই-চাইয়ের হাহাকার, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সহস্রগুণে অভাব-অভিযোগের কারণ বৃদ্ধি পাইয়া সেই চীৎকার! এই কি উন্নতি? এ দুর্দ্দশা না সুখের অবস্থা?

এ সভ্যতা-আলোক-উদ্ভাবিত বঙ্গে আজ সভ্যোচিত প্রায় সমস্ত উপকরণই বর্ত্তমান, নাই কেবল আমাদের দেখিবার ক্ষমতা, ভোগ করিবার অবস্থা, আত্মশক্তিতে জীবনরক্ষা করিবার সামর্থ্য—আপনার বলিতে আমাদের কিছুই নাই—সমস্তই পরহস্তগত! পরমুখাপেক্ষী আমরা, পর-প্রসাদে বঞ্চিত হইলেই আমরা শূন্য! কেবল গগন-বিদারী হাহাকার মাত্র আমাদের সম্বল! অন্ধ যে তাহার পক্ষে উজ্জ্বল আলোকের কি ফল, চিররুগ্ন যে তাহার

ভোজ্যে সুখ কোথা? কেবল পীড়া বৃদ্ধির কারণ! যে কারণেই হউক্ যে দেশে স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমেই হীন হইতেছে—নিত্য নব নব ব্যাধি যেখানে নব নব নামে অধিবাসীকে আতঙ্কিত বিপদগ্রস্ত করিয়া কালের করাল বদনে নিক্ষেপ করিতেছে সে দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিরতার জলে কল কি? জন-সংখ্যা যে-ভূমে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র হ্রাসের দিকে দ্রুত চলিয়াছে, তথা-কথিত সভ্যতার তাহার কি উপকার? মরণের দেশে মহাপ্রস্থান করিবার জন্য দ্রুত যানের প্রয়োজন! মৃত্যু সংবাদ বহন করিবার জন্যই কি তার ঘর! পরের ঘরে পয়সা যোগাইয়া দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতে কি, পূর্ব্বে বিবেচিত হইত যেগুলি বিলাস উপকরণ এখন সেগুলির নিত্য প্রয়োজনীয়তা? পূর্ব্বে ছিল যথা—কার্য্যোপলক্ষে সাধারণ ভদ্রলোকেরও পদব্রজে দৈনিক দশ ক্রোশ গমনাগমন, অনায়াস-প্রয়াসে সে স্থলে গোশকটের ব্যবহার, তাহার পরিবর্ত্তে অশ্বযান প্রভৃতি,—আরও উন্নতিতে (গ্রাম্য পথেও) সাইকেল,—ট্যাক্সি। সহরে ত একপদ অগ্রসর হইতেই চাই দ্রুতগামী সুখযান।

এ সভ্যতার যুগে এই সকল সুখ সুবিধার প্রতি বক্র কটাক্ষপাত যে বর্ব্বরোচিত সে বিষয়ে দ্বিধা নাই কাহারও। কে ইচ্ছা করে আবার সেই অন্ধকার যুগে ফিরিয়া যাইতে? পদব্রজে দৈনিক দশ ক্রোশ অতিক্রম সুখেরও নহে সভ্যতার লক্ষণরূপে গৃহীত হইবারও উপযুক্ত নহে নিশ্চয়। যদি সে অবস্থার হইত উন্নতিজ্ঞাপক—স্বল্পেই সুখী, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমপ্রিয় বর্ব্বরগণই তাহা হইলে সভ্যশিরোমণি, কিন্তু একবাক্যে স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই অসভ্যের সে অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে কোন ক্রমেই। তবে বঙ্গের বর্ত্তমান সভ্যোচিত অবস্থা ব্যবস্থায় আমাদের অরুচি হইবার কারণ? দুর্দ্দশা কেন তাহাতে? প্রাণমনতৃপ্তিকারী সুপেয় স্বাস্থ্যবর্দ্ধক দুগ্ধ কিসে অপকারী—এ নির্জ্জলা দুগ্ধে অলক্ষ্যে কোন্ ব্যাধির বীজাণু সংক্রামিত? এ সভ্যতা-আলোকসমুজ্জল দেশের অন্তরপ্রদেশে মহা অন্ধকার।

বঙ্গের বর্ত্তমান সভ্যতা কেন, ইহা হইতে আরও উন্নততর মানবসেবায় সভ্যতার চরম সুখদ দান মানব জীবনে চিরপ্রার্থনীয়, -কখনই নহে দুষ্য। দুষ্য,—অশেষ অকল্যাণের আকর হইয়াছে তাহা আমাদের অদৃষ্টের দোষে। অনধিকারীর অদম্য উপভোগস্পৃহা আমাদের এই দুরদৃষ্টের মূলে। যাহার অধিকারী হইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই নাই,—যাহ। নহে আমাদের নিজস্ব, আমাদের অর্থবিত্তশক্তিসামর্থ্য যাহাতে অধিকার স্থাপনে অ[illegible]

উপভোগস্পৃহাই আমাদের হইয়াছে কাল,—পরপ্রত্যাশীর পরের অনুগ্রহে পুষ্ট হইবার অভিলাষীর অশেষ দুঃখ। শক্তি নাই যাহার গোযানের ব্যয়বহন করিবার তাহার পক্ষে অসঙ্কোচিত চরণযানই উপযুক্ত, মঙ্গলকর।

উপভোগের জন্য অধীর হইবার পূর্ব্বে হও উপযুক্ত; শক্তি অনুযায়ী হ'ক সুখ সুবিধার ব্যবস্থা। শুনিতে পাই স্বর্গে অনাবিল চির আনন্দ কিন্তু তাহা যে কেবল দেবভোগ্য। সে সুখে আমাদের ফল! মানুষ দেবত্ব লাভের আশায় আশন্বিত হক্, সেই সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ স্মরণে রাখুক দেবত্বলাভের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও স্বর্গ-সুখের আশা তাহার দুরাশা,- কেবল বিড়ম্বনা। আত্মশক্তির দৈন্যই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য; সে দৈন্যের নিরাকরণ করিতে সমর্থ না হইলে, অন্যের বস্তুতে সুখ-উপকরণে লোভ তস্করের ধর্ম্ম। সে পাপের পরিণাম কি,—বঙ্গবাসীর জীবনে নিত্য প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন হইবে বঙ্গের বারো আনা না হক্ চারি আনা ত শিক্ষিত সমৃদ্ধ, তাঁহারাও কেন আজও বঞ্চিত? দেহের একাঙ্গের পীড়ায় ঘটায় না কি সমস্ত দেহের ক্লিষ্টতা, অকর্ম্মণ্যতা? সমাজদেহেও সেই কথা! একাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের উন্নতি অসম্ভব! জননী জন্মভূমির দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে চাই প্রতি দেহে প্রাণে শক্তির সঞ্চার,—যেটি কাম্য, তাহা উপভোগ করিবার জন্য অধীর হইবার পূর্ব্বে তাহাকে নিজস্ব করিবার শক্তিতে, আত্ম-শক্তির বিনিময়ে কাম্য বস্তুকেই করা চাই আপনার। দেশে কোন বস্তুর ব্যবহার প্রচলনের পূর্ব্বেই সে বস্তুকে করা চাই স্বদেশী, আপন আয়ত্তের—তবেই না তাহাতে প্রকৃত সুখ, স্বদেশের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি উপকরণ সেইটি,—নতুবা পরের পণ্যে সুখসুবিধা পরিণামে বিষ! সে বিষ নিজের মৃত্যু, দেশের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। কি শিক্ষা-দীক্ষা, কি বাণিজ্য ব্যবসায়, কি সামাজিক প্রথা, রীতি নীতি,—যাহাই নহে আমার এ সোণার বাংলার, স্নেহের আধার ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বরবিশ্বাসী বাঙ্গালীর, তাহা যতই উন্নত সুখদ হক্ না কেন আমার নহে তাহা কল্যাণের, সে সভ্যতাকে দূরে হইতে নমস্কার!

"আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য
তাহারি জয়।"

কবির এ মহাবাক্য না স্মরণে রাখিয়া আমার ভাবে জননীজন্মভূমির উপযোগী ব্যবস্থায় আমাদের তাচ্ছিল্য, —অন্য পক্ষে বিদেশী ভাবের সুখ-তৃষায় মরীচিকার পশ্চাতে অবিরত ধাবিত হইবার প্রবৃত্তিতেই আমাদের এ দশা। ফলে—

"আপন বুঝিয়া চল এই বেলা"

এই নীতির অনুসরণের অভাবেই আমাদের এ দুর্দ্দশা।

শ্রী—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ঝড়ের রাতে।

—:•:—

ঈশান কোণে বিশাণ বাজে নিশান ওড়ে কার,
বাদল মেঘে মাদল কে গো বাজায় অনিবার,
আকাশ পারে কে চলেছে,
প্রলয় ঝড়ে কে মেতেছে,
উড়িয়ে চাঁচর কেশ—
নিরুদ্দেশের উদ্দেশে ধায় আপন-ভোলা বেশ!

মুহু মুহু ঝিলিক্ মারে তীব্র তড়িৎ হাসি,
আনমনে যায় পথের 'পরে কোন্ সে উদাসী;
আঁধার বীণা ঝারে ঝারে
উঠছে বেজে হাহাকারে—
কিসের ব্যর্থতার?
নিশ্বসিছে দীর্ঘ-নিশ্বাস্ নিশার বুকে হায়!

7

দোদুল—দোলে তরু লতায় মাতন হ'ল সুরু,
সন্ত্রাসিত নিখিল হিয়া কাঁপ্‌ছে দুরু দুরু;
উন্মাদিনী বৈশাখী ঐ
নৃত্য করে তাথৈ থৈ;
হাত্‌ছানি দ্যায় মুহু
পিয়ার লাগি কোন্‌ বিরহী ডুক্‌রে কাঁদে উহু!

থইহারা ঐ মেঘ-সায়রে কে হবে হায় পার,
ঝড়ের রাতে কাহার লাগি প্রলয় অভিসার;
না জানি কে পাগলপারা,
দিগ্‌ বিদিকে দিশে-হারা,
ছুট্‌ছে বারংবার—
নিবিড়-ঘন গহন-রূপে ঘনায় আঁধিয়ার!

শ্রীসরোজকুমার সেন।

বিপন্ন।

—:০:—

দার্জ্জিলিং মেলে কলিকাতা যাইতেছিলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী,—গাড়ীতে অসহ্য ভিড়,—কোন মতে একটু যায়গা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। কোলাহলের অন্ত নাই। দস্তুরমত দন্দ্ব যুদ্ধ চলিতেছিল, অনেকেই গরম মেজাজে প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন তাঁহাকে গাঁটের কড়ি ফেলিয়া টিকিট কিনিতে হইয়াছে—তাঁর যায়গা অন্যে দিতে বাধ্য! আশ্চর্য্য গাঁটের কড়ি দিয়াও অমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও এ সহজ কথাটা কাহারও মনে জাগিতেছিল না রেল কোম্পানি, এক্ষেত্রে ই, বি, রেলওয়ে স্বয়ং সরকার তাঁর পক্ষে সদাগর আর

অন্যের পক্ষে বদান্য নন, রেলের ভাড়া দেড়গুণ চড়াইয়া গাড়ী কমাইয়া অন্য যাত্রীকেও তাঁরা তুল্য ভাবেই অনুগৃহীত করিতেছেন! ভাবিতেছিলাম—জগতটা পশু-শালাই বটে—নরমের যম, শক্তের ভক্ত! যাত্রীর সে কষ্টের জন্য প্রকৃত অপরাধী যে প্রভুরা তাঁদের কর্ণে এ সমবেত চীৎকারটাও যদি পৌঁছাইত তবুও হয় ত তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইলেও হইতে পারিত কিন্তু রেল হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের এ অমর্ষের অবসান,—কি শান্তিতেই আছি আমরা,—দাদার আস্ফালন বৌদির উপর,—বৌদির আক্রোশ উনুনের উপর! তাহাতেই তৃপ্তি!

সান্তাহার হইতে গাড়ী ছাড়িয়া একদম নাটোর। গাড়ী চলিবার সময় যাত্রীরা একটু শান্ত হইয়াছিল, গাড়ী থামিতেই,—আবার সেই চীৎকার। "যায়গা নাই দেখচো নাকি ঘাড়ের উপর চড়ে যাবে নাকি? কেহবা নরম সুরে হাঁকিতেছিলেন—'আমাদের অবস্থা দেখে নিজেই বিচার করুন মশায়—তিলটি রাখবার যায়গা নাই।' কাহার বিচার কে করে। দশ মিনিটের মধ্যে রায় হওয়া চাই।

"আমার না গেলেই নয় যে মশায়—দাঁড়িয়ে কোন মতে যাব—এই ঈশ্বরদী পর্য্যন্ত—অনুগ্রহ করুন—কোন গাড়ীতেই যায়গা নাই যে।"

"যায়গা নাই ত যাবেন কি করে?—ঈশ্বরদী যাবেন এ গাড়ীর ধরবার জরুরীটা এমন কি! বসে থাকবেনই ত সেখানে গিয়া—পরে মিক্সড্ আসছে, সেটা অরুচি কিসে!"

"একটু আগে গেলে স্নান আহারটা হয় সেখানে।"

"ওঃ সেই গরজ,—হবে না, কেন বকাচ্ছেন বলুন!"

মারামারির উপক্রম। সাজোরে যবনিকা পতন!

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে,—এমন সময়, পরিচিত কণ্ঠস্বরে আমাকে আকৃষ্ট করিল—সত্যই সেই,—আমাদের দিবাকর! দিবাকর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী! সে বড় ডিপুটীর ছেলে। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিলাম। মুহূর্ত্তে প্রণয়ের ঝড় বহিয়া গেল,—তাহাতে বিচলিত হইবার সময় নাই, হাত বাড়াইয়া দিলাম—"উঠে পড়, উঠে পড়—দাঁড়াবার যায়গা হবে কোন মতে!"

"দিবাকর গাড়ীতে উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"ভাল ভাই তুই ছিলি বেই—এ ট্রেণটা ধরতে না পারলেই হয়েছিল আর কি! যাক আছিস কেমন ভাই!"

"দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্‌—চিরদিনের ভবঘুরে—ঘুর পাকই খাচ্ছি! আমাদের কথা ছাড়,—তুই এমন ভাবে চলেছিস্‌ কোথা?—এতদিনে নিশ্চয় একটা কেষ্ট বিষ্টু হয়েছিস্‌—এমন ভাবে তোকে আর আস্‌তে দেখে বাস্তবিকই জান্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি তোর কিসের? এতদিন পরে দেখা, খুসী ও হইনি কম—তোর মুখখানা দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না দিবাকর!"

দিবাকর আমার বাল্যবন্ধু—সমপাঠী ও আমাদের সময়ের নামজাদা ছাত্র—ইউনিভার-সিটিতে বরাবর ষ্টাণ্ড করিয়াছে—এম-এ ইংলিসে হইয়াছিল দ্বিতীয়! ওর বাপ ডিপুটী,—ছেলেকেও করিবেন ডিপুটী—সেটা পূর্ব্ব হইতেই সকলের জানা ছিল। অনেক দিনের ছাড়া ছাড়ি আমার বিশ্বাস ছিল এত দিন ও পাকা হাকিমী করিতেছে!

দিবাকর বলিল "ছাড় তোদের কেষ্ট বিষ্টু হওয়ার কথা—কেষ্ট বিষ্টুর রস বিধিমতে জানা হয়ে গেছে ভাই! জানিস্‌ বোধ হয়—সেবারের কথা, ঢের এত অর্থ তোলপাড় করে বাবা করে দিলেন ডিপুটী। মনে করলেম এত কষ্ট করে লেখা পড়াটা করা বুঝি সার্থক হ'ল, সুখে হাকিমী করা যাবে। কে জান্‌ত তখন বিধি বাম—দস্তুর মত নিজের প্রিন্সিপল্‌কে আধমারা করেই হাকিমী করতে গিয়েছিলেম—চারটা বছর কেটেছিলও ভাল ভালই কিন্তু অত করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেম না—বেটারা অবশেষে একটা কেসে ইঙ্গিত করল কি না নির্দ্দোষ একটা আমারি মত এম-এ পাশ যুবককে শাস্তি দিতেই হবে নৈলে নাকি পুলিসের কাজ চলে না—লোকটার অপরাধের প্রমাণ না থাকলেও ছিল নাকি তার অন্তরে অন্তরে ঘোর বদমায়েসী! কাকে বুঝাই বল—অন্তরের গোপন ভাব দিয়ে ফৌজদারী বিচার করবার প্রসিডিওর কোন্‌ আইনে লেখে?—অথচ আমরা আইনের হাকিম,—ভদ্রলোকটিকে বেকসুর খালাস দিলাম—সেই হ'ল আমার সার্ভিসের কেরিয়ারে কাল! টিকতে পারলেম না—খারাপ যায়গায় বদলীর পর বদলী করে অস্থির করে তুলল,—অত ঝকমারি কি সহ্য হয়—কাজে রিজাইন দিলাম,—প্রকৃত কথা বল্‌বার সাহস হ'ল না—অসুখের হেতুবাদে।—তাতেও রক্ষা নেই,—বাবাকে ছেলের অপরাধে পেনসন্‌ নিতে হ'ল। বুঝতেই পারছিস ব্যাপারখানা! ঘরে বাহিরে কেবল গঞ্জনা,—যাকে কোন দিন চিনিও না—সেও আমার হটকারিতার ফল—আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে অযাচিত উপদেশ বিতরণে আমায় উপকৃত করতে কার্পণ্য করলে না। বাবা ত অসন্তুষ্ট হবেনই শ্রীমতী পর্য্যন্ত মুখঃভ ছাড়লেন না—

ডিপুটী গৃহিনীর অমন ভাবে পদচ্যুতি কি কম পতন। সকলের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল তখন মা বসুধা দ্বিধা হও প্রবেশ করি—আমাদের শিক্ষার গলায় দড়ি!

জান কি করবি সে সময়ের ভোগান্তির কথা, বুঝতে পারবিনে ভাই। মনের দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছিলাম যেন! তখনো জানিনে অদৃষ্টে তার চাইতেও আরও ভোগ আছে,—বাবা স্বর্গগত হলেন—তখন সত্যিই মনে হ'ল—আমিই পিতৃহন্তা। আমার ব্যবহারই বুঝি তাঁর মৃত্যুকে এগিয়ে আনল। অনুতাপ অনুযোগের অবধি থাকল না। তোর কাছে সত্যি বলতে কি ভাই, তখন মনে হচ্ছিল—ওদের পায়ের পয়জার বয়েও মিথ্যার মর্যাদা রেখেও যদি তখন চাকুরিটা রাখতুম—বাবা আমার অমন মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে যেতেন না।

বাবার স্বর্গারোহণের পর আমাকে বিধিমত বুঝতে হল—খেটে না খেলে অচল। বাবা যে মোটা মাইনে পেতেন—বা হরের ঠাট্ বজায় রাখতে তা শেষ হয়ে যেত, তারপর বোনেদের বিয়েতে ধারই করেছিলেন হাজার কয়েক টাকা,—সম্বল মাত্র তাঁর লাইফ ইন্সিওর,—তা মন্দ ছিল না—হাজার কুড়ির উপর,—বছরের চেষ্টায় কোম্পানীর কবল হতে টাকা উদ্ধার হ'ল—ঋণ টান শোধ দিয়ে দাঁড়াল হাজার নয়। ভাবলেম,—এটা দিয়েই একটা স্বাধীন ব্যবসা করি,—চাকুরী অকুমারিতে আর যাওয়া হবে না—এবারে [illegible] বাবসা! খুলে ফেললেম একটা স্বদেশী মালের দোকান। কাটতি হতে লাগল অসম্ভব সংবাদপত্রেও বের হ'ল দেখলাম—আমার অযাচিত অতিউক্তি প্রশংসা। খুসীই হলেম। লাভের অংশ অঙ্ক কষে বের করলেম—হবে বেশ,—সাধে কি শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। ষান্মাষিক হিসাবটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি ফলে দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো! বিক্রি যত তার চাইতে বাকী অনেক বেশী—আদায়ের বেলায় ভোগিনই সার। আরও বছর খানেক দোকানটা চল্ল,—আসলেই টান—বাকী আদায়ে অনুপায় হলে দোকান পাট বন্ধ করতে হ'ল—তায় দৈশ! দোকানের বাকী মাল নিলামে জলের দরে বিক্রি করে উঠল মাত্র হাজার তিনেক! মাথায় হাত দিয়ে বসলেম—অভিজ্ঞতা বল্লে যে-ব্যবসার বাকী কারবার বাঙলা তায় নয়—কাবুলীর মত বিচার বুদ্ধিহীন হয়ে নির্দ্দয়ভাবে বাঙ্গালীর রক্ত চুষতে না পারলে ভদ্রলোকের সাধ্য নেই বাঙলায় ব্যবসা করা—

সত্যিই তাই ব্যবহারের উপযুক্ত নই আমরা ! ভাবলেম—এবারে কৃষি ; সুজলা সুফলা ভূমির আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট হতে হবে—এ দেশে লেবার (মজুরী) সস্তা, নিজে খাট্‌লে হবে না কেন ? আবার আশান্বিত হয়ে আরম্ভ করলেম আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে,—পুরাদমে অদম্য উৎসাহে চাষ আবাদ ! ও হরি ! এটাতেও তুল্য ফল,—মজুর সস্তা হলে হয় কি—কাজ দিতে তারা চায় না একবারে,—নিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও আশানুযায়ী কিছুতে করতে পারলেম না,—কফির আবাদ করেছিল বেশ, হলে হবে কি সেখানেও চুরি, তবুও লাভ হয়েছিল শো দু কিন্তু অন্য ফসলেই মেরে দিলে-সেবারে অতি বর্ষা, রেলের বাঁধের কল্যাণে জলনিকাশ হতে পারলো না—সব ডুবে গেল, আমিও সেই সঙ্গে ডুবলেম,—বাকী ছিল ত মাত্র টাকার তিনেক,—তা হতে তিন শ উঠ্‌বারও আশা হারিয়ে বুঝতে হল এদেশে ভদ্রলোকের পক্ষে কৃষি কার্য্যও নয়। এখন ভদ্রলোক যান কোথা ? আশা সেই চাকুরী ! সেই দেহিপদ পল্লবম, তবে আর ডেপুটীগিরিতে অপরাধ করেছিল কি ? ভাবলেম এবারে চাকুরী করতেই হবে যখন প্রফেসারীর চেষ্টা করা যাক, আর না হ'ক দেশের ভবিষ্যত-আশা যুবকদের তৈরি করতে পার যদি সেও হবে একটা কাজ ! ভবিষ্যত-আশাদের যাই হ'ক,—দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করেও আমার মত মেডালিষ্টেরও চাকুরী জুট্‌ল না। দরখাস্তের উত্তরে কল্‌কাতার একটা কালেজ হতে জবাব পেলেম কাগজে তাঁদের কাজ দুশো টাকা বলে বিজ্ঞাপিত হলেও এখন তাঁরা কোন নতুন লোককে দিতে রাজী নন অত। আধাআধি শেষ এক'শ, আম স্বীকার কিনা তাই জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছেন—আমার অভাব তখন—তাতেই স্বীকার করলেম। তখন তাঁরা বল্লেন—চাক্ষুষ দেখাশুনা না করে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার (বাহালী চিঠি) দেবেন না তাঁরা ! তাতেও স্বীকার,—চল্লেম আবার কল্‌কাতায় চাকুরীর পরীক্ষা দিতে !

সেও এই দার্জ্জিলিং মেলে,—তখন সবে সেকেণ্ড ক্লাসের মায়া কাটিয়ে ইণ্টারের যাত্রী হয়েছি ! ভিড়ের ভয়টা তখনো কাটেনি—দেখে দেখে অবশেষে একটা কম্পার্টমেণ্টে দেখলাম—মাত্র একজন—উঠে পরা গেল ! সহযাত্রী বাহিরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন—আমি উঠ্‌তেই ফিরে চাইলেন ! খুব যেন প্রীত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন, বল্লেন "দিবাকর বাবু যে—নমস্কার !"

চিনতে পারলেম না। পরিচয় জিজ্ঞেস করতে ভরসাও হ'ল না। তিনি, বোধ হয় আমার ভাব দেখে বুঝেই বল্লেন "চিনতে পারলেন না বুঝি,—না চেনবারি কথা,—আমি আপনার যেমন করে দেখেছি আপনার তার দরকার হয় নি—মনে আছে বোধ হয়—আপনার এজলাসে সেই হরিরামপুর হাটের স্বদেশী কেসটা,—বিলাতি কাপড়ের দোকানে মারপিট,—আমি ছিলাম তার প্রধান আসামী।"

আমি তাঁকে হ্যাণ্ডসেক্ করতে হাত বারিয়ে দিয়ে বল্লেম—"হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না,—অবিনাশ বাবু আপনি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—এখন বলতে কি, পুলিসের কাণ্ডটা ঠিক ধরে ছিলেন আপনি—কিন্তু তাতে আপনার প্রমোশন হয় নি নিশ্চয়!"

"প্রমোশন! বলুন—তিরোধান!"

"অ্যাঁ—বলেন কি! আপনি কি তবে এক্‌জিকিউটিব সার্ভিসে নাই,—দেখছি প্রকৃতই অপরাধ করেছি আমি!"

"অপরাধ আপনারও নয়—আমারও নয়—আমাদের দেশের পোড়া অদৃষ্টের—যাক!"

তিনি প্রশ্ন করলেন "তবে এখন করছেন কি?" আমার তখনকার মনের অবস্থায় তাঁহার সহানুভূতি অনুভব করতেছিলেম। সংক্ষেপে আমার অবস্থাটা বলে গেলাম। তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন "তাই ত—এমন হবে কে জানত! যদি অপরাধ না নেন আমি একটা কাজ...নিয়ে দিতে পারি। সেটা বোধ হয় কলকাতার কলেজে প্রফেসারীর চাইতে মন্দ হবে না—মাইনে ঐ এক শো—মাষ্টারী, একটা ছেলের প্রাইভেট টিউটারী,—অভিভাবকটি বেশ ভাল লোক—ছেলেটি যা—একটা রত্ন। টাকা না পান শান্তিতে কাজ করে সুখ পাবেন। আমাকে সে জমীদার বাবুটি অনেক দিন হ'তেই আপনাদের মত একটি ভদ্রলোককে দেখে দিতে অনুরোধ করে আসছেন—যাকে তাকে ত আর রিকমেণ্ড করা যায় না,—আপনি ছেলেটির ভার নিলে বেশ হবে।"

বল্লেম "আমায় আপনি কি জানেন যে রিকমেণ্ড করছেন—আমি যদি আপনার বিশ্বাসের অযোগ্য হই!"

"সে ভাবনা আমার,—আপনি অনুগ্রহ ক'রে স্বীকার করুন—বাস্তবিকই ছেলেটীতে আমি ইন্‌টারেষ্টেড !

বলা বাহুল্য সেই কাজই নিলাম। সত্যিই যেখানে যে শান্তি পেয়েছিলেম চাকুরীর জীবনে আর কখনও পাইনি। জমীদার বাবুটি এক অদ্ভুত লোক, অমন লোকের কল্পনাও কখনো আমি করতে পারি নি—একাল সেকাল তাঁতে কেমন মিলে মিশে গিয়েছিল,—ভালমন্দের অমন অপূর্ব্ব সম্মিলন আমি ত আর কোথা দেখি নি—নিজের সামাজিক সংস্কারে, আচারনিয়মে তিনি ছিলেন গোঁড়া, আবার উদারতায় বিপদে আপদে কোল দিতে তিনি হাড়ী ডোমের বিচার একটুও রাখতেন না ; নিজের জমীদারীর বিচার, ছোটখাট ফৌজদারীর পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি হ'ত তাঁর কাচারীতে,—জরিমানাও আদায় হতো,—আভাষে একদিন বলেছিলাম সেটার বেআইনীর কথা। তাতে তিনি যা উত্তর করেছিলেন সেটা ফেলবার নয়। জানি দিবাকর বাবু,—অত আইন দেখলে আমরা বাঁচি কিসে—তা'তে প্রজারও লাভ নাই আমাদের ত নাই, ভাবুন এমন একটা ফৌজদারী কেস আদালত করতে গেলে খরচ কত, আমি যা নেই তার চতুর্গুণ, আমরা যাই করি,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা,—এক টাকায় ক'রো একশো টাকার দণ্ড হয় আবার একশো টাকাকেও কেউ কেয়ারই করে না,—আদালত কি তা ভাবেন,—শাসনই যদি উদ্দেশ্য হয় তা এতেও হয় আদালতেও হয়! নৈলে এসব ছেড়ে দিলে লোকগুলোর কি ভয় থাকে ? না—আমাদের মানে ? এটা বেআইনী হ'ক আমাদের করতেই হয়!' সরকারের জরিমানা তহবিলের জেল পপুলেশনের ক্ষতি যেটা তিনি গণনাই করতেন না,—তাঁর প্রতাপে সেটা সরকারে জানাবার আশঙ্কাও ছিল খুব কমই। অন্য দিকে আবার ছিলেন তিনি দয়ার অবতার, দুস্থকে তিনি কি মুক্তহস্তে দানটাই করতেন—তাদের বিপদে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত হতেন,—সকলের সঙ্গেই অমন সমভাব আমি কমই দেখেছি। যাই বলিস্ তোরা ভাই আমি একেবারে মুগ্ধ, বাধ্য হয়ে পড়েছিলেম তাঁর,—তাঁর দোষ আর চোখে পড়ত না! ছেলেটির কথা আর কি বলব—সত্যই রত্ন,—যেমন মেধাবী, তেমি তার মিষ্টি ব্যবহার। তার চোদ্দ বৎসর বয়েস ; সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, এক বৎসর তাকে ম্যাট্রিকে ডিটেন হতে হবে কিন্তু সে ছেলেকে বয়েসের বাধা ধরে, ধরে রাখবার নয়! আর তার ছোট

বোনটি—দেব-শিশু,—আমি তাদের ব্যবহারে,—ভাই, তাদের পরিবারের একজন নিকটতম আত্মীয়ের মত হয়ে গিয়েছিলেম, কি সুখেই দিনগুলো গিয়েছে!

আমার অদৃষ্টে সে সুখ সইবে কেন, ভাই! বছর খানেক না কাটতেই অকস্মাৎ একদিন বজ্রাঘাত হ'ল,—একদিনের জ্বরে ডাক্তার ডাকবারও সময় হ'ল না—জমীদার চলে গেলেন! তাঁর মৃত্যুতে এ অঞ্চলে যে হাহাকার উঠেছিল তা হতেই বুঝা যায় লোকে তাঁকে কত ভালবাসত!

স্মরণ করতে ইচ্ছা করে না আর সে দিনের কথা—তখন মনে হয়েছিল জীবনে আর এদের কাছ ছাড়া হব না। মাতৃ-পিতৃহীন শিশু দুইটিকে পরমাত্মীয়ের মত বক্ষের মাঝে লুকিয়ে রাখবো—ওদের মুখের দিকে চাইতে আমার প্রাণ ফেটে যেত!

তখোনি কি জানি—আমার ইচ্ছা ইচ্ছামায়ের—ইচ্ছার নিকট তুচ্ছ।

নাবালকের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেসে গেল। নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। দুটা মাস না যেতেই আরম্ভ হল—বিশ্রী কাণ্ডকারখানা,—সেই বেয়াইনী জমীদারের রাজ্যে কথায় কথায় আইন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এমন অবস্থা করলে—লোকজন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়লো—আমার উপর ম্যানেজারের অনুগ্রহটা বেশী। কালেক্টারের নিকট কোন কনফিডেন্স্যাল রিপোর্টের ফলে কিনা জানি না—সহসা কালেক্টার অফিস হতে এক নোটিস পেলাম—আমাকে আর প্রয়োজন নাই। একমাসের মাইনা পুরস্কার দিয়া আমার সার্ভিস ডিস্পেন্স্ উইথ (বরখাস্ত) করা হয়েছে।' জানতাম এই কালেক্টরই ছিলেন আমার হাকমী জীবনের প্রভু,—ম্যাজিষ্ট্রেট, সে আদেশে মর্ম্মাহত হলেও—আশ্চর্য্য হলেম না একটুকু! আমার ছাত্রকে ছেড়ে যেতে হবে। তাই হ'ল! আঃ—সে বিদায়ের কথা বলতে পারবো না—ছেলেটা হুহুকরে কাঁদতে লাগলো—মেয়েটার ধুলায় লুটান,—তা দেখে আমারও ধৈর্য্য ধরবার শক্তি ছিল না,—ছেলেদের মতই কাঁদতে হল!

"সে আজ সাত দিন পূর্ব্বের কথা! আজও যে মন ঠিক হয় নি ভাই—ভাবি যখন পাগল হয়ে যাই!"

গাড়ী থামিল। ষ্টেসন প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে কুলীরা চীৎকার করিয়া হাঁকিল "বাবু—কুলি কুলি" "পোড়াদ'—পোড়াদ'।"

দিবাকর সহসা থামিয়া বলিল "পোড়াদা—এত সকালে এসে পড়েছি! আমি—আবেগে অনেক কথা বকে গিয়েছি দোষ নিস্‌নে ভাই।"

উত্তরের অবসর না দিয়া—দিবাকর তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল। আমি বলিলাম—"একটু দাঁড়া দিবাকর,—শুনি বল........."

"ও গাড়ীটা বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না ভাই।"

বলিলাম—'আসল কথাটা শোনা হল না ভাই,—আজ তোর অত জরুরী কিসে..."

দিবাকর অশ্রুভরাক্রান্ত নয়নযুগল আমার দৃষ্টি সমক্ষে স্থাপন করিয়া বলিল "ভাই আমি বড় বিপন্ন—মানুষে ঠেকিয়েছে এত দিন, আজ আমার শত্রু স্বয়ং দেবতা,—খবর পেয়েছি বাড়ীতে আমার স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রের কলেরা।"

গোয়ালন্দগামী গাড়ীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল,—দিবাকর ছুটিল। চক্ষের জলে আর দৃষ্টি চলিল না।

অতবড় লোকের অমন ছেলে—তার কি এ নিয়তি! না,—দেশের আবহাওয়ায় দিবাকর আজ বিপন্ন!

শ্রী—

বিরাগ।

—:0:—

আজি, মুছিয়া ফেলিব হৃদয় হইতে—
অন্তরে যত অভিমান্।
বাঁধিব,— হৃদয় লোহার বাঁধনে—
করিব সবায় সমজ্ঞান্॥
আজি, প্রতিষ্ঠিব এক, অভিনব ছবি—
হৃদয়ে আমার একতার।

অসার—　দেহের ইন্দ্রিয়চয়ের—
　গরব করিব চূরমার ॥
আজি,　বিলাসিতা সব করি পরিহার—
　অহমিকা জ্ঞান করিব নাশ।
তোমার—　আমার—আমার—তোমার—
　তুমি,—আমি—এই প্রতিভাষ ॥
আজি—　জ্ঞানের শিখরে আরোহিতে সুখে—
　দ্রুত-পদে হ'ব ধাবমান্।
কি করিবে—　আজি মায়ার শিকল ?—
　ভাঙ্গিয়া করিব খান্ খান্ ॥
আজি,—　জননীও যদি, হন্ আগুয়ান—
　বাঁধিবার তরে মায়াপাশে।
তবুও　না হ'ব প্রতিহত-গতি—
　উদিত 'বিরাগ' হৃদয়াকাশে ॥

শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

অভিনব চিকিৎসা

ন্যূনাধিক এক বৎসর হইল এমিল্ কুএ (Emile Coue) নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এক নূতন চিকিৎসাপ্রণালী প্রচার করিতেছেন। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহু লোক আরোগ্য লাভ করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে জানাইতেছেন এবং সংবাদপত্রে এতৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা

কোন সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু লেখা হইয়াছে কিনা জানি না। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেকে এই চিকিৎসাপ্রণালীর সমর্থন করিয়া নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং আর এক দল বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারাই বলিতেছেন যে ইহা একেবারেই অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ বাজে। কেহ কেহ কুএকে প্রবঞ্চক বলিয়াও অবিহিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু কুএ নিজে প্রতারিতই হউন বা আর কিছুই হউন তিনি প্রবঞ্চক নহেন কেননা তিনি এই চিকিৎসা করিয়া কাহারও কাছে অর্থ গ্রহণ করেন না।

ফ্রান্সের অন্তর্গত (Nancy) নামক ক্ষুদ্র নগর কুএর জন্ম স্থান, তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর। ইয়োরোপের সকল দেশ হইতেই বহু লোক নান্সিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তাঁহা দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছেন। এই চিকিৎসায় অনেকে আশ্চর্য্যভাবে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তিনি আমেরিকায় গেলে সেখানকার এক জন চলচ্চিত্র-প্রদর্শক তাঁহাকে সপ্তাহে পাঁচ হাজার ডলার দিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার চিকিৎসা অতি অনায়াসসাধ্য এবং বিনামূল্যে লভ্য বলিয়া লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। চিকিৎসা প্রণালী এইরূপ "আমি দিন দিন সর্ব্ববিষয়ে উত্তরোত্তর সুস্থতর হইয়া উঠিতেছি" এই কয়েকটী শব্দ প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এমন অনুচ্চ স্বরে বিশ বার আবৃত্তি করিতে হইবে যেন নিজে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, শব্দ কয়েকটীর ইংরেজী ফর্মিউলা এই Day by day, in every way, I'm getting better and better, বিশ বার গণনার সাহায্যের জন্য এক গাছা দড়ীতে বিশটা গ্রন্থি দিয়া এক এক বার মন্ত্রের আবৃত্তি হইয়া গেলে এক একটী গ্রন্থি অঙ্গুলী দিয়া সরাইতে হইবে। ইহা আমাদের দেশের মালা জপের ন্যায়। মন্ত্রটা লিটানির (Latany) মত পড়িতে হইবে। যাঁহারা লিটানি কাহাকে বলে না জানেন তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও" যে রূপে আবৃত্তি করা হয় সেই রূপে আবৃত্তি করিবেন। আবৃত্তির সময়ে মন্ত্রের প্রতি যে মনঃসংযোগ করিতে হইবে এমন নহে। মন এদিকে ওদিকে গেলেও ক্ষতি নাই। কুএ বলেন যে এই রূপে নিজেকে শুনাইয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিলে নিজকে হিপ্‌নোটাইজ (hypnotize) করা যায় এবং তাহার ফলে সর্ব্ববিধ রোগ—দৈহিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—ভাল হয়।

স্বর্গে এবং পৃথিবীতে আমাদের বুদ্ধির অতীত কত কি আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং এই চিকিৎসাপ্রণালী যে মিথ্যা এবং ভ্রান্ত তাহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? হিপ্‌নোটাইজ করিলে যে অনেক দুরারোগ্য রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে তাহা শিক্ষিত লোকে জানেন। যদি নিজের উচ্চারিত শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নিজকে হিপ্‌নোটাইজ করা যায় তাহা হইলে রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইতে পারে। এই চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় নাই, কোন রূপ আয়াস নাই, মনঃসংযোগের প্রয়োজন নাই, স্থান ও কালের অসুবিধা নাই, বিশ্বাসেরও প্রয়োজন নাই এবং এই প্রণালী অবলম্বন করিলে কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহা পরীক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য।

কুএ এই চিকিৎসা-বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার নাম My method. মূল্য ছয় শিলিং। রোগীদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ব্যায়ামের দুই চারিটি সঙ্কেত।

খুব খানিকটা খাইলেই দেহের পুষ্টি হয় না। আমাদের দেশের বড়লোকেরা প্রত্যহ নানারূপ চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার করিয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহ যেন এক একটি ব্যাধির বাড়ুঘর। কেন, ইহার কারণ বলিতে পার কি? কারণ তাঁহারা কিছু পরিশ্রম করেন না।

খাদ্যের সঙ্গে আমাদের জীবন-ধারণের ও শারীরিক সুস্থতার খুব নিকট সম্বন্ধ বটে; কিন্তু সেই খাদ্য নির্ব্বাচন, চর্ব্বণ ও পরিপাকের উপর আমাদের সুস্থতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। আমাদের বারো আনা ভাগ ব্যাধি জন্মে কেবলমাত্র খাদ্য নির্ব্বাচনের অবিমৃষ্যকারিতায়, উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করায় ও উপযুক্তরূপ পরিপাক-শক্তি না থাকায়। পাঠক-পাঠিকাবর্গ বোধ হয় জানে যে, আমরা কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, তাহা পেটের

মধ্যে গিয়া কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারে পাচক রসের (Renin pehsin, Hydrochloric acid প্রভৃতি) সাহায্যে সংপেষিত ও পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করে; পাচক রসের গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী ব্যক্তিবিশেষে ঐ পেষণ ও পরিপাক এক এক প্রকার হইয়া থাকে; ইহাকেই তত্তৎব্যক্তির হজম-শক্তি কহা যায়। পরিপাক ক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ক্ষীরবৎ তরল খাদ্য-দ্রব্য অন্ত্র মধ্য দিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে; তন্মধ্যে যেটুকু অংশ রীতিমত পরিপাক করা হইয়াছে, সেটুকু রক্তের মধ্যে আশোষিত হইয়া রক্তের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যেটুকু পরিপাক হয় নাই, সেটুকু বিষ্ঠার আকারে ও প্রকারান্তরে ঘর্ম্ম মূত্ররূপে দেহ হইতে নিসৃত হইয়া যায়।

সুতরাং হৃষ্টপুষ্ট হওয়া অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের গ্রহণের উপর যত না নির্ভর করুক্ ততোধিক নির্ভর করে ঐ খাদ্য সম্যকরূপে পরিপাক করার উপর; এবং এই পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায় নিয়মত প্রণালীবদ্ধ-ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনে বা ব্যায়ামে। যাহারা দিন মজুরী করিয়া প্রত্যহ নিয়ম মত শারীরিক পরিশ্রম করে ও ডাল ভাত শাক চচ্চড়ী খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের দেহ এবং যাহারা ঘি, দুধ, ছানা, চিনি খাইয়া ফরশীর নল মুখে করিয়া সোফায় শুইয়া থাকেন তাঁহাদের দেহ—পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

যাহাদের কেবল মাত্র মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হয়—কোনরূপ দৈহিক শ্রমের ধার দিয়াও যাইতে হয় না, তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যহ কিছু সময় করিয়া ব্যায়াম যে কতদূর উপকারী তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। ভ্রমণ অপেক্ষা সহজ ও আশু ফলপ্রদ ব্যায়াম আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু ইহাতে দেহের প্রত্যেক অঙ্গটির পরিচালনা হয় না বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষ্ঠুতা সাধিত হয় না। আমাদের দেশে এমন অনেক ধনী সন্তান আছেন যাঁহাদিগকে হয় ত জীবনে কখনও পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হয় নাই বা হইবে না, এবং সহরে যেখানে ছয় পয়সায় ট্রামে চড়া যায় ও দুই চারি আনায় রিক্স হাঁকান যায়, সেখানে অনেক মধ্যবিত্ত বাবুমহাশয়ও প্রায়শঃ "চরণ-বাবুর জুড়ী" চালাইতে লজ্জা বা আলস্য বোধ করেন। কিন্তু তাহার ফল স্বরূপ তাঁহারা অল্পায়াসেই 'শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্'রূপে গঠন করেন এবং অকালে কাল কবলিত হন।

স্বাস্থ্য দুই প্রকার ;—একটি মানসিক অন্যটি কায়িক। স্বাস্থ্যচর্চ্চা করিতে গেলে দুইটির প্রতিই অল্পবিস্তর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মানসিক পরিশ্রমে দেহের যতটা ক্ষতি করে, দৈহিক পরিশ্রমে মনের ততটা ক্ষতি সাধন করে না—ধ্রুব সত্য। পরন্তু যদি মনকে অবহেলা করিয়া একমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যেরই উন্নতি বিধান করা যায়, তাহা হইলে তাহা মানুষের পশু-বৃত্তি পরিস্ফুরণের সহায়তা করিবে মাত্র; আপনার শক্তি কোন পথে নিয়োজিত করিলে পরের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা সংগৃহীত হয়, তাহা কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিলে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধিত হয়, সে সন্ধান মন উৎকর্ষিত না হইলে কেহই দিতে পারে না; সেইজন্যই সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়োজন। কিন্তু মনের স্বাস্থ্যকে আমরা (বাঙালী জাতি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীরূপ লবণের বোঝা ও তোতা পাখীর মত ধর্ম্মজ্ঞানহীন অবাস্তব অসার ভেদজ্ঞান-বিধায়ক মুখস্থ করা বিদ্যার মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছি। ইহাতে মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে না, উহার উন্নতিও হয় না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি, শ্রদ্ধা—এই ছয় প্রকার চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ, ধর্ম্ম-চিন্তা, স্বাধ্যায় ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। আসল বাতুলবৎ মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে গিয়া আমরা প্রায়শঃ শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া যাই। বাঙ্গালার প্রত্যেক ছাত্রেরই Buchu র সেই সারগর্ভ বাণী সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখা উচিত+—"Learning in a broken body is, like a sword without a handle." (বাঁট বা হাতলহীন তলোয়ারের মত ভগ্ন দেহে বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।) শরীর মনের আধার; চিত্তবৃত্তির দ্যোতনা হয় দেহ-যন্ত্র মধ্য দিয়া। সুতরাং দেহকে সর্ব্বদা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ না রাখিলে মন আপনার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম সাধন করিতে পারে না। ভগ্ন ও সছিদ্র কলসীতে কতক্ষণ জল ধরিয়া রাখা যায়? ফলতঃ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান একান্ত কর্ত্তব্য; তাহাতে মনও অনেক সময় সুস্থ থাকে। এই জন্য প্রথমতঃ শারীরিক ব্যায়াম ও দ্বিতীয়তঃ নিয়ন্ত্রিত পুষ্টিকর আহার গ্রহণ ও বিহারে সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন।

প্রধানতঃ লোকে তিনটি আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া ব্যায়ামে তৎপর হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা দেহের কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি করিবার ও সুস্থতা বজায় রাখিবার বা কোন বিশেষ রোগ আরোগ্য করিবার জন্য ব্যায়াম করেন; ইহাকে ইংরাজীতে physical exercise বলা

হয়। স্যাণ্ডো, বার্ণার ম্যাক্‌ফ্যাডেন্, আর্ল লীডার-ম্যান, হেকেন্‌স্মিথ্ প্রোফেসর রেলো, মৌদি, কাপ্তেন ফণীন্দ্র গুপ্ত, মংচিত্তুন প্রভৃতি এই প্রথম শ্রেণীর ব্যায়ামকারী। বর্তমান প্রবন্ধে এই শ্রেণীর ব্যায়ামের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা—কেবল অঙ্গসৌষ্ঠব ও দৈহিক লাবণ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা প্রকার ব্যায়াম করেন; তাহাকে ইংরাজীতে physical culture বলা যায়। আমেরিকার পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আজকাল এই শ্রেণীর ব্যায়ামে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তথায় অঙ্গসৌষ্ঠব-সাধনোপযোগী নিত্যনূতন ব্যায়ামের কৌশল ও ব্যায়ামশালার উদ্ভব হইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা পালোয়ান্ বা কুস্তীগির হইবার জন্য ও সাধারণ্যে নিজ অসাধারণ শক্তি-কৌশল দেখাইবার জন্য নানারূপ ব্যায়াম চর্চ্চা করেন; ইঁহাদের অনেকেই শক্তিচর্চ্চা একটা অর্থকরী ও জীবন-নির্ব্বাহ ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর লোকদিগকে athlete নামে অভিহিত করা হয়। কাল্লু, কিঙ্কড় সিং, গোবর গুহ, ভীম ভবানী, রামমূর্ত্তি, মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। আপাতঃদৃষ্টিতে এই তিন শ্রেণীর লোকদের ব্যায়ামে কার্য্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও, সকলেরই এক সাধারণ উদ্দেশ্য—দেহকে সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও শক্তিশালী করিয়া তুলা।

এক্ষণে ব্যায়াম অর্থে আমরা কি ও কতখানি বুঝি—তাহাই একটু বিশদভাবে বলিতে চেষ্টা করিব। যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক শ্রম জয় ও করিবার স্থায়ী শক্তি জন্মে এবং যাহা মনের অনুকূল ও দেহের বলবর্দ্ধক তাহাকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে রাজবল্লভ, চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশকার, বাগভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বিজ্ঞানশাস্ত্রকারগণ নানা কথা কহিয়া গিয়াছেন এবং নানা ভাবে তাহার গুণাগুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফল কথা তাঁহাদের মতে, ব্যায়াম দ্বারা দেহ লঘু, কর্ম্মে সামর্থ, ক্লেশ সহিষ্ণুতা, শরীর স্থির, যৌবনাপন্ন, বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধি নাশ ও পাকাশয়ে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির কোন রোগ জন্মে না বা সহজে তাহাকে কোন সংক্রামক রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা, বিরুদ্ধ ভোজন করিলেও অত্যল্পকাল মধ্যে পরিপাক হয়, স্থূলতা নাশ বা অসম্ভবরূপ মেদোবৃদ্ধি প্রশমিত হয়, এবং 'বিভক্ত ঘন গাত্রতা' (শরীরে পেশল যেরূপ হইলে সুন্দর দেখায় তাহা) জন্মে। উপযুক্ত পরিমাণে ও ব্যক্তিগত সামর্থ অনুসারে ব্যায়ামে সর্ব্বদা সুফল দর্শে, নতুবা অতিরিক্ত অভ্যাসে

নানারূপ উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় ; যথা—কাশরোগ, জ্বর, সর্দ্দি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বমন, রক্তপিত্ত প্রভৃতি।

এখন আমরা সাধারণের উপযোগী কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ব্যায়াম-কৌশলের বিষয় বলিব। এগুলি বারো হইতে উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি নিয়মিত অভ্যাস করিলে অল্পকাল মধ্যে নিশ্চিত ফল প্রত্যক্ষ হইবে। বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকদের খেলা-ধুলা, দৌড়ঝাঁপ সাঁতার, সাইকেল চালানো প্রভৃতি ব্যতীত কোন প্রণালীবদ্ধ নির্দ্ধারিত ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন নাই। উনত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণও ব্যায়াম সুরু করিতে পারেন; কিন্তু তাহার ফল প্রত্যক্ষ হইতে একটু দেরী লাগিবে এবং ব্যায়াম করিয়া হঠাৎ বন্ধ করিলে বাত, হৃদি-দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি ব্যাধি জন্মাইতে পারে। সাধারণতঃ ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের দেহের খুব সামান্য বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়; অধিকাংশেরই শরীরের বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না—সমভাবে থাকে; বাঙ্গালী বাবুদের বরং কিছু কিছু করিয়া কমিতে আরম্ভ করে। যাঁহারা উনত্রিশ বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই ব্যায়াম সুরু করিয়াছেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যায়াম চালাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে চল্লিশের পর হইতে ব্যায়ামের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে পঞ্চাশের পর ভ্রমণ ব্যতীত আর কোন সশ্রম ব্যায়াম করা উচিত নহে।

এইবার ব্যায়াম করা সম্বন্ধে কয়েকটী মোটামুটি উপদেশ দিয়া আমরা প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

(১) মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম করা সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। শীতকালে একটা গেঞ্জী গায়ে বা ঘরের মধ্যে খালিগায়ে করা যায়; গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদা খালিগায়ে ব্যায়াম করিবে; একবারে নগ্ন হইয়া ব্যায়াম করিতে পারিলে ভাল হয়, তাহাতে বাধা থাকিলে লেঙট্ পরিয়া করা যাইতে পারে। ব্যায়াম জিনিষটিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে একখানি বা সম্মুখে-পশ্চাতে দুইখানি বড় আয়নার সম্মুখে উহা প্রত্যহ অভ্যাস করা উচিত যখনই কোন অঙ্গ বিশেষের পেশী ব্যায়ামের সময় সঙ্কোচনের ফলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তখনই আয়নার মধ্য দিয়া ঐ অংশটির প্রতি অপলক একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে থাকিবে।

(২৬) ব্যায়ামের সময় মনঃসংযোগই প্রধান বিষয় ব্যায়াম করিতে করিতে মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে ব্যায়ামের সমূহ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরে দুই প্রকার পেশী আছে; এক প্রকার স্বেচ্ছানুবর্ত্তী (Voluntary), অন্যপ্রকার স্বতঃপ্রবৃত্ত (Involuntary) পেশী। আমাদের দেহের উপরের মাংসলভাগ এই স্বেচ্ছানুবর্ত্তী পেশী দ্বারা গঠিত এবং উহা দ্বারাই আমাদের অস্থিময় কঙ্কালটী অবৃত থাকে; এই পেশীগুলী আমাদের রবিবাবুর সেই পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার মত একান্ত আজ্ঞাধীন; আমরা যখন যাহা বলি, ঠিক তাহা করে। আমাদের একই প্রকার হুকুম তামিল করিতে করিতে তাহারা এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, সেই মনের মধ্যে উদয় হইতে না হইতে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই কাজ করিয়া বসে। অন্যদিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংশপেশীগুলি আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে না এবং তাহারা সর্ব্বদা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। আমরা ইচ্ছা করিয়াও ইহাদের গতি বা ক্রিয়া রোধ করিতে পারি না, এমন কি অচেতন অবস্থায়—ঘুমের সময়ও ইহাদের কার্য্য অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। পাকস্থলী Stomach অন্ত্র (Instestines), হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর পেশী উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। আমাদের প্রত্যেক শরীরের স্বেচ্ছানুবর্ত্তী ও স্বতঃপ্রবৃত্ত পেশীর মুটামুটী সংখ্যা পাঁচশত। এখন, প্রথম শ্রেণীর পেশীগুলিকে অধিকতর কর্ম্মঠ ও আজ্ঞাবাহী করিয়া তুলাই ব্যায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য মানসিক একাগ্রতা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ যদি ব্যায়ামের সময় মনঃসংযোগ করিয়া মনে মনে বলা যায়,—"আমার পেশীগুলি প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া অধিকতর পুষ্ট ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠুক"—,তাহা হইলে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী পেশীগুলির স্বাভাবিক আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বশতঃ আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয় ও এইরূপ ক্রমাগত আজ্ঞা পালনের চেষ্টা একদিন স্থায়ী কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়। মানুষের মনের সহিত শরীরের কি নিবিড় সম্বন্ধ তাহা এই ঘটনা হইতেই বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক ব্যায়াম করিবার সময় তুমি যে ব্যায়াম করিতেছ (অন্য কিছু করিতেছ না বা ভাবিতেছ না) এবং তাহা শরীরের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই করিতেছ, একথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। সেইজন্য নির্জ্জন স্থান খুঁজিবে।

(৩) ব্যায়াম কখনও কষ্ট-কাঠিন্য করিয়া অভ্যাস করিবে না। ব্যায়ামের সময় কখনও মুখ সিঁটকাইও না ঐ সময় মুখ খানি সৌম্য, শান্ত ও সহাস রাখিবার চেষ্টা করিবে।

মোট কেনার মত করিয়া কখনও কোনদিন ব্যায়াম করিবে না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ধীরভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। ঐ সময় কোন অঙ্গ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইতস্ততঃ দ্রুত সঞ্চালন করিবে না, বা ব্যায়াম নিযুক্ত প্রত্যাঙ্গাদিকে হঠাৎ ঝাঁকানি দিবে না।

(৪) নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে। হঠাৎ জোরে শ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবে না; অতি ধীর নিঃশব্দে করা কর্ত্তব্য। ব্যায়াম-নিযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন বা ঐ স্থানের মাংসপেশী আকুঞ্চন প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তালমান্ বজায় রাখিয়া শ্বাস গ্রহণ করা যাইতে পারে; ইহার বিপরীত হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। আবার কোন কোন ব্যায়ামের যৌগিক 'কুম্ভক' বা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন হয় মো'দ্দা কথা স্থানীয় মাংশপেশী ও নিঃশ্বাসের সহিত যেন গায়ক ও বাদকের সম্বন্ধ অটুট থাকে।

(৫) কতগুলি ব্যায়াম বিধি একাদিক্রমে কষ্টসাধ্যভাবে পালন করিতে যাওয়া বোকামি মাত্র; তাহাতে অনেক সময় অনেক কুফল দর্শে, প্রত্যেক প্রকারের পর পর অন্ততঃ আধ মিনিট (সময় বিশেষে এক মিনিট) করিয়া বিশ্রাম লওয়া ও সমস্ত মাংশপেশী গুলিকে শ্লথ করিয়া দেওয়া উচিত।

(৬) আয়ুর্ব্বেদ মতে শীতকালই ব্যায়ামের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়; তন্নিম্নে হেমন্ত বসন্ত কাল। সকল ঋতুতেই প্রতিদিন ব্যায়াম করা চলে, তবে সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম লওয়া যাইতে পারে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতে শক্তির অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করা উচিত। অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিহ্বা ঈষৎ শুষ্ক ও পিপাসা বোধ না হয় ও কপাল, নাসিকা, গাত্র সন্ধি ও বগলদুইটিতে অল্প অল্প ঘর্ম্মোদ্গম হয়, তখনই অর্দ্ধ শক্তি পরিমাণ ব্যায়াম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ ভাবে শ্রান্ত হইলেই (কি শীত কি গ্রিষ্ম) তৎক্ষণাৎ ব্যায়াম পরিত্যাগ করা উচিত। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই ব্যায়াম উপকারী; অসুস্থ ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র ব্যায়ামের বিধান দেওয়া আছে, তৎসম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে। কাসরোগী, শ্বাসরোগী, জরবানরোগী, ক্ষয়, রক্তপিত্ত ও শোষরোগী কখনও নিম্নলিখিতরূপ ব্যায়াম করিবে না। যে কোন ব্যায়ামই হউক না কেন, স্নান-ভোজনের পর বা রতি ক্রীড়ার পর ব্যায়াম কদাচ অভ্যাস করিবে না, তাহাতে শরীরের যথেষ্ট অপকার হইয়া থাকে। এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণও আয়ুর্ব্বেদের সহিত প্রায় একমত।

(৭) প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালই ব্যায়ামের পক্ষে প্রশস্ত সময়; অন্য সময় করিলে শরীরের কোন হিত হয় না। শয্যা ত্যাগ করিয়া খালিপেটে ব্যায়াম করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। শক্তি ও প্রয়োজন বুঝিয়া দুইবেলা ১৫—২০ মিনিট কাল করিয়া ব্যায়াম করা যাইতে পারে। ছাত্রেরা একবেলা ব্যায়াম করিলেই যথেষ্ট; কারণ উহার উপর স্কুলে ড্রিল করিতে ও বৈকালে ফুটবল প্রভৃতি খেলা করিতে হয়। তাহাতেই দুইবেলা পূর্ণভাবেই ব্যায়ামের কাজ সাধিত হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল ফুটবল প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী খেলায় শরীরের অতিরিক্ত (violent exercise) সাধিত হয় তাহা শরীরের পক্ষে প্রায়ই উপকারী না হইয়া বরং অপকারী হইয়া উঠে। আমাদের দেশী কপাটি, হডু গুডু, কিৎকিৎ প্রভৃতি খেলা এ দেশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। বাঙালীর পক্ষে প্রতিবারে অর্দ্ধঘণ্টার বেশী সময় ব্যায়াম করা উচিত নহে; কিন্তু প্রথমে পাঁচ মিনিট হইতে আরম্ভ করিতে হয়। উনত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ব্যায়াম ক্রমশঃ বাড়ান যাইতে পারে; তৎপরে চল্লিশ বৎসর পর্যান্ত ব্যায়ামের পরিমাণের যেন হ্রাস বৃদ্ধি না হয়! চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে উহার মাত্রা ক্রমশঃ কমাইয়া একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে হয়। ব্যায়াম করার অব্যবহিত পরেই কখনও স্নানাহার বা জলপান করিবে না। ব্যায়ামের পরই স্নানাহার ভাল; কিন্তু অন্ততঃ গাত্রের ঘর্ম্ম শুকাইলে হৃদ্‌স্পন্দনের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসিলে (অন্ততঃ ১৫ মিনিট পরে) তবে স্নান করা বিধেয়। স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে উত্তমরূপ তৈল মর্দ্দন ও স্নানের সময়—ভাল করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। আহারের পূর্ব্বে লবণ ও আদা খাইয়া লইলে ভাল হয় ও আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবে। আহারের ২৷৩ ঘণ্টা পর পর এক গ্লাস করিয়া ঠাণ্ডা জল পান করিও।

(৮) ব্যায়ামের সময় মাংসপেশীর আকুঞ্চন যতদূর সম্ভব সম্পাদন করিবে—যাহাতে পেশীটি ফুলিয়া উঠিয়া তোমাকে, যৎসামান্য যন্ত্রণা দিতেও কুণ্ঠিত না হয়। ব্যায়ামকারীর অতিরিক্ত ঘি, দুধ খাইবার স্বচ্ছলতা থাকিলে—খাইবে, নচেৎ প্রয়োজন নাই। সাদা-মাঠা শাক-চচ্চড়ী ভাত খাইয়াই শরীরের শক্তির উদ্বোধন হইবে; কিন্তু সকল কাজে নিয়মনিষ্ঠ হইবে। ব্যায়ামের সময় কক্ষের দরজা জানালা যতদূর সম্ভব মুক্ত করিয়া দিবে ও কদাচ মুখ দিয়া নিশ্বাস টানিবে না। মুক্ত বায়ু যতদূর পার সেবন করিবে; কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডা

বা রৌদ্র লাগাইও না, শীত, বর্ষার সময় উপযুক্ত পরিমাণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে ! নিয়ম রক্ষা, অধ্যবসায়, ও একাগ্রতা ব্যায়ামে সাফল্যলাভের তিনটি প্রধান উপায়—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

এইবার দুই চারিটি সহজসাধ্য সর্ব্বসাধারণের উপযোগী আশুফলপ্রদ ব্যায়াম-কৌশলের কথা বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট এবারকার মত বিদায় গ্রহণ করিব।

(১) দুইটি পায়ের গোড়ালী একত্র করিয়া পায়ের পাতা ত্রিকোণাকারে ঈষৎ ফাঁক করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, হাত দুইটি উভয় পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখ। তার পর হাত দুইটি সোজাভাবে সম্মুখ দিয়া মাথার উপর ধীরে ধীরে তুলিতে থাক ও ঐ সঙ্গে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে থাক। তার পর নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া গোড়ালী দুইটি ঈষৎ উঁচু করিয়া ধরিয়া, হাতের পেশীগুলি রীতিমত শক্ত করিয়া যেন উপরের কড়িকাঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া স্পর্শ করিতে যাইতেছ, এইরূপভাবে পরিগ্রহ কর। এইভাবে ৫।১০ সেকেণ্ড থাকিয়া হাত দুইটি নীচের দিকে নামাইয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন ও ঐ সঙ্গে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর ও মাংসপেশীগুলি আলগা করিয়া দাও। এই কৌশলটিও নিম্নলিখিত—অন্যান্যগুলি প্রথমে তিনবার বা পাঁচবার হইতে আরম্ভ করিবে।

(২) পূর্ব্ববৎ সহজ ও সোজাভাবে দাঁড়াও, কিন্তু দক্ষিণ পদটি সম্মুখ দিকে ঈষৎ অগ্রসর করিয়া রাখ। এক্ষণে নিঃশ্বাস টান ও সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বের দিক দিয়া সোজাভাবে হাত দুইটি মাথার উপর দিকে ধীরে ধীরে তোল ও মনে মনে ভাব যেন হাত দিয়া কোন ভারী দ্রব্য মস্তকের উপর উঠাইতেছ। তারপর নিঃশ্বাস না বন্ধ করিয়াই শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে হাত দুইটি পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন। ঐ ভাবে বাম পদ সম্মুখে আগাইয়া অভ্যাস কর।

(৩) প্রথমবারের ন্যায় গোড়ালি একত্র করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। এক্ষণে নিঃশ্বাস টানিতে আরম্ভ কর ও তৎসহিত হাত দুইটি সোজা করিয়া পার্শ্বের দিক তুলিয়া স্কন্ধের সহিত সমকোণের (Right angle) সৃষ্টি কর। তারপর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া গোড়ালির উপর ভর দিয়া যাতার (Pivot) সূক্ষ্মাগ্র কীলক বা ঘড়ীর কাঁটার মধ্যগত আলএর মত শরীরটি এক পার্শ্বে যত দূর পার ঘুরাও, তারপর পুনরায় অন্য পার্শ্বে অর্দ্ধ চক্রাকারে ঘুরাও (অবশ্য পার্শ্ব-

বিস্তৃত হাত দুইটিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া যাইবে)। তারপর হাত নামানর সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া এস।

(৪) মেঝে বা বিছানার উপর চিৎ হইয়া লম্বালম্বি শুইয়া পড়। দেহের সমস্ত পেশী শ্লথ করিয়া স্থির সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে থাক। এক্ষণে ধীরে ধরে গভীরভাবে নিঃশ্বাস টান ও সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বুকের উপর খাড়া করিয়া উঠাও; উঠাইয়া মুষ্টি খুলিয়া হাতটি আলগাভাবে থপাস করিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দাও, কিন্তু ঐ সঙ্গে অতি ধীর শ্বাস পরিত্যাগ কর। তারপর দুই এক মিনিট কাল চুপ করিয়া পড়িয়া থাক; পুনরায় উপরি উপরি উক্ত ব্যাপারটি অনুষ্ঠান কর। শ্রান্তি, আলস্য, স্নায়বিক উত্তেজনা ও পেশীর জড়তা টান্‌টান্ অবস্থায় এই ব্যায়ামটি অমোঘ ফলদায়ী।

(৫ ক) সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে হাঁটু দ্বয় ভাঙ্গিয়া গোড়ালি উঁচু করিয়া দুইহাতে ভর দিয়া উবুর হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়! এই অবস্থায় অন্ততঃ অর্দ্ধ মিনিট কাল অবস্থান কর। তারপর মাথাটি সম্মুখের দিকে অবনমিত করিয়া এবং শরীরের সমস্ত ভার হাত দুইটির উপর দিয়া পা দুইটি একত্র করিয়া পিছনের দিকে সবেগে বিলম্বিত করিয়া দিয়া অবস্থান কর।

(৫ খ) এইরূপ ভাবে প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল অবস্থান করিয়া, প্রথমে কটি-দেশটি নীচু ও পরে হাত দুইটি ভাঙ্গিয়া বক্ষ ও শীর্ষদেশ নীচু কর; পুনরায় হাত দুইটি সোজা করার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ ও শীর্ষদেশ উঁচু করিয়া কটিদেশ উঁচু কর; এইরূপ কয়েক বার অভ্যাস কর। শ্রান্তি বোধ করিবামাত্র হাতের উপর ভর দিয়া পা দুইটি ভিতরদিকে মুড়িয়া পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া এস; পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী বিশ্রাম কর।

আজ এই পর্য্যন্ত। আগামীবারে ব্যায়াম কৌশল বিষয়ে আরো দুই চারি কথা বলিতে বাসনা রহিল।

'স্বাস্থ্যসমাচার' শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

মরণ আড়াল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কার্ত্তিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

নবম পরিচ্ছেদ।

অলকার অসুখ হইয়াছিল খুব বেশী। আমরা কলিকাতা পৌছিয়া দেখিলাম—তিনি আরোগ্যমুখী। তখনও অতিশয় দুর্ব্বল,—রোগশয্যা ত্যাগের শক্তি নাই।

মেয়েটী বেশ। তাঁহার রক্তহীন পাংশুল বদন-মণ্ডলে এমন একটা স্নিগ্ধতা, বিশেষত্ব বিরাজিত, যাহাতে লোককে আকৃষ্ট করে। কথা বলেন কম,—আমার সহিত তাঁহার কয় দিনেরই বা পরিচয়, বলিবারই বা কি আছে, শক্তিও নাই,—তবু মনে হইতেছিল,—আমি যেন তাঁহার কত দিনের পরিচিত,—আত্মীয়। সহানুভূতিতে হৃদয় আমার পূর্ণ হইয়া উঠিত,—মনে পড়িত তাঁহাদের সে দিনের কথা,—তাঁহাতে ও অতুলে! কোথায় আজ অতুল। বেচারী জানে না অতুলের দশা। সহ্য করিতে পারিবেন কি ইনি অতুলের অমন ভাবের মৃত্যু! হয়ত—অতুলের অপমৃত্যুর রহস্য চিরকাল ইঁহার অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে কিন্তু বন্ধুর মহাপ্রস্থানের নির্ম্মম আঘাত সহ্য করিতে হইবে ইঁহাকে অচিরেই। ইঁহার শরীর মনের অবস্থা দেখিয়া সেই কথাই আমার মনে হইত,—কিবা হয়! সার্থান্ধ ডাক্তার, একটুকুও কি দয়ামায়া নাই তোমার প্রাণে! এমন সুরভি সুন্দর নির্ম্মল কুসুমকে লোকে পদদলিত করে কোন প্রাণে!

সাধ্য নাই কাহারও ডাক্তারের বাহ্যিক ব্যবহারে তাঁহার অন্তরের ভাব ধরিতে পারে অলকার সহিত তাঁহার অতি অমায়িক মোলায়েম ব্যবহার; 'মা' না বলিয়া কথা বলেন না,—তাঁহাকে সুখী করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট যেন। অভাব নাই কিছুরই।

অলকাকে সর্ব্বদা দেখিবার অবসর ডাক্তারের কমই—তাঁহার অনন্ত কাজ,—দস্তুর মত বিজিনেছ (কারবার) এখানে, ছয় সাতটা দোকান—একটা লেবরেটারী, সেখানে বহু প্রকারের পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়,—তাঁহার অধীনে তিনটা বড় ডাক্তার,—ইহা ব্যতীত তাঁহার অন রকমের আরও নাকি কারবার আছে। ডাক্তারের অবসর কোথা? কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে

সকল ও কর্ম্মচারীর ই পরিচালনা করে—ইচ্ছা করিলে কি আর ডাক্তার কন্যার ন্যায় প্রিয়তমা অলকাকে রীতিমত দেখিবার শুনিবার অবসর করিতে পারিতেন না? ডাক্তার রোগী গৃহে দেখা দেন দেন ঘড়ি ধরিয়া। সেই সময়টুকুর মধ্যেই আপ্যায়িত আলাপনে আত্মীয়তার একশেষ করেন। অলকা কি ভাবেন জানি না, আমার কিন্তু সন্দেহাকুল সংকীর্ণ মনে মনে হয়, একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিতেছে। এখানে আসিবার পর ডাক্তার আমাকে সে প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন নাই। আমি কেন জিজ্ঞসা করিব। তাঁহার আদেশে বাসায় বসিয়াই দোকানের হিসাবপত্র কিছু কিছু দেখি—দিনে তিন চারি ঘণ্টা;—অবশিষ্ট সময়টা একটানা অবসর। বহির্জগতের সহিত আমার সম্বন্ধটা দাঁড়াইয়াছে অদ্ভুত। বলিতে কি এখনও মনের ভয় কাটে নাই,—কোন সূত্রে আবার কিবা হয়,—বাসাতে বসিয়াই দিন কাটে। জনসমুদ্র মহানগরীর মধ্যে অবস্থান করিয়াও আমি একা। সময় সময় অলকার কক্ষে কাটাই—সেটাও ডাক্তারের ইঙ্গিতে। রোগী শুশ্রূষা আমার ছোট বেলা হইতে বাতিক। নার্সেরই মত রোগীর ঔষধ পথ্য যাহাতে যথা সময়ে দেওয়া হয়, তাঁহার অভাব অসুবিধা যাহাতে না হয় সে বিষয়ে আমার খর দৃষ্টি। জেলে নয়টা বৎসর খাটিয়া আর কিছু না হ'ক নিয়মের কাজ ঠিক সময়মত করিবার শক্তি আমার খুব জন্মিয়াছে। অলকা অতি ভদ্র,—তাঁহার অমন অবস্থাতেও আমার সেবা গ্রহণে কখনও সঙ্কুচিত হন—আমি তাহার জবাব দিতে জানি,—অনেক সময়ই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলি না,—আমি যখন তাঁহাদের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছি,—তখনও পরিবারের একজন বলিয়া কি দাবী করিতে পারি না? কেন কুণ্ঠিত হইবেন তিনি আমার সেবা গ্রহণে। শিষ্টাচারের আদানপ্রদানে আমাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার ভাব সঞ্জিবীত হইয়া উঠিতেছে, বেশ অনুভব করি কিন্তু তাহাতে ত আমাকে শান্তি দিতে পারে না। জানি আমি, ভবিষ্যতে অলকার জন্য কি আছে। মনে পড়ে আমার,—বাঙলার মেয়েদের কথা,—স্বাধীনা, শিক্ষিতা হইয়াও তাঁহারা কত অধীন! আজ যদি কন্যা না হইয়া অলকা হইতেন পিতার পুত্র সন্তান,—এ অবস্থা ঘটিত কি! সেই সঙ্গে ভাবি নিজের কথা,—পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি করিলাম! হ'ক বাঙ্গলা সোনার—জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান—কিন্তু আবহাওয়া তাঁর নয় গর্ব্ব করিবার মত,—তাঁর প্রাচুর্য্য বরং করিয়াছে—সন্তানকে তাঁর অলস,—কর্ম্মশক্তিপরাঙ্মুখ, পরপ্রত্যাশী, পরাধীন। বঙ্গসন্তান নয় মানুষ,—মনুষ্যধর্ম্মে ফুটিয়া

উঠিবার এত বাধা,—জগতে কোন দেশে আছে কি না জানি না। সমাজ,—আচার ব্যবহার অধিবাসীর আত্মীয়তার গর্ব্ব অন্যে করে করুক আমি ত পারিব না! সমাজ দিখিয়াছি নিভার মাতৃ-উক্তিতে,—সহানুভূতির পরিচয় পাইয়াছি জেলে যাইবার পূর্ব্বে,—আর জাত্যাভিমান বর্ণাশ্রমের পূর্ণ পরিণতি জেলে,—ভট্টাচার্য্যের শাস্ত্র ছেদনের যন্ত্র জেলের রেগুলেসন,—জগন্নাথ-ক্ষেত্র—হাড়ী ডোম ব্রাহ্মণ সব একাকার,—শক্তের চাপে সব তরল। শক্তিহীন জাতি কাপুরুষ—পুরুষ নয়,—শিক্ষায় তাঁহাদের মনকে কতখানি উন্নত করিতে পারে বিলাতফেরত বাঙ্গালী ডাক্তার গুপ্ত তাহার উদাহরণ। অভিশপ্ত জীব আমি, আরও যা কত দেখিতে হয়—সুখ কি আমার জীবনে নাই! সুখ ছিলেন যাঁহারা, শান্তি ছিলেন যিনি—কোথায় তাঁহারা? সমস্ত ভাবনা চিন্তা এলোমেলো হইয়া যায়—প্রাণটা কেমন করে—অস্থির হইয়া এ নরকে ডুবিয়াও ভাবি কোথায় নিভা কেমন আছ বা! নরহরিদা বাঁচিয়া আছ কি। তাহাদের নিকট ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু আজও যে আমি বন্দী,—অবস্থার দাস।

অদৃষ্টটা দেখুন—অবশেষে জুটিলাম যদি এখানে—এখানেও সেই চিত্র,—যাকেই মনে ভাবি আপনার তাঁরই বিপদ! নিজের উপর ঘৃণা জন্মে—সত্যিই মনে হয় আমি বুঝি শনি, আমার দৃষ্টিতে সমস্ত ছারখার হইয়া যায়,—অলকার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে ভয় হয়!

আষাঢ়ের প্রথম। দিনটা সে দিন বিশ্রী,—আকাশ ভরা মেঘ,—অবিরত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার! সম্মুখের 'আল্‌সায়' নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া একদল কাক কাতর কণ্ঠে থাকিয়া থাকিয়া কা—কা করিতেছে। একখানা বই হাতে করিয়া দোতালার বারাণ্ডায় বসিয়া আছি,—পড়িবার প্রবৃত্তি নাই—যত রাজ্যের চিন্তা! অলকাও একখানা ইজিচেয়ারে গরম কাপড়ে আপাদকণ্ঠ আবৃত করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নীরবে আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন। বদনে বিষাদের ছায়া—মনেও বুঝি তাঁহার বাহিরের মতই অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল একটা কথা প্রসঙ্গ পাড়িয়া তাঁহার চিন্তা স্রোতে বাধা দেই,—কিন্তু কথা জুটিতেছিল না!

অবশেষে তিনি নিজেই সে নীরবতা ভঙ্গ করিবেন—"এমন ভাবে পড়ে থাকা বড় কষ্টের নয় কি মিষ্টর গুপ্ত?"

"নিশ্চয়! কিন্তু কি করবেন বলুন—শরীর ত আপনার আজও ঠিক হয় নি।"

"আর শরীর,—শরীর ঠিক হলেই বা কি করতেম,—বড় জোড় একটু ঘোরাফেরা, তার বেশী আর কি !"

ঔদাস্যে তাঁহার মনটা পূর্ণ হইয়া আছে। কি উত্তর দেব ! বলিলাম "দিনটাও হয়েছে যে বিশ্রী,—মনটাও কেমন বিশ্রী হয়ে যায় !"

তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন,—আমার মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "ঠিকই মিষ্টার গুপ্ত ! ভাল লাগে না কিছুই,—অনেক সময়ই মনে হয় আপনায় বলি,—একটা কথা,—আমার রোগের সময় আপনার চেষ্টা, আপনার সহৃদয়তা আমাকে সে সাহস দেয় কিন্তু ইচ্ছা হয় না বল্‌তে—আমার কথা নয় সুখের—সকলকে জানাবার নয়—পাছে.........।"

মানুষের মন বুঝি প্রতিধ্বনিপরায়ণ—আমার মনেও ঐ কথা,—আমি তাঁহার বাক্য শেষ হইবার অবসর না দিয়া বলিলাম—'কেন তা মনে কর্‌ছেন,—আমি আপনাদেরি একজন—আপনাকে ত আমি অন্য ভাব্‌তে পারি না।'

'বুঝেছি তা তাইত বল্‌তে সাহস পেয়েছি—কিন্তু 'আপনাদের' হলে আমার কাজ হবে না,—কিছু মনে করবেন না মিষ্টর গুপ্ত—এখনও আপনি সব জানেন না—আমি বড়ই অসহায়—আমাকে কি এ সময় সাহায্য করে অনুগৃহীত করবেন মিষ্টর গুপ্ত !'

বলিলাম "কেন অত বলছেন—আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন আপনি—যতদূর শক্তিতে কুলোবে,—তার একটুও ক্রটী করবো না,—আমি সকল কথা না জানি—অনুভব করেছি—আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুর দরকার, আমি তার অযোগ্য হব না,—"

'জানি,—কিন্তু আপনার এতে জড়াতে ইচ্ছা হয় না—কিছু মনে করবেন না,—বড় বিপদে পড়েই আপনার আশ্রয় নিচ্ছি—এতে আপনার অপকার হবে না—বল্‌তে পারি না; অবশেষে আপনার অপকারের কারণ হব মিষ্টর গুপ্ত !"

"আমার অপকার,—সংসারে আমার কি আছে,—আত্মীয়বান্ধবহীন—পথের ভিখারী আমি,—বেশী কি আর হ'তে পারে আমার,—আজ এ আশ্রয়ে জুটেছি—কাল নয় অন্য দোরে যেতে হবে,—লাভলোকসানের বিচার আমার এইটুকু,—আমার অপকার কেউ

করতে পারবে না, আমার জীবনের কাহিনী জানতেন যদি—এ কথা আপনার মনেও উঠ্‌ত না—আমার বিষয়ে অপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আপনার যদি একটু উপকারে আসতে পারি ধন্য মনে করবো নিজকে।'

তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া—অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—"সে আপনার উদারতা মিষ্টর গুপ্ত। কিন্তু এ যে হবে আপনার মনিবেরই বিরুদ্ধে,—বলতে ভয় হয়,—আমার একজন পরম আত্মীয়—এঁদের বিষ নজরে—ওঁর সঙ্গে বুঝি বচসা হয়ে,—কোথায় চলে গেছে, খোঁজ পাচ্ছি না অনেক দিন—যে খেয়াল সে পাছে বা কি করে বসে—তাঁর খোঁজ আপনাকে খুব গোপনে করতে হবে,—কিছুতেই সুস্থির হতে পার্‌ছি না—রোগ হতেও তাঁর চিন্তা আমাকে অস্থির করছে—নাম তাঁর অতুলচন্দ্র সেন। আপনাদেরই বয়সী। কি করে তাঁকে বুঝাব,—আমার কাছে তাঁর ফোটো আছে,—তা দেখে কি চিন্‌তে পারবেন না!"

"অতুলচন্দ্র সেন,—গোঁসাইগঞ্জে তাঁকে দেখেছি,—আমি গোঁসাইগঞ্জে ছিলাম—সেইখানেই ডাক্তারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়,—তারপরে না ওঁর কাজ নিয়েছি।"

"তিনিই,—তবে ত জানেনি তাঁকে।"

মনে মনে বলিলাম, জানি সব, কোথায় আর সন্ধান মিলিবে বন্ধুর তোমার!—বলিতে প্রাণটা ফাটিয়া যায়,—প্রাণপাত করিলেও ত পাইবে না তাহাকে।

সিঁড়িতে শব্দ হইল। ডাক্তার উপস্থিত হইলেন। অভিবাদন করিলাম। তিনি আজ যেন আরও গম্ভীর। অলকার নিকটে উপস্থিত হইয়া—তাঁহার মাথায় হস্ত দিয়া—বলিলেন "আজ কেমন আছ মা? নানা কাজ,—তোমার কাছে একটু বস্‌তেও কি পাই। নিখিল আজ ঢাকা হতে ফিরেছে—হয় ত তোমার এখানে এক্ষুনি আসবে—ও এখানে থাকলে তোমার একটা কথাবার্ত্তা বলবার লোক হবে মা,—বড় একা থাকতে হয়—মিষ্টর গুপ্ত—না থাকলে এ অবস্থায় আরও কত অসুবিধা হতো—তা নিখিল এসেছে—এখন আর আমার ভাবতে হবে না!"

'তিনি বুঝি ঢাকা গেছিলেন—কেন জ্যাঠা মশায়?'

"সে কথা পরে শুনো মা—তুমি আজ ভাল আছ ত,— মন খারাপ করো না মা,— সংসারে বিপদ ত সদাই লেগেই আছে—বিপদ আপদে ধৈর্য্য না ধরলে চলে না,—কি অসুখটাতেই ভুগ্‌লে—শরীরের উপর দিয়ে কম ঝড়টা ত বয়ে যায় নি !"

"আমার জন্যে ভাববেন না জ্যাঠা মশায় !"

"ভাবতে কি চাই—ভবনা যে অপনি আসে মা ! তোমরা ছুটি বিনে আর আমার কে আছে,—তোমাদের দুঃখ আমি যে সইতে পারি নে,—বুড়ো বয়সে আরও না জানি কত কষ্ট লেখা আছে মা—এখন যেতে পারলে বাঁচতেম—হরি !"

"কেন ওসব কথা বল্‌ছেন জ্যাঠা মশায় ।"

"না—কিছু না—তোমাদের অসুখ বিসুখ দেখে মনে হয় !" ডাক্তার আরও চচারিটি কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন, আমাকে বলিলেন "মিষ্টর গুপ্ত একবার নীচে আসবেন কি ? নিখিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি !"

বৃদ্ধের অনুগমন করিলাম। তিনি সিঁড়িতে নামিতে নামিতে বলিলেন "কাজটা একরকম ভাল ভাবেই ঠিক করে ফেলেছি। প্রচার করবো ছোকরাটা ঢাকায় মারা গেছে, দশ দিন পূর্ব্বে ঢাকা হতে টেলিগ্রাম করিয়েছিলাম, অতুল সাঙ্ঘাতিক পীড়িত। নিখিল ছিল তখন রানাঘাটে, দু'দিন পরে তাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিলেম,—অতুলকে দেখ্‌তে—"ঢাকায় বাবুর বাজারে অতুল অত্যন্ত পীড়িত,—রওনা হও এখুনি—চিকিৎসার ক্রটী না হয় ।" সে, টেলিগ্রাম পাইয়াই রওনা হয়ে গিয়েছিল ! বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করেছিলাম—সে মৃত্যু সংবাদই এনেছে ! নিখিল পৌছবার পূর্ব্বেই ডেপ-রেজিষ্টার আফিসে অতুলের মৃত্যু রেজিষ্টরী হয়ে গেছে, যে বাড়ীটার ঠিকানা দিয়েছিলেম সেটা এখন খালি। মৃত্যুর যে তারিখ দেওয়া হয়েছে সে রাত্রে একটা মৃত্যুর অভিনয় দস্তুর মত করা হয়েছিল,—পূর্ব্বেই ডাক্তার ডাকান হয়েছিল—ঔষধপত্রের ত্রুটী হয় নি, প্রতিবেশীরাও তার সাক্ষ্য দিয়েছে। হয়ে গেছে সব বিধি মতে এতেও কি ঠিক হবে না মিষ্টর গুপ্ত ? কলঙ্কের ভয়টা আমি বড় করি—একটা ছোক্‌রার খামখেয়ালীর জন্যে কম হাঙ্গামা পোয়াতে হ'ল না ত,—এখন মেয়েটা মানলে হয়,—তার শরীরের যে অবস্থা কিছু না বললেও ত নয়,—তারিই ভালর জন্যে এ বয়সে আমার এত করতে হচ্ছে,—না করে করি কি মিষ্টার গুপ্ত,—ওর বাপ যে আমার হাতেই ওকে দিয়ে গেছেন ।"

সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—"তাই ত !"

ডাক্তার বলিলেন—"এই কথা জানাতে ডেকেছিলেম,—এখন তুমি অলকার কাছে ফিরে যেতে পার,—মেয়েটাকে কথাবার্ত্তার আগে হতেই যদি সংবাদটার জন্যে প্রস্তুত করে রাখ্‌তে পার মন্দ হয় না—না কাজ নেই—মেয়ে বড় বুদ্ধিমতী,—কি হতে কি বুঝে নেবে বা—তবে সাবধানী হয়ে থেকো.—নিখিলের মনে ঘোরপ্যাঁচ নেই,—আসল কথাটি ওকেও জানতে দেইনি, ও জানে সত্যই অতুল ঢাকায় মারা গেছে,—সে কথা কাউকে বল্‌তে মানাও করি নি, কেনই বা কোর্‌ব—যত প্রচার হয় ততই ভাল,—ও চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে এসেছে—ওর কথা সকলেই বিশ্বাস করবে। হয়ত ও কথায় কথায় অলকাকেও বলে ফেলবে,—বলে বলুক না—এক দিন বলতেই হবে যখন তখন জানানই ঠিক,—তবে মেয়েটার শরীর আজও ঠিক হয় নি, কি করা যায় বলো ! এতও সইতে হ'ল আমাকে !　[ক্রমশঃ]

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। উপরে যাইতে আমার সাহস হইতেছিল না। ধীরে ধীরে অতি অনিচ্ছায় অলকার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। আমি ফিরিতেই তিনি বলিলেন "এত শিগ্‌গির নিখিলদা আপনায় ছেড়ে দিলেন ! আলাপের সুরু হ'লে সে ত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়,—কে জানে রাত, কে জানে দিন,—জ্যাঠামশায় ওটার জন্যেই ওর ওপর বিরক্ত, আমার কিন্তু ওর ঐ সরল ব্যবহারের জন্যেই ওকে ভাল লাগে।"

আমি উত্তর করিলাম—'এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি,—অন্য কোন কাজে বুঝি ব্যস্ত আছেন। তাড়াতাড়িই বা এমন কি,—আমার মুনিব—দেখা হবেই,—জানাশোনা ত এক রকম হয়েই আছে !'

'সে ত'। আপনায় আজ অনেক কথা বলে ফেলেছি মিষ্টর গুপ্ত,—কিছু মনে করেন নি বোধ হয় ! অতুলদাকে আপনি চিন্‌তেন,—বন্ধুভাবে জানবার সুযোগ হয় নি বোধ হয়, সে এক আশ্চর্য্য লোক,—দেখা হলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন—কত উদার সে—আমার নিজের ভাইয়ের মত,—এক সঙ্গে আমরা ছোট বেলায় মানুষ হয়েছি,—তার ভালমন্দে আমায় পায় না কি মিষ্টর গুপ্ত ! সত্যিই আমি অতুলদার কষ্ট সইতে পারি নে,—আমার নিজের ভাই নেই—তাকেই ভাই বলে জানি।'

আমার উত্তর নাই। "অত উতলা হবেন না,—এত বড় অসুখের পরে—মনটাকে ভাল রাখ্‌তে চেষ্টা না করলে শরীর ...."

"কি হচ্ছে,—অলকা বড় ভুগেছ নয়? আমায় একটুও কেউ জানান নাই,—হিসেব দেখাই কি আমার বড় কাজ ছিল!"

নিখিল বাবু উপস্থিত হইলেন। আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই—আমার দিকে ফিরিয়া হ্যাণ্ডসেক করিলেন,—বলিলেন "বসুন মিষ্টর গুপ্ত—উঠলেন কেন,—খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছেন না? বন্ধু—বন্ধু—আমরা বন্ধু, সেই চোখে দেখে অনুগৃহীত করবেন আশা করি।"

"আজ্ঞে! ভাল আছেন আশা করি।"

"আজ্ঞা—আবার কি! ধন্যবাদ,—এখানে আপনার অসুবিধে হয় নি ত কোন, এ কিন্তু আপনার নিজের বাড়ীঘর।"

"তা আর বল্‌তে হবে কেন?"

"আপনি বলুন ত মিষ্টর গুপ্ত ওর এমন অসুখ—একটা সংবাদ দিতে কি নেই,—আমি বরাবর বলে আসছি,—ইনেস্‌পেক্‌শন্ টিনেস্‌পেক্‌শন্ আমার কর্ম্ম নয়,—বাঁচালেন, ভাল এখন আপনি ও সব করবেন—ছুটি দিন ছুটি দিন, যত অনপ্লেজেণ্ট টাস্ক! এই ঢাকায় পাঠালেন—ফল্‌টা হ'ল কি,—নিজ চোখে ও সব দেখবার জন্যে আমাকে কি না পাঠালেই হ'ত না—কষ্ট দেওয়া নয় ত কি—মনটা আমার ভেঙ্গে গেছে—তাও যদি গিয়া দেখ্‌তে পেতেম,—আমরা দুজনে তর্ক করি আর ঝগড়া করি। ওযে আমার কি ছিল—বাবা বুঝ্‌লেন কি,—আমি জানি—কি ছিল ও আমার! অতুল—"

অলকা অস্থির হইয়া বলিলেন—"অতুলদার কি নিখিলদা—বল কি হয়েছে তার,—বলছ কি তুমি—"

"ওঃ—তুমি বুঝি শোন নি..কিছু না—কিছু না—অতুল ভাল আছে!"

"কেন আর আমায় ভাঁড়াচ্ছ! বুঝছি আমার মন আমার কয়দিন হতেই ডেকে বলছে—বল নিখিলদা অতুলদার আমার কি হয়েছে! ওঃ—উঃ......"

নিখিল অলকাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সজ্ঞা লোপ পাইয়াছে—"মিষ্টর গুপ্ত আমি এ কি করলেম—বাবা কেন বল্লেন না—অলকা এর কিছু জানে না।"

নিখিলের অশ্রু বাধা মানিল না। আমার পক্ষেও সে দৃশ্য হইল অসহ। অলকার মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিলাম। এ সময় ডাক্তার কোথায়! নীচে বোধহয় বিজিনেছ লইয়া ব্যস্ত! মানুষ কি এত হৃদয়হীন হইতে পারে!

আরও কত দেখিতে হইবে ভগবান! ক্রমশঃ—

শ্রী—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩৩০ সাল। | ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

সুখের দিনের শেষে।

দেহের এরূপ কান্তি সুখের
চোখের জ্যোতি শান্তি বুকের
রেখে দেব রবির কাছে
মলিন হাসি হেসে।
অশ্বমেধের ভুলবো কথা
চারণগণের নূতন গাথা
ছত্র চামর সব ছাড়িয়া
সাজবো নব বেশে
মাগো আমার সুখের দিনের শেষে।

(২)

মায়া নদীর অলীক তরী
রত্ন মাণিক ল'ক মা হরি'
ছুটবো তখন চন্দন বন
কাঠুরিয়ার দেশে,
সুরভি তার দুগ্ধ দিয়ে
রাখবে মোরে রাখবে জিয়ে
সোণার ইঁটের সাধ নাহি মা
ল'ক না তাহা যে সে'
মাগো আমার সুখের দিনের শেষে।

(৩)

নৌকা থেকে মাঝ দরিয়ায়
সদাগর ত ফেলবে আমায়
শুকনো কোনো মালঞ্চেতে
লাগবো গিয়ে ভেসে,
ফুলে বাগান উঠবে ভরে
পাতবো জীবন নূতন' করে
মাল্য দেবে আবার গলে
রাজশ্রী হায় এসে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রাজতরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বৃদ্ধ বয়সে রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি যখন পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে চেষ্টিত হইতেছিলেন তৎকালে তাঁহার মন্ত্রীগণ তাঁহাকে আনিকা দুর্গে অবরোধ করেন। মন্ত্রীগণ যুধিষ্ঠিরের অবরোধের ব্যবস্থা করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যের জনৈক আত্মীয় প্রতাপাদিত্যকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। কোন কোন লেখক ভ্রম বশতঃ বিশ্বাস করেন যে এই বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ও শকদিগের শত্রু। উজ্জয়িনী অন্তর্ব্বিদ্রোহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং হর্ষ ও অন্যান্য নৃপতিকর্ত্তৃক কিয়ৎকালের জন্য শাসিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য বত্রিশ বৎসর রাজ্য সুশাসনের পর লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পুত্র জলোক সিংহাসনরূঢ় হন। এই রাজা তাঁহার পিতার ন্যায় সুযশঃ ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল তাঁহার পিতার রাজত্ব কালের ন্যায়ই গরীমাপূর্ণ ছিল। সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র যেন সুপ্রখর দিবাকরোজ্জ্বল দিবাবসানে সুনীল গগনে উদিত হইয়া নিশাকেও দিবসের ন্যায় সুখময় করিয়া তুলিয়াছিল। জলোকার পর তৎপুত্র তানজিন রাজা হন। তিনি তদীয় মহিষির মন্ত্রিত্বে রাজত্ব করিতেন। পূত সলীলা গঙ্গা ও চন্দ্রকলা যেরূপ মহাদেবের জটাজুট সুশোভিত করে এই রাজা ও রাণী তদ্রূপ ধরিত্রীকে অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জলদোপরি নানাবর্ণের সামঞ্জস্যে বিচিত্র কোদণ্ডে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকট করেন ইনিও তদ্রূপ রাজ্যের বহুবর্ণ প্রকৃতিবর্গমধ্যে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রাজ্যের শান্তির বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কটিকা নামক নগরী স্থাপন করেন এবং মহাদেব তুঙ্গেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। রৌদ্রতাপদগ্ধ মারব প্রদেশে ইঁহার রাজত্ব কালে বহু বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। মহাকবি চন্দ্রক তাহাদের রাজত্বকালে আবির্ভূত হন। তিনি একপ্রকার নৃত্যের আবিষ্কারক। নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ইঁহার রাজত্ব কালে ইঁহাদিগর পরীক্ষার জন্যই যেন উপস্থিত হইয়াছিল। শরৎকালে ভাদ্রমাসে তুষারপাত হইয়া শালি ধান্য

এক কালে বিনষ্ট হইয়া মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। প্রজাকুলের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ তাহাদিগের স্বাভাবিকবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া লজ্জা তিতিক্ষা হারাইল। প্রত্যেকেই উদর জ্বালায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, পিতা পুত্রের, মমতা ত্যাগ করিল। দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখে অন্ধ হইয়া কেবল আপনার অসহ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য রাক্ষসবৃত্তি গ্রহণ করিল। প্রজাকুল কঙ্কাল সার। কি ভয়ামক দৃশ! খাদ্যের জন্য পরস্পরের মধ্যে কি ভীষণ যুদ্ধ! এক অন্যেকে বধ করিয়া কিরূপে নিজের উদর পূর্ণ করিবে সেই চেষ্টা। এই দুঃসময়ে রাজা ও রাণী আত্মহারা না হইয়া মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজপ্রাসাদে বুভুক্ষু প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া খাদ্য প্রদান করিতেন। রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া দূর দেশ হইতে শস্য আনীত হইয়াছিল। শস্যরক্ষার সুবন্দোবস্তে তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিতে পারিত না। ক্ষুধাতুর প্রজা কি গৃহে কি বনে কি রাজবর্ত্মে বা শ্মশানে যে যেখানে অবস্থান করুক না কেন তাহাদের তত্ত্ব লইয়া আহার্য্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদা যখন রাজা দেখিলেন, তাঁহার ধান্যাগার শূন্য, তণ্ডুলের আর সংস্থান নাই তিনি তখন অসহনীয় দুঃখে কাতর হইয়া মহারাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজলক্ষ্মি! পূর্ব্বজন্মে না জানি আমরা কি মহাপাপই করিয়াছিলাম তাই আজ প্রাণসম প্রকৃতিবর্গের এই দশা! যাহার নয়ন সমক্ষে এতগুলি জীব অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার জীবনে ধিক্! আমি যখন এতগুলি জীবনকে রক্ষা করিতে পারিলাম না তখন আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল! ধরিত্রী আজ প্রকৃতই দীনা, গৌরবহীনা! এতগুলি মনুষ্যের দৈন্য দূর করিতে অসমর্থা। পৃথিবীতে প্রলয়ের আর দেরী নাই। গিরিশঙ্কটগুলি বরফপাতে অবরুদ্ধ, প্রকৃতিকুলের দেশান্তরে গমনের উপায় নাই এখানে রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই তাহাদের যেন নিয়তি। দেখ কিরূপ ভাবে প্রজাকুল বীর, জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধনী, নির্ধন সকলেই সমভাবে মহাদুঃখে নিপতিত। সৌভাগ্যের দিনে যে দেশের চতুর্দ্দিকে মনোরম হাস্যোদ্দামে উদ্ভাষিত ছিল, আজ তাহা কোথায়? সমস্তই শ্রীহীন। প্রজাগণের বিপদুদ্ধারের আর কোন উপায় করিতে যখন আমি অসমর্থ আমার তখন অগ্নি প্রবেশে প্রাণ বিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ। প্রজাকুল মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে আমি আর তাহা দেখিতে পারি না। যে রাজা প্রজাকুলকে আত্মজের ন্যায়

সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন তাহাদের সুখে সুখী হন, তাঁহারই সুখ রজনী শান্তিতে অতিবাহিত হয়।" এরূপ বলিবার পর কোমল হৃদয় রাজা শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং বস্ত্রে বদন আবৃত করিয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল না যেন, অকম্পিত শিখা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। রাণী স্বামীর তদবস্থা দর্শনে সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে বলিলেন "হে স্বামিন! আপনি কেন প্রজাকুলের দুঃখে এরূপ আত্মহারা হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সহিষ্ণুতাকে বিসর্জ্জন দিতেছেন! দৈব প্রতিকুল হইলে কে তাহাকে নিরোধ করিতে পারে? কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্ফলতাই মহতের পক্ষে অক্ষমতার পরিচায়ক নহে। কার্য্যই মহৎ, রমণীগণ তাহাদের স্বামীকেই ভালবাসিবে, মন্ত্রীগণ বিশ্বস্ত থাকিবেন, রাজা প্রজাপালন করিবেন ইহাই ত কর্ত্তব্য। দুঃসময়েও ইহার পরিহার নিন্দনীয়। হে রাজন্! গাত্রোত্থান করুন। আমি বৃথা বাক্য ব্যয় করি নাই, আপনার প্রকৃতিবর্গের দুর্দ্দশা অচিরে অবসান হইবে।" যখন মহামনা রাণী তাঁহার উক্তি সমাপন করিলেন, তখন কোথা হইতে প্রত্যেক গৃহে মৃত পারাবত পতিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা করিল। রাজা তাহা অবলোকন করিয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু জীবনাশে দুঃখিত হইয়া রাজ্ঞীকে এই পারাবত সরবরাহে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। দুর্ভিক্ষের অবসান হইল। রাণী ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিলেন। ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজার দেহান্ত ঘটিল। রাণী ভর্তৃবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সহমৃতা হইলেন। যে স্থানে তিনি সহমৃতা হন, তথায় পথিকগণের বিশ্রামাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি বহু দেশের পরিশ্রান্ত পথিক তথায় বিশ্রাম লাভ করে ও খাদ্যাদি প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। ভগবান পুত্রদানে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন নাই কিন্তু তাঁহারা নিজ কার্য্যবলে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইক্ষু সুভক্ষ্য ফল প্রসব করে না কিন্তু উহা নিজেই ফল হইতে মধুরতর। কেহ কেহ বলেন যে রাণী অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন কেননা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—তাঁহার পাপেই দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল।

অপুত্রক রাজদম্পত্তি স্বর্গারোহণ করিলে স্বতন্ত্র রাজবংশসম্ভূত বিজয় কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। বিজয়েশ্বর নামক নগরটীর ইনি প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টমবর্ষ রাজত্বের পর ইনি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পুত্র আজানুলম্বিত বাহু সুযশাঃ জয়েন্দ্র রাজা হইলেন।

তাঁহার সন্ধিমতী নামক জনৈক মন্ত্রী ছিলেন। সন্ধিমতী শিবের উপাসক; রাজপরিষদবর্গ মন্ত্রীবরের অগাধ বিদ্যার জন্যই ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে রাজবৈরি রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সন্দিগ্ধ রাজা, মন্ত্রীকে তাঁহার সন্নিকটে আসিতে দিতেন না। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। মন্ত্রীবরকে মহা দারিদ্রে ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজ দরবারের কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত না; কারণ পারিষদগণ রাজারই প্রতিচ্ছায়স্বরূপ। রাজ রোষ কিম্বা দারিদ্র এই মহামনাঃ মন্ত্রীর অন্তঃকরণে তিলার্দ্ধমাত্রও বিক্ষোভ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। তিনি মহাদেবের আরাধনায় আনন্দে দিবারজনী অতিবাহিত করিতেন। এমন কি, সে শান্তিও উপভোগ করিবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল না। রাজপারিষদগণ প্রচার করিলেন যে মন্ত্রী সন্ধিমতীর কোষ্ঠীতে রাজ-যোগ লেখা আছে,—তিনি এক দিন কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন। রাজা এই সংবাদে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া সন্ধিমতীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। রাজার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত কারাগারে তাঁহাকে দীর্ঘ দশটী বৎসর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। সন্ধিমতী তাঁহার স্থলে রাজা হইবেন এই চিন্তা তাঁহার মৃত্যুচিন্তা হইতে অধিকতর উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। তিনি মন্ত্রীকে বধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা বলবত্তর। অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার ইচ্ছা করিলেই তাহার নির্ব্বাণ সম্ভব নয় যদ্যপি বিধাতার ইচ্ছা অনুরূপ হয়। সেরূপ স্থলে নিয়তির পুত্তলিকা মানুষ বারিভ্রমে দ্রবীভূত ঘৃতই অগ্নিতে প্রদান করিয়া তাহাকে আরও সতেজ করে। নিষ্ঠুর রাজা রজনীযোগে মন্ত্রীকে নিহত করিবার সঙ্কল্প করিলেন কিন্তু মন্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ তৎপূর্ব্বেই প্রচারিত হইল। রাজাও অচিরে অপুত্রক অবস্থায় কালকবলে পতিত হইলেন। তিনি সপ্তত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করেন।

কিয়ৎ কালের জন্য কাশ্মীরের সিংহাসন শূন্য রহিল। অরাজক রাজ্যে প্রকৃতিবর্গের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। সন্ধিমতী লোকান্তরিত হইয়াছিলেন না। প্রকৃতিবর্গ তাঁহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। তিনি প্রথমে রাজশক্তি গ্রহণে ইচ্ছুক হন নাই, পরিশেষে ইষ্টদেবের আদেশক্রমে রাজভার গ্রহণ করিলেন। রাজসম্মানে সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া

তিনি রাজপ্রসাদে নীত হইলেন। লাজ বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রকৃতিবর্গ আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অতি বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ছিলেন। তাঁহার পক্ষে অন্যের মন্ত্রণা গ্রহণের আবশ্যক ছিল না। তিনি অতি সুন্দর ভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে রমণীর প্রভাব নিষ্ফল ছিল। তাঁহার রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, তিনি ধূপ ধুনা ও কর্পূরের গন্ধে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং যদিও তিনি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন তথাপি তাঁহার শিবারাধনায় ও শিব দর্শনে ঔদাস্য ছিল না। তিনি ভূতেশ, বিজয়েশ, ঈশান প্রভৃতি শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা দর্শন করিতেন। হরমন্দির-সোপান-ধৌত বারিস্পৃক্ত বায়ু নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করিতে তিনি সর্ব্বদা আগ্রান্বিত ছিলেন। হরশির সিঞ্চিত বারির ধ্বনি তাঁহার নিকট বীণাধ্বনি হইতেও সুমধুর মনে হইত। প্রত্যুষে শিব বিগ্রহ স্নাত ও পূজিত হইয়া কি মোহন বেশ ধারণ করেন, তাহার সৌন্দর্য্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। প্রত্যহ সহস্র শিবলিঙ্গ তাঁহার জন্য নির্ম্মিত হইত। কোন কারণে তাহার ব্যতয় ঘটলে তিনি সহস্র শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া লিঙ্গরূপে পূজা করিতেন। পূজাশেষে সেই লিঙ্গগুলি নদীবক্ষে বিসর্জ্জিত হইত। জটাজুট সম্পন্ন ভস্মাচ্ছাদিত বহু ঋষি তাঁহার রাজ দরবারে সমাসীন থাকিতেন। তৎকর্ত্তৃক বহু সুবৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ বৃষভ ও ত্রিশূল অতি বৃহদাকার। রাজা পরিশেষে অরণ্যবাসে দেবসেবায় সম্পূর্ণভাবে নিজকে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় শিবপূজারই অতিবাহিত হইত। তিনি গ্রীষ্মে শিবমন্দিরপাদধৌত কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া শিব আরাধনা করিতেন। শরতে সরোবরের সন্নিধ্যে অবস্থান করিয়া তিনি একাগ্র চিত্তে শিবধ্যানে নিরত থাকিতেন। মাঘের প্রচণ্ড শীতে উন্মুক্ত স্থানে ঋষিগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রাজ্য শাসনাপেক্ষা শিবারাধনাতে বিশেষ রূপে অনুরক্ত হওয়ায় মন্ত্রীগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া অন্য ব্যক্তিকে রাজপদাভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহারা জানিত পূর্ব্বরাজবংশসম্ভূত অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরের জনৈক বংশধর তৎকালেও বর্ত্তমান। গান্ধারাধিপতি গোপাদিত্য কাশ্মীর সিংহাসন অধিকারের আশায় যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন! এই রাজকুমারের মেঘবাহন নামক এক সন্তান বর্ত্তমান ছিলেন। প্রাগজ্যোতিষ রাজকুমারীর স্বয়ম্বর-সভায় তিনি আহূত হন এবং

রাজকুমারীর পাণিগ্রহনের সৌভাগ্যলাভে তিনিই সমর্থ হন। প্রাগ জ্যোতিষাধিপ জামাতাকে এই উপলক্ষে একটি ছত্র যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। কথিত আছে সেই ছত্র নরক রাজ বরুণ দেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ছত্র যাঁহার শিরোপরি শোভা পাইবে তিনিই একচ্ছত্রি রাজা হইবেন। উক্ত ঘটনায় মেঘবাহনের প্রতি লোকদৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। মেঘবাহন তদীয় পত্নী সহ গান্ধারে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কাশ্মীরের মন্ত্রীগণ তাঁহাকে কাশ্মীরের সিংহাসনরূঢ় হইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মন্ত্রী সন্ধিমতী তৎকালে আর্য্যরাজ নাম ধারণ করিয়া কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছিলেন। অন্তর্বিদ্রোহে কাশ্মীরের অবস্থা তখন শোচনীয়। সন্ধিমতীর রাজসিংহাসনে একবারেই স্পৃহা ছিল না। তিনি সেই সুযোগে নব ভূপতিকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিয়া নিজকে মুক্ত বিবেচনা করিলেন ও দেবারাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুতেই তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজ-বিলাস-ব্যসনের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি যে ইষ্টদেবতাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই ছিল তাঁহার আনন্দ। তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহ হয় নাই তাহাই ছিল তাঁহার শান্তি। তিনি বলিয়াছেন, "রাজ্য শাসনে আমাকে, মনঃকষ্ট পাইতে হয় নাই। অদৃষ্টকে দোষী করিতে হয় নাই কখনও ইহাই আমার সৌভাগ্য।" পার্থিব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্তর্জগতে সুমহান্ রাজ্য স্থাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তিনি বিনা আপত্তিতে কাশ্মীর-সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। বহু ব্যক্তি তাঁহার সে কার্য্যের প্রতিবাদ করেন কিন্তু তাঁহাদিগের সকল যুক্তি-তর্ক নিস্ফল হইয়াছিল। রাজ্যশাসনের কি সুখ তাহা তিনি সম্যক্ রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আর বিষয়-লালসা পাশবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। নগ্ন শিরে, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি সন্ন্যাসী বেশে উত্তর দিকে প্রস্থিত হইলেন। মুখে বাক্য নাই, দৃষ্টি ধরণীনিবদ্ধ। অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া বহু ব্যক্তি তাঁহার অনুগমন করিল। দুই ক্রোশ ভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি একটি ঘন-পল্লব-ছায়া-স্নিগ্ধ বিটপীমূলে উপবেশন করিলেন। এবং রোরুদ্যমান অনুগমনকারীগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। এই প্রকারে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে উপনীত হইলেন ও অবশিষ্ট সঙ্গীগণকে স্বস্বগৃহে ফিরিবার জন্য অনুনয় করিলেন। ক্রন্দনরত অনুচরগণ তাঁহার

নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি পর্ব্বতারোহণে ঘোর বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বনে গুহা গহ্বরে সন্ন্যাসীগণ নিশিযাপন করিতেন। তিনি স্বহস্তে একটি সরিৎ তীরে পত্র দ্বারা কুটীর রচনা করিয়া পত্রশয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। পত্র তাহার হইল পান ও ভোজনপাত্রের উপাদান—ধরিত্রীবক্ষে তাঁহার শয়ন! রজনীতে পূর্ণচন্দ্র তাহার রজতকিরণ-প্রভায় চিরতুষার কিরীটী পর্ব্বত শিখর প্রতিভাত করিতেছিল, পর্ব্বত পাদদেশে নবতৃণ শ্যামল শোভা বিস্তার করিয়া বিমল শশী কিরণে হাস্য করিতেছিল, সুদূরে গোপবালাগণ মল্লিকাতরু নিম্নে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল, অজচালক রাখালগণের বেণু নিঃসরিত সুমধুরধ্বনি নির্ঝরের কল তানের সহিত মিলিত হইয়া মৃদু বায়ু প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছিল, পথক্লান্ত রাজা সেই বৈতালিকগীতে শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। বন্য জন্তুর চীৎকার ও কার্করেতুর কণ্ঠধ্বনি রজনীর অবসান তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, ভগবানের অর্চ্চনার পর নন্দীক্ষেত্রে মহাদেব লিঙ্গ দর্শনাশে :সোদর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রাজার সর্ব্বশরীর ভস্মে আচ্ছাদিত, কেশ শিরচূড়ে বদ্ধ, হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, তাঁহার ভক্তজনোচিত মুখভাব দর্শনে ঋষগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সমস্ত দিন সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন।

ইতি কাশ্মীরের প্রধান অমাত্য চম্পক প্রভুপুত্র কহ্লন প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় তরঙ্গ।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

কামিনী গাছের তলায়।*

যেতে ও গাছের তলায়
বুকটা কাঁপে দুরু দুরু;
মানুষের পরশ লেগে
ফুল ঝরে ও'র ঝুরু ঝুরু।

* চিরকুমার সভার গীত।

২

থাকুক ও যেমন আছে,
যাব না গাছের কাছে,—
বাতাসে আসুক ভেসে
(মরি ! ও'র) গন্ধটুকুন ভুরু ভুরু !
সুদূরের সুবাস লভি'
থাকিব মোরা ঋণী,
কামিনী ফুলের আদর
করিব চিরদিন-ই ।
শিথিল বৃন্তোপরি
ফুটে থাক্ স্বপ্ন-পরী,—
দিলে যে সোহাগ-হাওয়া
(মরি ! ওর) ফুল করে সব উড়ু উড়ু !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

রক্তাম্বরা *

—:o:—

মুখবন্ধ ।

আমার জীবন এত রহস্যময় যে আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট আমার জীবন-কাহিনী বলিতে পারি নাই। আমার জীবনের সহিত এক ব্যক্তি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে আজও আমাকে নীরব থাকিতে হইত। এতদিন আমার রচনাশক্তি

* ইংরাজী উপন্যাস অবলম্বনে।

ঔষধের প্রেস্কৃপসন ও মাসিক পত্রিকায় দু'একটি ঔষধবিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু অক্ষমতা সত্ত্বেও আজ শুধু আমার প্রাণসমা প্রিয়তমার অনুরোধে এ জীবন কাহিনী সম্পূর্ণ সরলভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ডাক্তারের জীবনের ছোট বড় সব ঘটনাই তাঁহার রোগীদের চক্ষে একটু বড় হইয়া দেখা দেয় সেই জন্য আমি আমার আসল নামটি গোপন করিব। অবশিষ্ট কথা সরলভাবে সরলভাষায় পাঠকের নিকট স্বীকার করিব। কলিকাতা সহরের কলেজ ষ্ট্রীটের উপর আমার ডাক্তারখানা। দক্ষিণাও বেশ ভারী রকমের। বড় বড় জমিদার ঘরের আমি বাঁধা ডাক্তার। খেতাবও মস্ত বড় কারণ আমি বিলেতের পাশকরা ডাক্তার। আমার নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ কর। আমি স্নায়ুর দুর্ব্বলতাজনিত সকল প্রকার রোগের স্পেশালিষ্ট! বড় বড় পরিবারে চলাফেরা করার দরুণ আমাকে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিতে হয়। কিন্তু এখন আপনারা আমাকে সাধারণের ন্যায় সহজভাবেই গ্রহণ করিবেন।

সহরের কর্ম্মকোলাহলের ভিতর এমন ঘটনা অনেক সময়ই ঘটে যাহা কাগজে কলমে লিখিলে লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত; এই প্রকাণ্ড সহরের জনতা এবং বিলাস-বৈচিত্রের ভিতরে শতসহস্র লোকের মাঝখানেও নিজকে একলা মনে হয়, ধনীর বিলাসিতা ও অপব্যয়ের পাশে দরিদ্রের ক্ষুধাতুর মূর্ত্তি নিত্যই চোখে পড়ে। ভয় হয় পাছে আপনাদের প্রত্যয় না হয় আমার কথা কিন্তু এমন সব ঘটনা নিত্যই ঘটে যাহা আমার বর্ণিত ঘটনার অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। শুধু দুই চারি ঘণ্টা পুলিশকোর্টে বসিয়া থাকিলেই এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হইবে। সংসারে মহত্তের পাশে বসিয়া নীচ, সাধুর পাশে বসিয়া জালিয়াত, জুয়াচোর নিজ নিজ স্বার্থসাধনে ব্যস্ত সুতরাং সাবধান না হইলে বিপদে পড়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়।

লোকচরিত।

আমার অতি বড় শত্রুও কল্পনা প্রিয়তার দোষ আমাকে দিতে পারে না। ছাত্রজীবনে যতটুকু কবিত্ব মাথায় থাকে এক বৎসর চাকরী করিলেই তাহা দূর হইয়া যায়। যাহারা ডাক্তারী পড়ে, তাহাদের মন স্বভাবতঃই কঠিন হইয়া যায় আর পাশ করিয়া বাহির হইতে না

হইতেই তাহাদের ভিতরের সমস্ত ভাবুকতা শুখাইয়া যায় সে জন্য বেশীর ভাগ ডাক্তারই অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক। তখন সবে এক বৎসর পূর্ব্বে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি। সে বেশীদিনে কথা নয় কারণ আমার বয়স এখনো চল্লিশ পার হয় নাই সকলে বলে আমি খুব কম বয়সেই পশার জমাইতে পারিয়াছি। সত্যিই খুব শীঘ্রই আমার উন্নতি হইয়াছে।

আমি বড় বড় নামজাদা অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাশ করিবার পর বুঝিলাম যে ডাক্তারি ব্যবসায়ে পশার জমানই মুস্কিল। পাশ করিবার পর আমি প্রথমে পঞ্জাবে একজন বড় ডাক্তারের সহকারী পদে নিযুক্ত হই। তাঁহার খাটুনী খুব ছিল কিন্তু আয় অতি অল্পই। কারণ বেশীর ভাগ দরিদ্রপল্লীতেই তাঁহার ডাক পড়িত। এই সকল দরিদ্র পরিবারে বড়ি ও মিকশ্চার বিতরণ আমার ভাগ্যে পড়িল।

অধ্যক্ষ ডাক্তারখানার উপরের ঘরে বসিয়া রাত দিন মদ্যপান করিতেন আর নিজের স্ত্রী ও রোগীদের উপর যার পর নাই মন্দ ব্যবহার করিতেন। দরিদ্র নিঃসম্বল রোগীদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বসন ভূষণ যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন ঔষদের দাম বলিয়া উঠাইয়া আনিতেন।

আমি একবৎসর রোদবৃষ্টি মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কারণ বেশীর ভাগ কাজ আমাকেই দেখিতে হইত। আঠার মাস সেখানে থাকিবার পর একদিন বড় বিপদে পড়িলাম। একটি লোক গুরুতর রূপে আহত হওয়ায় আমার অধ্যক্ষ তাহাকে দেখিতে গেলেন। সে সময়ে তিনি নেশার ঝোঁকে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া কি কি করিতে হইবে উপদেশ দিয়া তিনি আমাকে রোগীর নিকট পাঠাইলেন। আমি তাঁহার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিলাম কিন্তু ফলে রোগীর মৃত্যু হইল। তখন নালিশের আয়োজন হইল, আর আমার অধ্যক্ষ সমস্ত দোষ আমার স্কন্ধে চাপাইয়া নিজের গৌরব বজায় রাখিলেন। বিচারক তাঁহার মদ্যপানের কথা জানিতেন না আমি দেখিলাম যে অস্বীকার বা বাধা দেওয়া বৃথা সুতরাং সেইদিনই পদত্যাগ করিয়া রাগে দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম।

তারপর দমদমায় একজন ডাক্তারের অধীনে কাজ নেই কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব দেখিয়া কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই। তারপর বাঁকিপুর মজঃফরপুর সোনপুর অনেক স্থানে অনেক রোগের চিকিৎসা করিয়া ফিরিলাম। এইরূপে চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা জন্মিল। কিন্তু আয় অধিক না হওয়ায় কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই। ঠাট সব সময়ে বজায় রাখিতে হইত সুতরাং সঞ্চয় করিবার সুবিধা হয় নাই; ফলে একদিন ১৫ টি টাকা পকেটে লইয়া আমায় আবার কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে হইল। আমি অনেকবার সেই স্মরণীয় দিনটার ঘটনাগুলি মনে মনে আলোচনা করি। তখন পৃথিবী যেন আর একরকম ছিল। তখন একটি টাকা দর্শনী পাইলেই কৃতার্থ বোধ করিতাম। আর এখন পাঁচশত টাকা আমার দৈনিক আয়। তখন গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় মাস। সেদিন ভীষণ গরম। প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। কিন্তু তখোনো অন্ধকার হয় নাই। আমি গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলাম। বেজায় গুমট বাঁধিয়াছিল। ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ। আমি আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের অনেকের খোঁজ লইয়াছিলাম কিন্তু তাহারা কেহই সে সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না। সে সময় বড়লোকেরা হয় পাহাড়ে নয় সমুদ্র ধারে। কিন্তু তবু জনতার বিরাম ছিল না আমি নিতান্ত অবসন্নচিত্তে ঘুরিতেছিলাম, আমার ন্যায় অর্থহীন অসহায়কে কেহই সাহায্য করিবে না জানিতাম। আমি তখন আমার অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম। বাঁকিপুরের এক নিভৃত কুটীরে আমার মা তাঁর প্রিয় পুত্রের মুখ চাহিয়া কত কষ্টে কাল কাটাইতেছেন। আমাকে উচ্চশিক্ষা দিতে তাঁহাকে দারিদ্রদুঃখ বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। তিনি মনে করিতেন ডাক্তার হইলেই পশার জমিবে। আমিও জননীর মুখ স্মরণ করিয়া দিবানিশি খাটিয়াছি কিন্তু কোন উপায় করিতে পারি নাই, সেদিন আমার আহার হয় নাই। শেষ টাকা কয়টা খরচ করিতে আমার মন সরে নাই কিন্তু ক্ষুধার তাড়নে শেষে একটি দোকান হইতে সস্তা কিছু কিনিবার অভিপ্রায়ে দাঁড়াইয়াছি। পরিচিতস্বরে কে আমার পশ্চাত হইতে বলিল "[illegible]জেন নাকি? কি খবর? তুমি কি ঘাট থেকে উঠে আসৃছ নাকি?"

ফিরিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখ। আমি সহর্ষে বলিলাম "এই যে বিনোদ যে।" আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম।

"তাই ত মনে হচ্ছে, নয় ? অন্ততঃ বিনোদের ছায়া ত বটে। করাচি গিয়ে ভয়ানক জ্বর হয় তাইতে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে গেছি।" বলিয়া সে উচ্চ হাস্য করিল।

বিনোদ রায় বরাবরই হাস্য কৌতুকপ্রিয়। ছাত্রাবস্থায় সে ঠাট্টা তামাসা করিয়া আমাদের সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। আমি বলিলাম "মাংস আবার জমিয়েছও ত বেশ। কি খেয়ে পারলে ? কডলিভার অয়েল ?"

"না। একটু করে ব্র্যাণ্ডি আর বরফ। এসো এই মোড়ের হোটেলে কিছু খাবে, চল, তোমাকে জাগিয়ে তোলা দরকার হয়েছে।"

আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সঙ্গে চলিলাম। বিনোদকে দেখিলে একটি বাড়ন্ত গড়নের বালক বলিয়া বোধ হয়। সে একটু বেঁটে, তার মাথার চুলগুলি ভারী নরম ও কোঁকড়া, চোখ দুটি উজ্জ্বল কৃষ্ণ,--গঠন অতি বলিষ্ঠ। পরণে উৎকৃষ্ট শান্তিপুরে ধুতি, চুড়িদার-হাতের সিল্কের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর ও রূপো বাঁধান ছড়ি তার সখের পরিচয় দিতেছে। এই বেশ সত্বেও তার পকেটে একটি ষ্টেথোস্কোপ ফেলা ছিল। বুঝিলাম সেও চিকিৎসা ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়াছে।

আহার করিতে করিতে আমরা পরস্পরকে পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা এক সঙ্গেই পাশ করিয়া বাহির হই। কিন্তু তার পরে আর দেখাশোনা হয় নাই। সে আমার হতাশাপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিল, তারপর নিজের কথা বলিতে লাগিল। সে করাচীতে গিয়া জ্বর লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল, সুস্থ হইয়া এখন এখানেই ডাক্তারী করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি রকম চ'লছে ?"

"হ্যারিসন রোডে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলেছি।"

"পশার বেশ জম্‌ল ?"

"সে সৌভাগ্য এখনো হয় নি। লোকের কাছে পুলিশ station-এর নীল আলো আর আমার বাড়ীর সামনের নীল আলো দুইই সমান। কোন এপিডেমিক হ'লে তবে আমাদের মত লোকেরও ডাক পড়ে কিন্তু তাত নেই কেবল বাত, অজীর্ণ, মাথাব্যথা ছাড়া আর ত

রোগ নেই। তোমার আপাততঃ কোন কাজ না থাকে তুমি আমার বাসায় চল না, দু'একদিন থাক্‌বে? আমি একলা থাকি, একজন সঙ্গী পেলে ভারি স্ফূর্ত্তি হবে। তারপর কাজ পেলে চলে যেয়ো। কোথায় এসে নেমেছ?"

আমি আমার বাসার ঠিকানা বলিলাম। "চল, তা'হলে একটা গাড়ী করে তোমার বাসায় গিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমার বাসাতেই আস্তানা ফেলা যাক্‌, বাড়ী ফিরে সকালে একটু মাংস আনিয়ে ছিলাম। মাংসর ঝোলের সদ্ব্যবহার করা যাবে।"

"মুখরোচক বটে।"

আর একটু সাধাসাধির পর আমি অগত্যা তাহার আতিথ্য স্বীকারে বাধ্য হইলাম। বিনোদের বাড়ীখানি তার কোন্ আত্মীয়ের নিজের বাড়ী। ভারি চমৎকার বাড়ীখানি। সামনে একটু ঘাসের জমি, কয়েকটি ফুলের গাছ। ভেতরেও আস্‌বাব পত্রের অভাব ছিল না। কারণ কেবল ডাক্তরী করিয়া বিনোদকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হইত না। তাহার পিতা ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। বসিবার ঘরের পাশে খাবার ঘর, তাহার পরের ঘরখানিতে একটি চেয়ার, টেবিল, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ডাক্তারি বইএ ভরা দুটি আলমারি ও একটি রোগীদের ব্যবহারের জন্য খাট রাখিয়া সেটীকে ডাক্তারখানারূপে ব্যবহার করা হইত। বিনোদ ছেলে খুব ভাল। আমি তার কাছে বড় আনন্দে ছিলাম। বুড়ী রামীর মা আমাকে খুব যত্ন করিত, আর বিনোদ তার রসিকতায় সব সময়েই আমাকে সরস রাখিত। রোগীর সংখ্যা নিতান্তই কম। একদিন বিনোদ বলিল "জান ভাই আমি সেই হ্যারিসন রোডের গল্পের ডাক্তারের মত,—তাকে নেহাৎ দায়ে না প'ড়লে কেউ ডাকৃত না।"

এক সপ্তাহের বেশী বিনোদের আতিথ্য গ্রহণে আমার একেবারে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিনোদকে সে-কথা বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সুতরাং আমি চাকরী পাইবার আশায় বসিয়া রহিলাম। যাহা হউক আমি তিন সপ্তাহ তাহার নিকট থাকিয়া তাহার ডাক্তারির সাহায্য করিতাম। বিনোদ বেচারী কোনদিনই রোগ ভাল বুঝিত না। তাই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। তার সব রোগীরই সম্বন্ধে এক নিয়ম ছিল। সে নাড়ী টিপিত আর জিহ্বা পরীক্ষা করিত। রোগী চলিয়া গেলে বলিত "টাকার জন্য সব কোরতে হয়, ওরা জিব্‌ দেখানো ভারি পছন্দ করে।"

একদিন বৈকালে বিনোদের ডাক্তারখানার উপরের ছোট ঘরখানিতে বসিয়া আমরা দু'জনে গল্পগুজব করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ বিনোদ বলিল "দ্বিজেন আমার বোল্‌তে লজ্জা হচ্ছে, আমার ওপর একটু অনুগ্রহ কোরবে?"

"অনুগ্রহ আবার কি—ভাই কেন কোরবো না?"

"তোমার ঘাড়ে যদি খুব দায়িত্ব চাপাই?"

"কি দায়িত্ব?"

"ভয়ানক। আমার এই প্রকাণ্ড (!) কারবারের হাল ধরে রাখতে হবে। আমি অনেকদিন বাড়ী যাইনি একবার বাড়ীটা চট করে ঘুরে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"বেশ ত আমি আনন্দের সঙ্গে কারবারের ভার নিতে রাজি আছি।"

"অশেষ ধন্যবাদ। তুমি ভাই কল্পতরু। আমি একহপ্তার মধ্যেই ফিরে আস্‌ব, তোমার কোন ভাবনা নেই। মোটে চার পাঁচ জন রোগী বৈত নয়! ছোট দুটি মেয়ের জর, এক বৃদ্ধা শয্যাগত আর এক ভদ্রলোক তাঁর গেঁটে-বাত ব্যথা,—লেগেই আছে। এঁদেরই একটু খোজ খবর নিতে হবে।"

বিনোদের কথায় আমার হাসি পাইল। বিনোদ এত অমনোযোগী যে লোকটির রোগ ধরিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। সে আবার বলিল "দর্শনীর অনেক টাকা! তা তুমিই নিয়ো, তিন-তিনটাকা, তা তোমার তামাকের খরচটা চোল্‌বে।"

পরদিন হইতে আমি বিনোদের যায়গায় কাজ করিতে লাগিলাম। বিনোদ সেই দিনই বেনারস যাত্রা করিল আর আমি কাজে মনোযোগ দিলাম। প্রথম দুদিন বেশ গেল। আমি সেই মেয়ে দুইটিকে, বৃদ্ধাকে ও গেটের ব্যথায় শয্যাগত লোকটিকে দেখিলাম। শোথের রোগীকে বাঁচান শক্ত। তাঁর যে রোগ তার আমাদের শাস্ত্রে কোন ব্যবস্থাই নাই। সকলকে দেখা শেষ করিয়া আমি বিনোদের ছোট ঘরটিতে বসিয়া ধূমপান করিয়া কাটাইতাম। তৃতীয় দিন সকালে প্রায় বেলা দশ টার সময় আমি বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। রাস্তায় গাড়ী আসিবার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানার চাকরদের ডাকিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতে শুনিলাম। আমি চমকিয়া উঠিলাম কারণ ওই ঘণ্টা বাজা মানেই আমার তিনটি টাকা লাভের সম্ভাবনা। একটি প্রৌঢ় ধরণের কালরংএর

কাপড়পরা স্ত্রীলোক, বোধহয় কোন বড়লোকের বাড়ীর চাকরাণী হইবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনিই কি ডাক্তার বাবু ?" আমি বলিলাম 'হাঁ' "এখুনি আপনাকে আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে। আমার মনিবের অবস্থা বড় খারাপ দাঁড়িয়েছে।" "তাঁর কি অসুখ ?" স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল "আমি নামটাম জানি না বাবু, তবে আপনি গেলেই টের পাবেন।"

"আচ্ছা আস্‌ছি" বলিয়া আমি উপরে আসিয়া পোষাক পরিলাম, যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইলাম তারপর তার সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

রাস্তায় আমি রোগের কি কি লক্ষণ তাহা জানিবার জন্য অনেক প্রশ্ন করিলাম কিন্তু তার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে নয় সে ভয়ানক বোকা অথবা কোন কথা বলিতে তার বারণ আছে, অবশেষে গাড়ী একটি ধূসর রংএর অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ীখানি ফুল গাছ ও লতাপাতা দিয়া খুব সুন্দররূপে সাজান। আমরা যাইতেই দ্বারবান সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; আমাকে তার প্রভুর পড়িবার ঘরে বসাইয়া মনিবকে খবর দিতে গেল।

দৈব।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড। আলমারিতে মহামূল্য বই সব সাজান দেখিয়া মনে হয় গৃহস্বামী পণ্ডিত লোক। লিখিবার টেবিলের উপর একটি পড়িবার জন্য বৈদ্যুতিক আলো আর রূপোর ফ্রেমে বাঁধন কোন সুন্দরী মহিলার প্রতিকৃতি। টেবিলের পাশে একটি ব্র্যাকেটে চিঠির কাগজ স্তরে স্তরে সাজান, তাহার শিরোদেশে কোন রাজপরিবারের মুকুট আঁকা।

কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলিয়া মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন, তিনি আকারে ক্ষুদ্রকায়, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে। তাঁহাকে দেখিলে কিছু স্বাভিমানী ও তেজস্বী বলিয়া ধারণা জন্মে। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, আকার প্রকারে উচ্চবংশজাত বলিয়া মনে হয়। তিনি অত্যন্ত মিহি গলায় বলিলেন "নমস্কার ডাক্তার, আপনার দেখা পাওয়া গেছে যে এই ঢের।"

আমি উত্তর দিলাম "আমিও সম্মানিত কম হই নাই।"

তিনি ইঙ্গিতে আমাকে বসিতে বলিয়া নিজে টেবিলের অপর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। জানিনা ইচ্ছা করিয়াই হউক বা ঘটনাক্রমেই হউক আমার মুখটি আলোয় ও তাঁহার মুখটি

অন্ধকারে পড়িল। তাঁহার এই বসিবার ভঙ্গীর কোথায় যেন একটু কিছু গোপন করিবার ভাব ছিল আমি ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই। তাঁর মোমের মত সাদা রক্তলেশ হীন মুখখানি টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি বলিলেন "আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছি, ঔষধের ব্যবস্থায় আমার তত দরকার নেই।"

"রোগীকে আগে দেখে তারপর গল্প করলে ভাল হোত না?"

"না, না! প্রথমে আমাদের দু'জনের দু'জনকে বোঝা দরকার।" আমি তাঁর মুখের দিকে চাহিলাম। কোন ভাবই দেখিতে পাইলাম না কারণ তাঁর মুখে ছায়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক লোকটি কে জানিবার জন্য আমার ভারী কৌতূহল হইল।

"তা হ'লে অসুখ বেশী কিছু নয়?"

"বাঁচানো শক্ত" তারপর মিষ্ট স্বরে বলিলেন "তুমি কি মনে কোরবে জানি না ডাক্তার কিন্তু আমার একটা অদ্ভুত মত আছে সেটা এই যে উকীল ডাক্তারে যেমন দর্শনী পেলে তবে কাজ করে তেমনি এ পৃথিবীতে প্রত্যেক লোকই ইচ্ছা করলে দর্শনী আদায় করে তবে কাজ করতে পারে।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বোল্লেন? আপনার কথা আমি ধরতে পারলাম না।"

"আমি বোলছি যে পৃথিবীতে টাকা দিলে যে কোন লোককে দিয়ে যে কোন কাজ করান যায়।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "অনেকের পক্ষে এ কথাটা খাটতে পারে কিন্তু আবার অনেকের পক্ষে খাটেও না।"

তিনি যেন একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "আপনার পক্ষে খাটে?"

আমি এ অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম এমন সময় ভদ্রলোক আবার বলিলেন "আমি তোমাকে পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করি যে তুমি কি এতই বড়লোক যে তোমার টাকার দরকার হয় না?"

আমি সরলভাবে বলিলাম "একেবারেই বড়লোক নই।"

"তা হ'লে টাকা পেলে যে কোন কাজ কোরতে রাজি আছ?"

আমি বড় বিরক্তি বোধ করিলাম, বলিলাম "আমি কি তা বোলেছি।" কয়েক মিনিট তিনি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পাঁচটি সংখ্যায় লেখা যায় এ রকম এক তোড়া টাকা নিতে চাও?" আমি বিমূঢ়ের ন্যায় পুনরাবৃত্তি করিলাম "পাঁচটি সংখ্যায় লেখা যায় এত টাকা? কিসের জন্য?" সেই মুহূর্তে আমার সন্দেহ হইল এই লোকটি ঔষধের সাহায্যে কাহারও প্রাণনাশ করিতে চায়, সে চিন্তা আমাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

"তোমার কাছ থেকে যে কাজ চাই তা বেশী শক্ত নয় করা। তুমি অল্প বয়সী যুবক, অবিবাহিত, তোমার ব্যবসায়েও তোমার যথেষ্ট উৎসাহ আছে, এক্ষুণি যদি কুড়ি হাজার টাকা পাও ত সেটা নিশ্চয়ই তোমার খুব কাজে আস্‌বে।

"স্বীকার করি আমার টাকার দরকার। অত টাকা পেলে চিরজীবনের মত অন্নচিন্তা থেকে রেহাই পাব।" বলিয়া তিনি কি কাজ আমায় করিতে বলেন জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি কৌশলে আমার প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গেলেন।

"আমার যা কাজ চাই তা তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকবে কিন্তু ইতস্ততঃ কোরলে চলবে না কাজটি আজই শেষ কোরতে হবে।"

"তা হলে এর সঙ্গে জীবনমরণের সম্বন্ধ আছে?"

"মরণের আছে, জীবনের নয়।"

আমি নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। নিশ্চয়ই আমার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কারণ তিনি আবার তাড়াতাড়ি বলিলেন।

"আর বেশি কিছু বল্‌বার আগে ডাক্তার, আমি তোমাকে জানাতে চাই যে আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কেহ যেন জান্‌তে না পারে।"

"আপনি যা চান তাই হবে।"

ঘরের বায়ুতে যেন আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আমার মাথা ঘুরিতেছিল, আমি এই প্রলুব্ধকারীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলাম। তিনি আমার বলিলেন—"বেশ তা হলে আরও এগুতে অনুমতি কোরছ? এখুনি

আমি বোল্‌লাম যে তুমি অবিবাহিত, তুমি ত না বোল্‌লে না, তার মানে তোমার এখনো বিয়ে হয় নি কেমন ?"

"না, বিয়ে কোরতে ইচ্ছে নেই।"

"যদি কাল সন্ধ্যার আগেই তোমার স্ত্রী মারা যায় তবু নয় ?"

"সন্ধ্যার আগেই মারা যাবে ? আপনার কথা বড় রহস্যপূর্ণ। খুলে বোল্‌লে বুঝতে পারি।"

"আমার কথার মানে এই যে আমার মেয়ে কঠিন রোগে শয্যাগত, মরণ তার অবশ্যম্ভাবী। দুজন ডাক্তর ক'মাস ধ'রে তার চিকিৎসা কোরলেন কিন্তু তার রোগ সারবার নয়। অসুখ হবার আগে একটী ছেলেকে বিয়ে করবার জন্য সে পাগল হয়। সে ছেলেটির গুণ বোলতে কিছুই নেই, মানুষের যা কিছু খারাপ সবই তার ভেতর পাওয়া যেতে পারে তবু আমার মেয়ে তাকে প্রাণের চাইতে বেশি ভালবাসে। অসুখের বিকারের মধ্যে সে তার নাম ধরে ডেকেছে। সেই তার ধ্যান জ্ঞান। এখন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার অনুতাপ হচ্ছে আমি কেন ওদের বিয়ে দিই নি। শেষ কথা এই যে আমি চাই আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে কর।"

"আপনার মেয়েকে বিয়ে কোরব ?"

"হাঁ, তার মাথার ঠিক নেই সে তোমাকে তার প্রণয়ী বলেই মনে কোরবে আর তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সুখের হবে।"

আমি উত্তর দিলাম না, আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

"আমি জানি আমার এ অদ্ভুত প্রস্তাব কিন্তু আমি পাগলের মত হয়ে এই ফন্দি এঁটেছি। আমি যদি কোনমতে ওর শেষ সময়ে সুখ দিতে পারি, প্রাণ দিয়ে তা কোরব। ভগবান জানেন অনুতাপ রাখ্‌বার আমার স্থান নেই" তাঁহার মুখ গভীর নৈরাশ্যে বিবর্ণ হইয়া গেল।

"কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু সাহায্য কোরতে অক্ষম।"

"সাহায্য কোরতে তুমি এসময়ে বিমুখ হবে ? আমার অভাগিনী কন্যার শেষ মুহূর্ত্তে এতটুকু সুখ দিতে পারবে না ?"

"আমি জাল জুয়াচুরির ভেতর থাক্‌তে চাই না।"

"ওঃ ! টাকা বুঝি মনের মত হয় নি ! আচ্ছা চল্লিশ হাজার দেব।"

"আর একি সত্যি বিয়ে ! না ছেলে খেলা হবে ? নকল বিয়ে ?"

"নকল বিয়ে ? না না বিয়ে রীতিমত রেজেষ্ট্রী করে হবে।"

"কেন নকল বিয়ে হলেও ত হোত।"

"তা আমার মতে,—বিয়ে জিনিষটা সব অবস্থায়ই সত্যি হওয়া উচিত।"

"কেন ?"

"সে বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।"

"কিন্তু সত্যিকার। বিয়েতে অনেক আয়োজন কোরতে হয়।"

"আমি সে সব কোরব। কোন ত্রুটী হবে না। তোমার কিছুই কোরতে হবে না। কারণ আমি চাই বেলার বিয়ে সত্যি সত্যিই হবে আর তাকে বিয়ে করে তুমি আমার যে উপকার কোরবে তার মূল্যস্বরূপ বিয়ের পরই তোমায় চল্লিশ হাজার টাকা দেবো।"

তারপর দেরাজ হ'তে একতারা নোট হাতে লইয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলেন "আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'লে এই টাকার তোড়া তোমার"। আমি টাকার তোড়ার দিকে চাহিলাম তারপর সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিলাম যাহা দেখিলাম তাহাতে চমকিয়া উঠিলাম। লোকটি মানুষ না শয়তান ? আমার মুখের ভাবে মনের কথা বুঝিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন।

"ভয় পাচ্ছ কেন ? আমার মেয়েকে ঠকিয়ে তার মৃত্যুর শেষ কয়েক মুহূর্ত্ত সুখের কোরতে চাই তাতে দোষ কি ? এস এস এ উপকার তোমায় কোরতেই হবে" বলিয়া তিনি টাকার তোড়ার প্রতি সঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পাঠক, আপনাকে আমার স্থানে রাখিয়া ভাবিয়া দেখুন। আমি অর্থলোভী নই কিন্তু কত বৎসর পরিশ্রম করিয়া হয় ত বৃদ্ধ বয়সে কষ্টসঞ্চিত চল্লিশ হাজার টাকা পাইব কিনা কে জানে ? হয় ত, না খাইয়া মরিতে হইবে। আর এ হাতের কাছে লক্ষ্মী স্বয়ং, কাজও কিছু বেশী শক্ত নয় মেয়েটী মুমূর্ষু, কয়েক ঘণ্টা পরে আমি আবার যে রকম ছিলাম সেই রকমই হইবে। এ বিবাহের কথা চিরদিন গোপন থাকিবে। টাকার লোভে আমি জ্ঞান হারাইলাম। ভিতরের কথা আমি তখন জানিতাম না জানিলে টাকার তোড়া অগ্নির মুখে

নিক্ষেপ করিতাম। টাকা আমাকে রাজী করাইল। হায় অর্থ! তুমিই অনর্থের মূল।

আমার প্রলুব্ধকারীর মুখে তখন হাসি দেখা দিল। টাকার তোড়া দেরাজে রাখিয়া বলিলেন "সময় বেশী নেই প্রস্তুত হবে চল।"

আমার বক্ষের স্পন্দন-শব্দ বাহির হইতে শোনা যাইতেছিল। আমি নিজেকে কোন্ অজানা বালিকার কাছে বলি দিতে চলিলাম। লোকটির পিছনে পিছনে দ্বিতলে গেলাম। একবার ভাবী পত্নীর মুখখানি দেখিব আশা ছিল। আমরা উপরে যাইতেই ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভদ্রলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সব তৈরী দিননাথ?"

"সব। বাড়ীর বাইরে বর ও পুরোহিতকে ফিরে পৌঁছে দেবার গাড়ী পর্য্যন্ত।"

তখন আমাকে বলিলেন "একটা কথা বলে রাখি কোন কিছুতে অধীর হোয়ো না। ক্রমে সব পরিস্কার হয়ে যাবে।"

তিনি পকেট হইতে দুছড়া ফুলের মালা বাহির করিলেন; তারপর আলমারির হইতে বরকন্যার বিবাহের পোষাক বাহির করিয়া আমাকে শীঘ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা হইলে আমাকে সভাস্থলে লইয়া গেলেন। কিছু পরে এক অবগুণ্ঠনবতী বালিকাকে লইয়া এক সুন্দরদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। এই আমার পত্নী! অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া দৃষ্টি চলিল না। কিছু পরে পুরোহিত আসিলেন।

তখন কন্যার পিতা কন্যার দিকে ঝুঁকিয়া আদর করিয়া বলিলেন "মা বেলা তুমি যাকে চাও আজ তারই হাতে তোমায় সম্প্র দান কোরব, শুনছ?"

তাহার ছোট হাতখানি আমার হাতে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আমি মন্ত্র পড়িলাম। মাল্য বদল হইল। ফুলের গন্ধ ও ফুলের চেয়েও কোমল তাঁর স্পর্শ আমাকে উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিল বিবাহের সময় নাম শুনিলাম "বেলাবাসিনী আদিত্য।" বিবাহের পর আমি তাহাকে আমার অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিলাম। তারপর যে স্ত্রীলোকটি আমায় ডাকিয়া আনিয়াছিল সে আমার স্ত্রীকে উপরে লইয়া গেল। আমি, সেই সুন্দরদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ও আরও দু'চারি জন অপরিচিত ব্যক্তি আহার করিতে বসিলাম। আহারান্তে আমার শ্বশুর আবার আমাকে তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন "এ অবধি ত সব ঠিক হয়ে গেল কিন্তু আর একটু কাজ এখোনো বাকি আছে। সেটুকু হোলেই টাকা পাবে।"

"কি কাজ আবার ?"

"তোমার স্ত্রীকে কাল সন্ধ্যার আগে মরতে—তাকে মরতেই হবে। বুঝলে ?"

"আপনি তা হলে নিজের মেয়েকে মারবার জন্য ঘুষ দিচ্ছেন ?"

"আগেই বলেছি প্রতিবাদ করতে পাবে না। আমি যা বললাম তার কিছুতেই অন্যথা হবে না। ও মরলেই সব টাকা তোমার।"

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

নারীর কথা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

—:০:—

১ম প্রসঙ্গ,—নারী ও মাতৃত্ব।

আজকাল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক কাগজে নারীর সম্বন্ধে যত ভাবের যত রকমের আলোচনা চলিয়াছে তাহাতে ভয় হয় যে এ বিষয়ে কোন কথা লিখিতে গেলেই কাহারও না কাহারও বিরক্তিভাজন হইতে হইবে এবং তজ্জন্য বেশ শক্ত দু'কথা শুনিলেও শুনিতে হইতে পারে। আলোচনার একটা মাত্রা আছে, সেই মাত্রা অতিক্রম করিলেই উহা দলাদলির সৃষ্টি করে—আর যখনই দলাদলির সৃষ্টি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে – তখন হইতেই আমাদের স্থিরজ্ঞান প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হয় এবং দলাদলির উত্তাপে এমন সব কথা প্রকাশিত হয় যাহার ভিত্তি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যাহার মূলে থাকে শুধু একটা তর্ক ফাঁদিবার ও চালাইবার নেশা। সৌভাগ্যের বিষয় যে নারীর সম্বন্ধে আজকাল আমাদের আলোচনার সৃষ্টি হইতেছে এবং দুর্ভাগ্যেরও কথা যে ইহাতে দেশে দলাদলিরও সৃষ্টি হইতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের আলোচনা কল্যাণের সংযত সরল পথ ত্যাগ করিয়া অকল্যাণের পথকে আশ্রয় করিয়াছে।

উপরে নারী বিষয়ক যে সকল আলোচনার কথা বলিয়াছি তাহা প্রায়ই নারীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথায় পূর্ণ। বিদ্রোহ আমাদিগকে

নির্ব্বিচারে চক্ষু বুঁজিয়া ভাঙ্গিবার শক্তি দান করে বটে কিন্তু গঠন করিবার মত শক্তি ও কৌশল কোনদিনই প্রদান করে নাই। তাই যদিও আজ চারিদিক নারীর কথায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে তথাপি তাহাতে নূতন কিছু গঠন বা সৃষ্টির সাহস, শক্তি, আনন্দ বিতরিত হইতেছে না, যাহা হইতেছে সে কেবল ভাঙ্গিবার জন্য পূঞ্জীকৃত ধূমায়মান অসন্তোষ ও অস্থিরতা।

কয়েক দিন হইল আমি চারি পাঁচ সংখ্যা পুরাতন "ধূমকেতু" পত্রিকা লইয়া পাড়তে বসিয়াছিলাম দেখিলাম তাহাতে প্রায় সমস্ত প্রবন্ধগুলিই একটা উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ফেণিলতায় আবিল। রাজনৈতিক প্রবন্ধ ব্যতীত উহাতে নারীর সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধও পড়িলাম—প্রায় সকল গুলিই নারীরই লেখা। "নারীসমস্যা" সমাধানের চেষ্টা তাহাতে অতি সামান্যই দেখিলাম, অধিকাংশ স্থানই তার অভিযোগের কথায় পূর্ণ। সে অভিযোগ পুরুষের বিরুদ্ধে; পুরুষ তাহাদের উপর জুলুম করিয়া মাতৃত্বলাভের ব্যবস্থা করে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সুখ নষ্ট করে। পুরুষের প্রতি নারীর যে ঘোর অবিশ্বাস ও সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারই একটা উচ্ছ্বাস অপর একটী প্রবন্ধে দেখিলাম। তাহার ভাবটা এই যে যুগব্যাপী নিপীড়ণের ফলে বর্ত্তমান নারী পুরুষের উপর কোন আস্থাই স্থাপন করিতে পারিতেছে না এমন কি পুরুষ যদি এখন তাহাদিগকে স্বাধীনতাও দিতে চায় তবে তাহার প্রাণে স্বভাবতঃই ভয় জাগিয়া উঠে যে এই অনুগ্রহের পশ্চাতেই বোধ হয় নিগ্রহের একটা ষড়যন্ত্র গঠিত হইতেছে। যাহাই হউক নারীসমস্যা সমাধানের জন্য এই চেষ্টা বড়ই সুখের ও কল্যাণকর হইত যদি শুধু উচ্ছ্বাসের দ্বারা এই চেষ্টা পরিচালিত না হইয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহচর্য্যে সংঘটিত হইত—, যদি তাহাতে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত না হইয়া স্থির প্রশান্ত জ্ঞানের উদাত্ত সঙ্গীত বাজিয়া উঠিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা "নারীসমস্যা"—নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত কিম্বা নারীর আর্থিক স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে চাই না—কারণ ইউরোপে এই 'নারীসমস্যা' যে ভাবে উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের দেশে উহা এখনও সে ভাবে উপস্থিত হয় নাই। জাতীয় জীবন বিকাশে "নারী-মাতার"—দায়িত্ব কত এবং সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দেশের নারীগণ কতটা অবহিত সে বিষয়েই একট আলোচনা করিব ইচ্ছা করিতেছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে—আমাদের দেশের নারীরাও উপরে কথিত—"মাতা" হিসাবে তাহাদের যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে সে গুলিকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করিতে শিখিতেছেন। আমার এ অভিযোগের মূলে একটা প্রকাণ্ড দুঃখের কথা আছে। সরকারী বেসরকারী সকল রিপোর্টেই আমরা দেখিতে পাই শিশুর অকালমৃত্যু আমাদের দেশেই ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২০ ও ১৯২১ খৃঃ এ দেশে হাজার করা ২০৭ ও ২০৩ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। বাংলার কোন কোন জেলায়—যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার এক স্থানে প্রতি হাজার শিশুর জন্মের মধ্যে ৭০০ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। কি ভয়ানক দুঃখের কথা!—এই যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র শিশু মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া বেদনাকাতর চোখে মায়ের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে আমি জানিতে চাই দেশের কোনও "শিক্ষিতা" নারী এ বিষয়ে কোনও কিছু লিখিয়া তাহাদের দুঃখের কথা আলোচনা করিয়াছেন কি—কিম্বা এ অবস্থার কোনও প্রতিকার হইতে পারে কি না তাহার আলোচনা করিয়াছেন কি?—সন্তান প্রসব নারীরই কার্য্য; শিশুর মুখে সঞ্জীবনীরস বক্ষের অমৃতধারা ঢালিয়া দেওয়া একান্ত নারীরই কর্ত্তব্য তবুও যখন দেখিতে পাইতেছি যে দেশের এই দুর্দ্দিনে নারী সমাজে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হইতেছে না তখন এ অভিযোগ মিথ্যা বলিতে পারিতেছি না। যখন দেখিতে পাই যে তাহাদের অঙ্কে শয়ন করিয়াই শিশু অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হয় এবং তাহারা সাময়িক শোকের বশে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াই আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন এবং এই শোকাবহ ঘটনার পুনরভিনয় যাহাতে না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকেন তখন কি এ অভিযোগ সত্য বলিব না যে—মাতৃত্বের গৌরব এ দেশের নারী ভুলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে—অভিযোগের আরও কারণ আছে যেহেতু মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিতে পাই যে "নারীমঙ্গল" প্রভৃতি অধ্যায়ের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নারীর সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্দীপনাময় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। অনেক নারী হয়ত বলিবেন—এ-সব বিষয়ে কেবল "ডাক্তারঃ সবই আলোচনা করিবেন—এবং তাঁহারা দু এক জনে করিতেছেন ও যেমন প্রবীণ বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন বাবু, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—শিশুপালন ও রক্ষণ ব্যাপারে এমন অনেক বিষয় আছে যে সম্বন্ধে ডাক্তারের উপদেশের প্রয়োজন নাই—উপযুক্ত মাতা যিনি, তাহার উপদেশেই চলিতে পারে—এবং যে সব বিষয়ে অজ্ঞতা ও

অনবধানতার জন্য শিশুর স্বাস্থ্যের হানি ঘটিতে পারে—, এমন কি অনেক সময় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। এ রকম বিষয়ে—কোনও নারীর একটী প্রবন্ধও এ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই—এ উদাসীনতার অর্থ কি ?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় 'নারীর মাতৃত্ব"। এখানে এ কথাটাও বলা সঙ্গত যে যদিও আমি নারীর মাতৃত্বের দিকটাই তার জীবনের মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিক বলিয়া উল্লেখ করিতেছি তবুও রাষ্ট্রীয় কিম্বা সামাজিক কর্য্যে তাহার যে সমান অধিকার আছে তাহা অস্বীকার করিতেছি না।

জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে নারীর দায়িত্ব পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ পিতা ও মাতা এই দুই এর মধ্যে শিশুর জীবন ধারণের জন্য ও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে মাতার স্থান পিতার স্থানের অনেক উর্দ্ধে। যে সমস্ত প্রভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয় তাহারা প্রায়ই মাতার সাহায্যেই শিশু দেহে ও মনে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মানব সভ্যতার প্রতি যুগেই যে মাতৃত্বের এই উচ্চ আদর্শ সমাজের নরনারীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি। রোমক সভ্যতার কোন এক যুগে গর্ভিনী নারীর গৃহ ফুলের মালায় বিভূষিত হইত। এথেনীয় সভ্যতার যুগে গর্ভিনী নারীর বাসস্থান পবিত্র. দেব মন্দিরের তুল্য বিবেচিত হইত। Renaissance এর যুগে যখন নূতন নূতন ভাব দলগুলি একে একে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল তখনকার আদর্শ সুন্দরী নারী যে গর্ভিনী নারী তাহা আমরা—তৎকালীন অঙ্কিত চিত্রগুলি হইতে জানিতে পারি।

মনুষ্যজাতির—উন্নতি বিধানে নারীর কর্ত্তব্য কি এবং কি উপায়ে সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে—সে সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান যুগের—বিখ্যাত সাহিত্যিক Ibsen বলিয়াছেন "The women will solve the question of mankind and they will do it as mother." Ellen key এক জায়গায় বলিয়াছেন যে—কোন কোন ক্ষেত্রে নারী তাহার ব্যক্তিত্বের-স্ফূর্ত্তির-জন্য সন্তান প্রসব না করার দাবী করিতে পারে সত্য কিন্তু সাধারণতঃ মাতৃত্বই নারীর সর্ব্বাপেক্ষা—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কালে মাতৃত্বের এই আদর্শ নানাদিক হইতে আক্রমণ করা হইতেছে এমন কি নারীর পক্ষ হইতেও ইহা অস্বীকার করা হইতেছে। এই

ভাবটা বিশেষ রকম প্রকাশ পাইয়াছে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নারীর মধ্যেই। পুরুষের জীবনের আদর্শের প্রতি তাহাদের একটা অকারণ মোহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে মাতৃত্বের প্রতি জাতির ভবিষ্যৎগঠনে নারীর মহৎ কর্ত্তব্যের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবহেলা দেখা দিয়াছে। পুরুষের কার্য্যজীবনের বৈচিত্র্য, সাফল্য ও বিফলতায় সুখদুঃখের আশা নৈরাশ্যের খেলা বর্ত্তমান নারীর চতুর্দ্দিকে এমন একটা মোহের জাল রচনা করিয়াছে যে তাহারা আজ নারী ও পুরুষের দেহগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অস্বীকার কিম্বা অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষের শিক্ষার মত শিক্ষা—পুরুষের কার্য্যের মত কার্য্য, এমন কি পুরুষের ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রকরণ গুলিও গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের কতগুলি কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি যাহা নারীসমাজ দাবী করিতেছেন তাহাকে অন্যায় বলিতে পারিব না কিন্তু যখন নারী—স্বীয় কর্ত্তব্যের গণ্ডী অবহেলা করিয়া যে কর্ত্তব্য একান্ত তাহারই, অন্য কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা পদদলিত করিয়া—পুরুষের কার্য্য অনুকরণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে তখন ইহাকে অন্যায় ও দোষাবহ বলিতে বাধ্য হইব। আমাদের মনে রাখিতে হইবে "Freedom is only good when it is only a freedom to follow the laws of one's own nature, it ceases to be freedom when it becomes a slavish attempt to imitate others" স্বাধীনতা ততকাল সুফল প্রদান করে যতকাল ইহা আমাদের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিবার স্বাধীনতা শুধু আনয়ন করে আর যে স্বাধীনতা আমাদের স্বীয় প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া—পরপ্রকৃতি অনুসরণে প্রবৃত্ত করে, সে স্বাধীনতা দাসত্বেরই রূপান্তর মাত্র। বর্ত্তমান কালে নারীর এই পুরুষ প্রকৃতি অনুকরণ করিবার স্পৃহার জন্যই পাশ্চাত্য দেশে মাতৃত্বের গৌরব আর পূর্ব্বের মত অনুভূত হয় না এবং আমাদের দেশের নারীও যে ঐ গৌরব ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা তাহাদের লেখার মধ্যে পাইতেছি। "নারীত্ব সার্থক করবার সহস্র পথ আছে বিবাহ ছাড়াও করবার পথ আছে"—নারীত্ব সর্থক করবার সহস্র পথ আছে কিন্তু সে নারী হিসাবে নয় মানুষ হিসাবে এ কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এ নারীত্ব সার্থক করিবার জন্য সকল নারীকেই যে বিবাহবন্ধন ত্যাগ করিয়া মাতৃত্বের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া—সহস্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে এ কথা অনুমোদন করিতে পারি না—। আমরা compulsory motherhood এর পক্ষপাতী নই। মাতৃত্ব এত বড় একটা দায়িত্ব যে

যদি কোন নারী এ দায়িত্ব গ্রহণে নিজকে অনুপযুক্ত মনে করেন তবে তাহার উপর এই বৃহৎ কর্ত্তব্যের ভার নিক্ষেপ করা অতিশয় অসঙ্গত হইবে। Lady Henry Somerset এ সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে "If voluntary motherhood is the crown of the race, involuntary compulsory motherhood is the very opposite" এ সম্বন্ধে এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা একান্ত ব্যক্তিগত কথা। ইহাকে সমাজগত ও জাতিগত মনে করিয়া দেশের সকল নারীকেই মাতৃত্বের দায়িত্ব পরিহার করিয়া সহস্র বিভিন্ন পথে তাহাদিগের নারীত্বকে সার্থক করিবার জন্য আহ্বান বা নিমন্ত্রণ জাতীয় উন্নতির মহা অকল্যাণকর এবং যাহারা এই আহ্বান প্রেরণ করেন তাহারা জাতীয় উন্নতির ঘোর পরিপন্থী।

মাতৃত্ব নারীজীবনে কতটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে সে সম্বন্ধে Ellen Keyর একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

"As a general rule, the woman who refuses mothehood in order to serve humanity is like a soldier who prepares himself on the eve of battle for the forthcoming sturggle by opening his veins"

শ্রীঅগ্রমান দাশ গুপ্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

মদ্যপান সম্পূর্ণ অবৈধ।

(প্রতিবাদ)

গত ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যার 'প্রতিভা' পত্রিকায় "প্রাচীন ভারতে মদ্যপান" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয় "বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্র ও দেশাচার ভদ্রসমাজে মদ্যপানের প্রতিকূলে কেন" এইরূপ একটী কৌতূহলগর্ভ প্রশ্নের অবতারণা

করিয়াছেন। প্রবন্ধকার প্রাচীন স্মৃতিশিরোমণি মনুসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতার প্রমাণাদি তুলিয়া "ফলতঃ স্মৃতিশাস্ত্র সুরাপান দ্বিজমাত্রেরই পক্ষে মহাপাপ এবং মদ্যপান অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ পাপ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং স্মৃতির এই ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ মানিয়া লইয়াছেন।" বলিয়া বর্ত্তমান সমাজের উপর স্মৃতিশাস্ত্রের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর "মনুশাসিত আর্য্যসমাজে * * * * এই প্রথা উঠিয়া যায় নাই" ইত্যাদি লিখিয়া লেখক মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক এবং ২য় অধ্যায়ের ১৭৭ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া "মদ্যপান সমাজে প্রচলিত ছিল" এইরূপ অনুমান, এবং ২য় শ্লোকটী ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশেষ নিষেধপর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুরাপান শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও সমাজ হইতে উঠিয়া যায় নাই, এই উক্তির দ্বারা লেখক কি বলিতে চান, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ইহার দ্বারা লেখক যদি মনুস্মৃতির অনুশাসন সর্ব্বথা সম্মানিত হয় নাই বলেন, তদুত্তরে বক্তব্য যে, শাস্ত্রের যাবতীয় বিধিই কি আমরা যথাবৎ পালন করিয়া আসিতেছি? যদি সমগ্র বিধি-পালনের ত্রুটি সত্ত্বেও শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে পূর্ণমাত্রায় নিষেধ পালনের অসদ্ভাবে শাস্ত্রের আজ্ঞাভঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়? বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট দিন দিন যত নিত্য নূতন আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রচলন করিতেছেন, প্রত্যেক প্রজাই কি ঐ সব বিধান মাথা পাতিয়া লইতেছে? আর যে দু'দশজন ঐরূপ আইন লঙ্ঘন করিতেছে, সমাজ কি আদর্শ ভাবিয়া তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করিতেছে? লেখক "ন মাংসভক্ষণে দোষঃ" ইত্যাদি শ্লোকটীর যে অনুবাদ দিয়াছেন, উহা মূল ও ভাষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"অবিহিতাপ্রতিষিদ্ধমদ্যমৈথুন নিবৃত্তের্মহাফল—
কথনার্থোঽয়ং উক্তস্যৈব মাংস বর্জন মহাফল কথনস্যানুবাদঃ।"

অর্থাৎ অবিহিত ও অনিষিদ্ধ মদ্যমৈথুনাদি হইতে নিবৃত্তি মহাফল জনক, ইহা বলিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত ৫৪ শ্লোকে মাংস বর্জনের যে মহাফল বলা হইয়াছে, এই ৫৬ শ্লোকটী তাহারই অনুবাদ। তাৎপর্য্য, একই শাস্ত্রকার (মনু) যদি একটী (৫৪) শ্লোকে একবার মাংসবর্জনের মহাফল বলিয়া পরে আবার অন্যত্র (৫৬) শ্লোকে মাংস ভক্ষণে কোন দোষ নাই বলেন, তাহা হইলে স্বোক্তিবিরোধবশতঃ তাঁহার উক্তি উন্মত্ত প্রলাপের মত

প্রাজ্ঞসমাজের অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। এ জন্য মীমাংসানিপুণ ভাষ্যকার সমাধান করিয়াছেন, যে এই ৫৬ শ্লোকটী ৫৪ শ্লোকের অনুবাদ মাত্র, অর্থাৎ ঐ ৫৪ শ্লোকের উক্তিটী এই ৫ শ্লোকে অন্যভঙ্গীতে বলিয়া দৃঢ় ভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। শ্লোকটীর প্রকৃত অনুবাদ বঙ্গবাসীর সংস্করণে, "বৈধমাংস ভক্ষণে" ইত্যাদি দেখিলেই বিষয়টী সহজবোধ্য হইবে। এই শ্লোকে বৈধমৈথুনাদি সেবনে দোষ নাই বলাই গ্রন্থকারের মুখ্য অভিপ্রায়! বিশেষতঃ এই বৈধমদ্য—মৈথুনাদি হইতে নিবৃত্তিকেও মহাফল বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে দোষ নাই বলায়, পাপ নাই এমন অর্থ বুঝাইবে না। দোষ ও পাপ একার্থক নহে। কচিৎ দোষ শব্দে পাপ বুঝাইলেও ঐটী উহার গৌণার্থ বুঝিতে হইবে। শব্দ শাস্ত্রে সম্ভব পক্ষে মুখ্যার্থত্যাগ করিয়া গৌণার্থের গ্রহণ জঘন্যনীতি রূপে নিন্দিত হইয়াছে। তারপর ২য় অধ্যায়ের ১৭৭ সংখ্যক, "বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকটী তুলিয়া ঐ শ্লোকস্থিত মধুশব্দের ভাষ্যকার কৃত অর্থ "ক্ষৌদ্র" এবং অনুবাদক পণ্ডিত মহোদয় প্রদত্ত অর্থ "মধু"ত্যাগ করিয়া অদ্ভুতমদ্য অর্থের কল্পনা করিয়া ঐটী একেবারে বিশেষ নিষেধপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল কিরূপে বুঝা দুরূহ। ক্ষুদ্রা শব্দে মধুমক্ষিকা, তৎকৃত বলিয়া ক্ষৌদ্র (ক্ষুদ্রা+ষ্ণ) শব্দে মধুবুঝায়,—ইহা লেখকের মত পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্যই জানেন। এই বার লেখক স্মৃতিশাস্ত্রকে রেহাই দিয়া প্রাচীন লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের "খেয়াল" কাব্য ঋতুসংহার পর্য্যন্ত ঘাঁটিয়া "মদখাওয়ার" প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ ইতিহাস বা মতান্তরে মহাকাব্যরূপে পরিগণিত হইলেও ঐগুলি স্মৃতিশাস্ত্র নহে। সমাজ শাসন লৌকিক কাব্যেরও স্মৃতিশাস্ত্র সমকক্ষ হইবার দাবী সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। মনুসংহিতার মতে শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার ধর্ম্মনির্ণয়ে মুখ্যপ্রমাণ। "স্মৃতিস্তুধর্ম্মসংহিতা," শ্রুতিমূলক ধর্ম্মসংহিতাগুলিকেই স্মৃতি বলা হয়। মনু হইতে আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠ পর্য্যন্ত বিংশতি জনঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রকার নামে পরিচিত। কালিদাস ত দূরের কথা, উহাতে বাল্মীকির পর্য্যন্ত নাম নাই। বৈদ্যকশাস্ত্রে শূকরের ও কুকুরের মাংসের গুণবর্ণনার ঘটা আছে। অতএব সেগুলি ভক্ষ্য ইহা বোধ হয় লেখকেরও মত নহে। ঐ শাস্ত্রমতে কদাচিৎ জীবন সঙ্কটে মদ্যপান ব্যবস্থিত হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার জন্যও অপেক্ষাকৃত অল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। ভবিষ্যপুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে,—

"যদি রোগৈর্ভবেদ্দষ্টোনেতরস্য কদাচন।
কৃচ্ছ্রংচাত্র নরশ্রেষ্ঠ তপ্তকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ।"

লেখক রামায়ণ হইতে সুরার উৎপত্তির যে বিবরণ দিয়াছেন, উহাতে তিনি "সুরা" শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঁয়তাল্লিশ সর্গের আটত্রিশ সংখ্যক "দিতেঃ পুত্রাঃ ন তাং রামঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সুরা শব্দটী শরীরিণী বরুণ কন্যারূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক এখানে সেটী একেবারেই দ্রবময়ী বোতলবাহিনীরূপে ধরিয়া লইয়াছেন। শ্লোকের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উপক্রম ও উপসংহার এবং প্রকরণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ঐ প্রকরণের বত্রিশ হইতে আটত্রিশ পর্য্যন্ত শ্লোকে সমুদ্র মন্থনে ধন্বন্তর, অপ্সরোগণ, সুরার অধিষ্ঠাত্রী বারুণীর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের বিশ্বাসার্থ আমি লেখকেরও উপজীব্য বঙ্গবাসীর সংস্করণের রামায়ণ হইতে অনুবাদটী যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। "রঘুনন্দন! তৎপরে সেই সমুদ্র হইতে সুরার অধিষ্ঠাত্রী বারুণী নামে বরুণের মহাভাগা কন্যা, কেহ তাহাকে গ্রহণ করেন, এই অভিলাষে উত্থিত হইলেন।" এই শ্লোকোক্ত সুরাটী যদি দ্রবময়ী হইতেন, তাহা হইলে উহার সহিত "বরুণাত্মজা" "অনিন্দিতা" "মহাভাগা" বিশেষতঃ "পরিগ্রহং মার্গমাণা" বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইতে পারিত কিনা, সংস্কৃতজ্ঞ সুধী মণ্ডলী ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তৎপর কিস্কিন্ধ্যার রাজা বানর ও রাণী বানরী এবং লঙ্কার রাজা রাণী রাক্ষস রাক্ষসীর আদর্শ বর্ত্তমান সমাজে অনুসৃত হওয়া উচিত কিনা, প্রাজ্ঞ সামাজিকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। সুখের বিষয় লেখক স্বয়ং উহাতে বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। লেখক মহাশয় উত্তরকাণ্ডে অশোক বনে রামচন্দ্রের একটি বেশ জমকাল পান গোষ্ঠীর বর্ণনা আছে বলিয়াছেন। আমরা ঐ অংশ পাঠ করিয়া পান গোষ্ঠীর কোন নিদর্শন দেখিলাম না। ঐ অংশে বাল্মীকি—প্রতিভাসুলভ অশোক বনের একটি সরল সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাই। "অশোক বনিকাং সীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ।" ৫২।১৭। তৎপরে "কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিবসাদহ" ৫২।১৮। শ্লোকে কুশাস্তরণের উপর পাতিত পুষ্পসজ্জিত আসনে রামচন্দ্রকে উপবেশন করিতে দেখি। বনের মধ্যে কুশাসনে বসিয়া পান গোষ্ঠীর খবরটা নূতন বটে। লেখক বলিতে পারেন, কেন, "কুজিকাপাঙ্গসংযতে" এটাত শাস্ত্রেরই বচন? বাৎসায়ন প্রণীত

কামসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশে যেরূপ দেশ কাল পাত্র লইয়া পান গোষ্ঠীর রচনা পদ্ধতি দেখিয়াছি, এস্থলে তাহার একটু আভাসও পাই না। অধিকন্তু রামচন্দ্রকে এখানে "পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মকার্য্যাণি" ৫২।২৭। করিতে, সীতাকে "সীতাপি দেবকার্য্যাণি কৃত্বাপৌর্ব্বাহ্ণিকাণি বৈ" ৫২।২৮। দেব পূজাদি করিতে শুনি। তবে আঠার শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে সীতাকে মৈরেয় মধুপান করাইতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। "পায়য়ামাস" পদটী ণিজন্ত ক্রিয়া, সুতরাং রাম নিজে পান করেন নাই, একটা বেশ সাব্যস্তই আছে। ঐ শ্লোকে শুচি অর্থাৎ পবিত্র মৈরেয় মধু (শীধু) পান করাইলেন, ইত্যাদি আছে। লেখক মৈরেয় মধু অর্থে শীধু (জ্বাল দেওয়া ইক্ষু রস) বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকায় শতমূলীর রসে প্রস্তুত মদ্যকে শীধু বলা হইয়াছে। যে অর্থই ধরা যাউক, মৈরেয় মধু যে দ্বাদশ প্রকার মদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট সুরা মদ্য নহে, ইহা নিশ্চিত। উহা নিকৃষ্ট সুরা মদ্য হইলে তৎপূর্ব্বে "শুচি" পবিত্র এ বিশেষণ সাজিত না। লোকে "গঙ্গাজল পবিত্র" বলার রীতি প্রচলিত। কিন্তু "মদ্য পবিত্র" এরূপ বলিতে শুনা যায় না। যাহা প্রাকৃত লোকেও বলে না কবিগুরু বাল্মীকি এমন একটা নিরর্থক বিশেষণ রামায়ণে প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে। লেখক মহাশয় এখানে "শুচি" শব্দের "স্বচ্ছ" তর্জমা করিয়াছেন। এরূপ নূতনতর তর্জমার উদ্দেশ্য কি বুঝা যায় না। এই ওষধিজ মৈরেয় মধুপান যে ক্ষত্রিয় স্ত্রীর পক্ষে মহা পাতক নহে, এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার কথা লেখক পূর্ব্বে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। এইবার রামায়ণের শেষ প্রমাণ, সীতাদেবী সুরাপূর্ণ সহস্র কলসদিয়া গঙ্গাপূজার মানস (মানত) করিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। কালিকা পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে ত্রিবিধ পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। তন্মধ্যে "সুরা মাংসাদ্যুপহারৈর্নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।" ইত্যাদি প্রমাণে মদ্যমাংস উপকরণে অমন্ত্রক পূজাকে তামসী বলা হইয়াছে। লেখকের উদ্ধৃত দুই শ্লোকেই "যক্ষ্যে" এইরূপ পূজার্থক যজধাতুর কর্তৃগামি ক্রিয়ার ফল বুঝাইতে লৃট্‌বিভক্তির আত্মনে পদের প্রয়োগ হইয়াছে। উহাতে স্বয়ং পূজা করিবেন, ইহাই বুঝাইতেছে। স্ত্রীলোক কৃত পূজার মন্ত্রপাঠ নাই, সুরা মাংস উপহার, সুতরাং ঐ পূজা তামসী ও শাস্ত্রবিধান সঙ্গত। মদ্যমাংস তামসী পূজার উপকরণ রূপে প্রদত্ত হইলেই, উহাদের অবাধ পানভক্ষণ সমাজে প্রচলিত থাকিবে, এরূপ অনুমানের বিশিষ্ট হেতু দেখা যায় না। মহাভারতের

প্রণেতা শ্রীলব্যাসদেব বলিয়া উহার অনেক প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে উদ্ধৃত দেখা যায়। সুতরাং উহাতে যদি মদ্য পানের প্রশংসাবাদমূলক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় সেটী বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মহাভারতোক্ত উপাখ্যানের উপসংহাররূপ ফল শ্রুতিতে "অপেত ধর্ম্মা" "ব্রহ্মহা" "ইহপরলোকগর্হিতং "পুনঃ সংস্কার মর্হতি" প্রভৃতি যে অভিসম্পাত ও সুতীব্রনিন্দা—বাদ দেখা যায়, তৎসত্বেও যদি ঐ গ্রন্থের স্থলান্তরে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত পান গোষ্ঠীকে সভ্যসমাজের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে নারায়ণের অবতার ব্যাসদেবের কৃত পঞ্চম বেদ নামে সমাদৃত মহাভারত গ্রন্থখানি অসামঞ্জস্য বহুল ঘটনা পূর্ব্বোক্তি বিরোধের ভাণ্ডার বলিতে হয়। বিচারক প্রাজ্ঞগণ জগন্মান্য ব্যাসদেবের বালসুলভ এই অদূরদর্শিতার সমর্থন করিবেন কি? হরিবংশখানি মহাভারতেরই পরিশিষ্ট। সুতরাং মূল গ্রন্থসম্পর্কে—প্রযুক্ত যুক্তি ইহাতেও প্রযোজ্য হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যদুবংশ ধ্বংস প্রসঙ্গে যে মদ্যপানের কথা আছে, উহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অভিশাপের কথা স্পষ্ট না থাকিলেও ঐ দুই গ্রন্থেই "বিপ্রাণাং সশাপ ব্যাজেন" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণোক্ত অভিসম্পাতের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ঐ ইঙ্গিত হইতে ছত্রিশ কোটি যদুবংশের ধ্বংসের মূল উহাদের অতিরিক্ত মদ্যপান জনিত আত্ম-কলহ বা গৃহবিচ্ছেদ ইহা বেশ পরিষ্কার বুঝাইতেছে। অনুসন্ধিৎসু লেখক এস্থলে "শ্রদ্ধেয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণ চরিত্র" পুস্তকে এবিষয়ে আদৌ উল্লেখ করেন নাই" লিখিয়াছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কৃষ্ণ চরিত্রের ৭ম খণ্ড, প্রভাস, ১ম পরিচ্ছেদ যদুবংশ ধ্বংস প্রস্তাবের পাদটীকায় (বসুমতী সংস্করণ ৫৫৭ পৃঃ) ৺বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "যাদবেরা এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষ গণকে এই নীতির অনুবর্ত্তী হইতে অনুরোধ করি।" এতবড় একটা কথা গবেষণাশীল শাস্ত্র দর্শী লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি আকর্ষণ না করা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয়! কালিদাসের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রঘুবংশ ও কুমার সম্ভব তৎকৃত মহাকাব্য। জলকেলি, মধুপান প্রভৃতি মহাকাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ঐগুলি বাদ দিলে অঙ্গহানি প্রযুক্ত মহাকাব্যের সৌন্দর্য্য-পুষ্টি হয় না। দেবতা বা সদ্ বংশজাত ক্ষত্রিয় রাজা মহাকাব্যের নায়ক বা অবলম্বন। ইহার বর্ণনীয় মূল বিষয়টী ইতিহাস বা লোক বৃত্ত হইতে গৃহীত হয়। কাব্য প্রকাশ, সাহিত্য

দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশে এ সকল কথা সবিস্তারে উল্লিখিত আছে। এইরূপ নায়ক অবলম্বনে যে কাব্য রচিত হয়, উহাতে রস পুষ্টির জন্য কল্পনা বাহুল্যের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। কেবল কালিদাস কেন, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ কোন মহাকবিই বিলাসিধনি সুলভ পানোৎসব আদি বাদ দিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এ কবি কল্পিত অতি রঞ্জিত চরিত্র হুবহু নকল করিলে আসল সমাজের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। নাটকগুলি দৃশ্য কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মেঘদূত খণ্ড কাব্যখানি যক্ষের রাজধানী, যক্ষের দৈনিক জীবনী ও বিলাস প্রথা বর্ণনায় পরিপূর্ণ। অবশ্য কবি দেবযোনি বিশেষ বা উপদেবতাদের রাজভৃত্য যক্ষ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব প্রতিভাবলে তৎকালীন উত্তর ভারতের একখানি অত্যুত্তম মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মূল অবলম্বন কর্ত্তব্যবিমুখ, শ্রমকাতর, বিলাসের দাস, কামকিঙ্কর, প্রথমশ্রেণীর স্ত্রৈণ প্রভুনিগৃহীত যক্ষ—সভ্য মানব সমাজের আদর্শ হইবার নিতান্ত অযোগ্য। ঋতুসংহার পুস্তিকাখানি আজ কাল্‌কার চটকদার নাটক নভেলের ন্যায় বেশ মুখরোচক, কর্ণরসায়ন ও অবসরবিনোদন। উহাতে প্রকৃতির বরপুত্র কবির বর্ণনাগুণে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সজীব ও মোহন ছবি অঙ্কিত হইলেও কর্ম্মিজগতের প্রাণের কোন সাড়া নাই। এ চটুল কাব্যখানি কালিদাসীয় যুগের শ্রম বিমুখ বিলাসী ঔপনিবেশিক দিগের সাময়িক ক্রীড়াক্ষেত্রের চিত্রসদৃশ। লেখক মহিলামণ্ডলীর পক্ষে মদ্য মাংসাহার নিষেধের পোষক কোন প্রমাণ পান নাই বলিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রবন্ধের কলেবর পুষ্টির আশঙ্কায় মাত্র দুই একটা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

(১) যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্যাৎ ন তাং দেবাঃ পতিলোকং
নয়ন্তীতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃতা শ্রুতিঃ।

(২) ভবিষ্যে,— "ব্রাহ্মণ্যাপি ন পেয়া বৈ সুরাপাপ ভয়াবহা।"

* * *

পতত্যর্দ্ধ শরীরেণ ভার্য্যা যস্য সুরাং পিবেৎ॥"

উদ্ধৃত পূর্ব্বশ্লোকে কেবল ব্রাহ্মণী শব্দ থাকিলেও পরার্দ্ধে "যাহার ভার্য্যা সুরাপান করে"

সামান্যতঃ উল্লেখ থাকায় দ্বিজাতি স্ত্রীমাত্রকেই বুঝাইতেছে।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়, ২৯ ও ৩১শ গদ্যাংশে;—"কলত্রং বা সুরাং পিবতি" "যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি" যে দ্বিজ পত্নী সুরাপান করে, এবং যে সকল স্ত্রী পশু (মাংস) ভক্ষণ করে ইত্যাদি।

শাস্ত্রে সংক্ষেপে সুরাপানের নিম্নোক্ত দোষগুলি উক্ত হইয়াছে; "সুরাপানে মত্ততা, শারীরবৈকল্য, গতি এবং বাক্যের স্খলন, লজ্জা এবং মানহানি, কামাধিক্য, লোহিত নেত্রতা এবং ভ্রান্তি।"

যে সময়ে সভাদেশ মাত্রেই রাজ বিধান দ্বারা সুরাপান প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধ মহাদেশ যে সময়ে "যদি কোন ষ্টিমার কোম্পানি মদ্যবহন করে, তাহারও দণ্ড হইবে" এরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত করিয়াছেন, যাহা পান করিলে ইহকালে মানবের অর্থনাশ, শরীরনাশ, স্বাস্থ্যনাশ, মাননাশ এবং ধর্ম্মনাশ, আর পরকালে অনন্তকাল নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়; বর্ত্তমান সময়ে সেই জঘন্য সুরাপান সংক্রান্ত প্রাচীন পদ্ধতির প্রচার করিবার প্রয়াস স্বীকার করিয়া জন সাধারণের শিক্ষক স্থানীয় সংবাদ পত্রের পবিত্র কলেবর কলঙ্কিত করিবার সার্থকতা কি, আমরা পণ্ডিত লেখকের নিকট সেটী জানিতে চাহি।*

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

মায়ের ডাক।

—:০:—

আজ এই বিশাল মহাদেশের সুপ্তচেতনার অবসানে প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক পল্লীতে এবং প্রত্যেক সমাজে যে এক বিরাট কর্ত্তব্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, পূর্ব্বগগনে নূতন আশার অরুণ-উষার আরক্তিম কিরণচ্ছটার সমাগমে যে সহস্র বিহঙ্গমীর কলকণ্ঠের মঙ্গলগীতি আমাদের বিবশ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে আলস্যজড়তা ত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ 'প্রতিভা' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ভারতীভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতিবাদও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। প্রতিভা ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের ইচ্ছা নয়, তিন মাস অপেক্ষা করা। উভয় লেখকই স্থানীয়,—স্থানীয় পত্রিকায় তাঁহাদের বক্তব্য আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—সেই হিসাবে এই প্রতিবাদ প্রবন্ধ 'পরিচারিকা'য় প্রকাশিত হইল। স. সঃ।

করিতেছে—ইহা মহাশক্তিপূজার পুণ্যবোধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঘোর অমানিশার অবসানে যেমন দিবাকরের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী, সেই প্রকার পৃথিবীর ইতিহাসেও প্রত্যেক সমাজের পতন এবং উত্থান সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সংঘটিত হইয়া থাকে। সমাজ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া পুরুষের প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত, জাতির ভিত্তিস্বরূপা মাতৃজাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়; পক্ষান্তরে যখন তাঁহাদিগকে জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায় মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তখনই তাহার সভ্যতা এবং শান্তির চরম বিকাশ হয়। প্রাচীনভারত এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্যদেশ ইহায় সাক্ষ্য দিতেছে। ইউরোপ যে আজ আমাদিগকে স্বীয় শিক্ষায়, গৌরবে এবং শৌর্য্যে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে ইহার একটি কারণ যে তাহারা মাতৃজাতিকে সম্মান করিতে জানে—তাহারা শক্তির উপাসক!

অতীত ভারতের ইতিহাসেও এমন একটা গৌরবময় অধ্যায় আছে, যখন মাতৃজাতি মস্তিষ্ক শক্তির প্রতিযোগিতায় পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন। বৈদিক যুগের মাতৃজাতির প্রতিভা এবং মৌলিকতার কথা চিন্তা করিলে বিস্ময় এবং আনন্দে প্রাণ বিহ্বল হইয়া উঠে। একমাত্র সতীত্বের গর্ব্ব করিয়াই যে ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা নহে; ইঁহাদের পরমার্থজ্ঞান এবং সাহিত্যকলার পারদর্শিতা এখনও বেদের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ইঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পদতলে জ্ঞানাবতার শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যকেও অবনত মস্তকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে সাধারণ কুলাচার হইতে আরম্ভ করিয়া কূট রাজকার্য্যে পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মেই সহধর্ম্মিণীর স্থান অতি উচ্চে রহিয়াছে। অতএব কোন জাতিরই অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলে সমাজের অধোগতি ভিন্ন উন্নতি সম্ভবপর হইবে না।

মাননীয় মনুমহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের প্রাচ্য এবং প্রতীচীর মনীষী মণ্ডলী সকলেই মাতৃজাতির সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। ভগ্নস্বাস্থ্যকে নীরোগ করিতে হইলে যেমন তাহার রোগের মূল কারণ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হয়, সেই প্রকার কোনও দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশজননীগণের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুবন্দোবস্ত সর্ব্বপ্রথমেই করিতে হইবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য একমাত্র জননীই

সর্ব্বতোভাবে দায়ী এবং তাঁহাদের জীবন-গঠনে তাঁহারা যে প্রকার সহায়তা করিতে পারেন শত শিক্ষক দ্বারও তাহা সম্ভবপর নহে।

দেশের যাঁহারা হিতাকাঙ্খী তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বর্ত্তমানে আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্যই হইল—সুমাজোপযোগী এবং ধর্ম্মানুমোদিত স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন। দেশে এরূপ শিক্ষা বর্ত্তমানে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। যাহাও কদাচিৎ দৃষ্ট হয় তাহাও আবার আমাদের যথোচিত সাহায্যের অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে দুই এক নীরব কর্ম্মীর আজীবন সাধনায় যে আশাতরুর উদ্ভব হয় তাহা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবার পূর্ব্বেই সহানুভূতিবারির অভাবে অকালে কালের করাল কবলে বিলীন হইয়া যায়! সমুদ্রের অতল অন্ধকার গহ্বরে কত যে মহামূল্য রত্ন আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত থাকে কে তাহার সন্ধান করে?

"মাতৃ-মন্দির" শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।

প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা কি দোষাবহ ?

মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক সকল রকম কাগজেই মেয়েদের বিষয় নিয়ে আলোচনা দেখা যায়। অনেক জায়গায় এ সব আলোচনা মেয়েরাই করেন। এটা দেশের পক্ষে একটা শুভলক্ষণ বলেই মনে হয়; কারণ এতে করে বোঝা যাচ্ছে দেশ আমাদের সম্বন্ধে আর যাই হোন, সম্পূর্ণ উদাসীন নন্।

শিক্ষা এবং আদর্শ কি হবে এই নিয়েই আলোচনা বেশী হয় এবং সেই সময়েই অনেক স্থলে বর্ত্তমানে শিক্ষিতা ব'লতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ প্রসূত আক্রমণ দেখা যায়। আমি অনেক প্রবন্ধ পড়ে দেখেছি—যেগুলিতে আক্রমণ বেশী সেগুলির লেখক এবং হঠাৎ কখনও লেখিকাগণ যাঁদেরকে আক্রমণ করছেন তাঁদের সঙ্গে যে কোনও রকম পরিচয় রাখেন তার প্রমাণ দেন না। অথচ নিজের মনগড়া কতকগুলি দোষ এই

শিক্ষিতা নামধারিণীদের উপর চাপিয়ে দেন। শিক্ষিতা বল্‌লে সেই মাত্র-বোধদয়-পড়া, স্বামীকে ভুলবানান সংযুক্ত, "যাও পাখী বোলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে" ছড়া লেখা, পাখী ফুলের ছবি শোভিত চিঠি লেখ্‌বার ক্ষমতামাত্রপ্রাপ্তা মেয়েটী হতে মিস্‌ হল্যাণ্ডের মত পি এইচ্‌ ডি উপাধিধারিণী সবাইকেই বোঝায়, এবং ঐ নোলোক-নাকে উচ্ছ্বাসময়ী বধূটির মন আর ডিগ্রিধারিণীর মনটাকেও এক পর্য্যায়ভুক্ত করে ফেলা হয়। এখন ঐ বউটীকে লেখা পড়া শেখাবার সময় যেমন করে হোক বিয়ে হলে বরকে চিঠি লিখতে পারলেই হ'ল বলে লেখা পড়া শিখতে বলা হয় এবং সে জীবনের উদ্দেশ্যকে ঐটুকু পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। অনেকগুলি প্রণয়সম্ভাষণ মুখস্থ করা, আর প'য়ে রফলা আর শ'য়ে রফলা ঠিকমত লিখতে পারাই বিদ্যার যার চরম সীমা সে যদি সোণার জলে নাম লেখা সিল্কের মলাট ঝকঝকে সব উপন্যাসগুলির মধ্যেই দিনগুলিকে ডুবিয়ে দিতে চায় তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না—দোষ দেওয়া যায় তাঁদেরকেই কেবল, যাঁরা তার জীবনের লক্ষ্যটীকে ঐ ছোট সীমার মধ্যে এনে দিয়েছেন। কিন্তু যার বিদ্যার সীমা আরও এগিয়ে গিয়েছে যে জ্ঞান পিপাসার জন্যই কত সাহিত্য, কত ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সেও যে শুধু খাটে শুয়ে ঐ নভেলগুলিই পড়বে—এ রকম যাঁরা মনে করতে পারেন তাঁদের পক্ষে বাতুলাগারে যাওয়াই সব চেয়ে প্রশস্ত উপায় বলেই মনে হয়। অথচ এই রকম বাতুলের মত কথা বাহাদুরীর সঙ্গে বলেই অনেক পুরুষ আনন্দ পান—আজও দেশে তাই দেখা যায়।

অল্পদিন হ'ল কোনও একটা স্কুলের রিপোর্টে ডিগ্রিধারিণীদের খাটো কর্‌বার প্রয়াসে একটা এরকম বাতুলের গল্প বেরিয়েছিল। কেরাণীর শিক্ষিতা স্ত্রী খেচড়ান্ন রাঁধতে গিয়ে পাক প্রণালী পড়ে নির্দ্দেশ মত রান্না করেছিলেন—হাঁড়িশুদ্ধ জল উনানে চাপিয়ে চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি আস্তাকুঁড়ে ফেলে, নিজের মুখে সরা চেপে—এক অপূর্ব্ব খাদ্য। রিপোর্ট পড়ে সব আগেই আমার মনে হল এ বোধহয় স্ত্রীশিক্ষা যুগের প্রথম অবস্থার পুরুষের কাছেই বিদ্যালাভ করেছে এমন একটী মেয়ে—নৈলে তার এ দুর্দ্দশা হবে কেন যে সরাটা নিজের মুখে চাপা দেবে।

মেয়েদের কোনও মত না নিয়ে, তাদের দরকার অদরকার কি না জিজ্ঞাসা করে পুরুষেরাই যখন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন, তাঁরাই যখন বালিকাবিদ্যালয়গুলি

চালাতেন এবং বালিকাদের শিক্ষাদাতা ছিলেন তখন ঘরেও নারী সম্পর্কে না আস্‌ছে যে মেয়ে তারই পক্ষে একরকম হওয়া কিছুটা সাজ্ঞ্ত যদি সে পাগল বা "ছাগল" (idiot) হ'ত। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্না মা দিদিমা শাশুড়ী ইত্যাদিকে বাড়ীতে দেখ্‌ছে এমন মেয়ের বুদ্ধির কল্পনা করাও সেই পুরুষেরই সাজে, যাঁর বাহিরের ঘরে তাসের আড্ডাটা স্ত্রীর হাতের চা মিঠাই আর সাজা পানের জোরেই অবাধে অবিরাম গতিতে চলে আসে।

শিক্ষিতাকে ছোট করলেই কি অশিক্ষিতার গৌরব বেড়ে যায় ? তবে এই নিতান্ত হাস্যকর, নিজেদের সঙ্কীর্ণ মনের পরিচায়ক এই হীন প্রয়াস বারবার কেন ?

এটা ঠিক বি, এ, এম, এ ; পাশ করাই শিক্ষিতার লক্ষণ নয়—ইংরাজিতে culture বা refinement যাকে বলা হয়, ডিগ্রী পেলেই যে তা পাওয়া যাবেই এ কথা বলা যায় না—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের পাশ করা অনেক ছেলে। কিন্তু একজন শিক্ষিত ছেলে নারীর সম্মান রেখে চল্‌তে জানে না বলেই যে সকল শিক্ষিত ছেলেই জানে না এটা যেমন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নয়, তেমনি কোন পাড়ার একটী শিক্ষিত বৌ রাঁধতে জানেন না বলে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারিণী আর ৩৯০টি মেয়ে রাঁধতে জানেন না—এ প্রমাণ হয় না। আমি বেথুন কলেজে পড়া ১৮৮টি ডিগ্রীধারিণীর মধ্যে ৮৬ জনকে জানি, ঘর কন্নার সকল রকম কাজই যাঁরা জানেন এবং পাঠ্যাবস্থায়ও সম্পন্ন করেছেন।

শিক্ষা আমাদের যে রকম হওয়া উচিত সে রকমটা হচ্ছে না—সে তো শুধু মেয়েদের বিষয়েই নয় ছেলেদের বিষয়েও সমান সত্য। তার জন্য যাঁরা শিক্ষা লাভ কর্‌তে চাচ্ছেন তাঁরা দোষী নন, যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের দোষ থাক্‌লেও সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই শৈশব অবস্থায় অনেক ভুলচুকের মধ্যে দিয়েই, অনেক উঠে পড়েই তাকে দাঁড়াতে হবে; কাজেই অকারণ গালি গালাজ ত্যাগ করে—দাঁড়াবার চেষ্টার দিকে মনোনিবেশ করলে শক্তি, সময় এবং বোধ হয় অর্থেরও অপব্যবহার হয় না। দেশের দেহও সতেজ নূতন চিন্তার রক্ত ধারায় সুস্থ নিরাময় হয়ে ওঠে।

'সোনার বাঙলা' শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

খদ্দরের উপায়।

খদ্দর বুঝি আর টিকে না। বাজারে খদ্দরের কাটতি একেবারেই কমে গেছে, বাংলায় যে সব তাঁত দিবারাত্র ঠক্ ঠক্ করে জাতির জেগে থাকার লক্ষণ প্রকাশ করছিল, এখন সব স্তব্ধ। আমাদের হাড়েও ঘুণ ধরছে, তাঁতগুলিও উয়ে কাটছে, কংগ্রেসের টাকা যাঁদের হাতে আছে তাঁরা কোন গতিকে, জোলা দিয়ে, খদ্দরের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে আসছেন, কিন্তু জাতিকে যদি স্বদেশী করে তোলা না যায়, চেষ্টা করে আর কতদিন জেদ বজায় রাখা যাবে ?

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র ছিল স্বদেশী। দেশকে স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করাই তখন একমাত্র প্রচার ছিল, কোথা থেকে যে প্রয়োজন মত বস্ত্র সরবরাহ হবে, সে দিকে স্বদেশীর পুরোহিতবৃন্দ দৃষ্টি দেন নি, সে সুযোগে, বোম্বায়ের ব্যবসায়ীগণ দু পয়সা করে নিলেন, তাও ম্যানচেষ্টারের সূতায়, কাপড়ের গাঁটে স্বদেশী মিলের মার্কা থাকলে যথেষ্ট হতো, দেশের লোক সেদিনও, দেশের নামে ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নি।

আজ স্বদেশী প্রচারের সঙ্গে, নেতৃবৃন্দ, বস্ত্র উৎপন্ন করার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন, আশার কথা। কিন্তু এখনও আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা চরকায় সূতো কেটে, স্বদেশী-ব্রত উদ্যাপন করতে পারব কিনা ?

শুনতে পাই এদেশে তুলা যথেষ্ট হয়, সূতা প্রস্তুত করাও অসম্ভব নয়, দেশে বস্ত্র ব্যবহারও ফুরাবে না, এই অবস্থায়, বঙ্গলক্ষ্মীর মত, আরও বড় বড় কল নির্ম্মাণ হলে, যদি চরকায় আমরা কৃতকার্য্য না হই, এতদ্দ্বারা স্বদেশীর প্রাণরক্ষা হতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্তে আসতে হলে, একবার প্রাণপণ করে দেখা উচিত চরকায় আমরা বস্ত্রসমস্যা দূর করতে পারব কিনা ?

আমাদের মনে হয়, চরকায় সূতা কেটে কাপড় বুনে এত বড় দেশের বস্ত্রাভাব দূর করতে হলে, এক অসাধারণ উপায় অবলম্বন করতে হবে, আর সে উপায়টা অর্থকরী তো

নয়, পরন্তু কৃচ্ছ্র তপস্যামূলক। কেন না, সূতার মজুরি যুগিয়ে যদি বস্ত্র বুনা হয়, তা হ'লে বস্ত্রের মূল্য কোনমতেই, আমরা বিলাতি কাপড়ের তুলনায় কম করতে পারবো না, আর দেশের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, শারীরিক শ্রম দিয়ে দেশের কাজে মরণকেও মেনে নিতে অনেকে রাজী হতে পারে, কিন্তু অর্থ দিয়ে দেশসেবা একপ্রকার অসম্ভব। ভগবানের দেওয়া শরীর যখন আছে, তখন দধীচির মত তা দিয়ে যদি শত্রুবধের বজ্র নির্ম্মাণ হয়, অনেক দধীচির সন্ধান পাওয়া যায়, এই লক্ষ্মীছাড়া জাতির এমনই অর্থহীন অবস্থা, অর্থ দিয়ে দেশপ্রীতি রক্ষা দূরের কথা—এক প্রকার অসাধ্য বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

আজকাল দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ সংকল্প নিয়ে অনেক তরুণকে দেখি, পরিধের বস্ত্রখানি কিন্তু তাদের খদ্দর নয়, তার কারণ উলঙ্গ থাকার দায় থেকে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে, যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে একখানা বস্ত্র খরিদ কালে, স্বদেশীর বিচার করতে পারে না, কাজেই বলতে হয়, খদ্দরের মূল্য যথেষ্ট চড়া হ'লে দেশের লোককে তা ব্যবহার করতে বাধ্য করা যায় না।

তবে উপায় কি? আমরা বলি, দেশের মা বোনেরা চরকা যদি ধরেন, সখের দায়ে নয়, একযোগে, তা হলে কি হয় বলা যায় না, দেশ যদি জাগে তা হলে একযোগেই জাগ্‌বে, দেশের প্রাণ বল্‌তে কেবল তুমি আমি নই, সে হচ্ছে একটা অখণ্ড সামগ্রী, সে প্রাণ কি জেগেছে! তা যদি জাগ্‌তো তা হলে এই স্বদেশব্রত পালনে আমাদের নারী-শক্তিকেও উদ্বুদ্ধ দেখতুম।

উর্ব্বরা সোণার বাংলায় গৃহস্থের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে অতি সহজে কার্পাস বৃক্ষ জন্মে, বৎসরে দুইবার তুলা উৎপন্ন হয়, প্রতি গৃহকর্ত্রী যদি হরিনামের মালা (?) ছেড়ে, দিবানিদ্রা শিকায় তুলে, পরকুৎসায় সময়ক্ষেপ না করে' এই কর্ম্মে উদ্যত হন আর সেই গৃহপ্রস্তুত সূতায় প্রতি বাড়ীতে একখানি করে তাঁত চলে, তা' হলে উঠানের এককোণে অনায়াসে যেমন লাউ কুমড়া বেগুন প্রভৃতি প্রাতিদিনের আনাজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই বিনা ব্যয়ে বস্ত্রাভাব দূর করতে পারে। কতখানি প্রাণ থাকলে ভাবতে যা সহজ,—কাজেও তা সহজ হবে, মায়েরা বোনেরা সে কথাটা ভেবে দেখবেন কি?

'নবসঙ্ঘ'

মোগল-সন্ধ্যা

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রাজমহল রাজপ্রাসাদ।

কাল—অপরাহ্ন।

ফরাকসিয়ার, হোসেন আলি খাঁ, আবদুল্লা খাঁ ও প্রেমদেব।

সিয়ার। সন্ন্যাসি! তোমার কি প্রয়োজন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ?

প্রেমদেব। হাঁ শাহজাদাপুত্র আমি প্রভাত হতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপনার সাক্ষাৎ পাবার জন্য রাজবাটীর দেউরীতে বসেছিলুম, প্রহরীরা আমায় প্রবেশ করতে দেয় নি।

হোসেন। তুমি দুঃখিত হয়ো না, সন্ন্যাসি।

প্রেমদেব। দুঃখিত কি আর হব সুবাদার। স্বদেশে প্রবাসী আমরা, আপনাদের উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত অখাদ্য অংশটা দিয়ে জীবন ধারণ করছি, সুখ দুঃখের বোধটা হারিয়ে ফেলেছি, অপমান লাঞ্ছনা সে ত আমাদের দৈনিক বরাদ্দ এতে দুঃখিত কেন হব?

সিয়ার। তোমার কি প্রয়োজন বল?

প্রেমদেব। আজ একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, হৃদয় শক্ত করুন, তা না হলে ভেঙ্গে পড়বেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে এ সুদীর্ঘ পথ আমি অশুভশংসী পেচকের মত একরকম উড়ে এসেছি কোথায়ও একটু বিশ্রাম করি নি।

সিয়ার। যুদ্ধক্ষেত্র? সুবাদার! পিতার সঙ্গে কি কারও যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা ছিল?

হোসেন। হাঁ, সিয়ার।

সিয়ার। এ খবর আমাকে আগে দেওয়া হয় নি কেন?

হোসেন। শাহজাদার আদেশ মতই এ খবর আপনাদের কাছ থেকে গোপন করা হয়েছে।

সিয়ার। পিতার আদেশ! যাক্ কি খবর তুমি নিয়ে এসেছ—সন্ন্যাসি?

প্রেমদেব। আমি যুদ্ধের খবরই এনেছি। আমি গিয়েছিলাম বাঙালী সৈন্যের বীরত্ব স্বচক্ষে দেখতে আর আহত সৈনিকদের সেবা করতে।

সিয়ার। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে, না পরাজয় ?

প্রেমদেব। পরাজয়।

হোসেন। পরাজয়! তবে শাহজাদা আজিম্ এখন কোথায় ?

সিয়ার। বল সন্ন্যাসি! পিতা এখন কোথায় ?

প্রেমদেব। আমি রাত্রিতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখতে পাই তিনি আহত হয়ে একাকী পড়ে আছেন—জ্ঞান ছিল কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না—আমার জলপাত্র হতে এক অঞ্জলি জল তাকে পান করালুম, তারপর—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আপনাদের সে কথাগুলি বলতে এসেছি।

সিয়ার। তোমার সে কথা পরে শুনব। বলো, পিতা জীবিত আছেন ত ?

প্রেমদেব। জানি না। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে এল, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন; আমার পাত্রের জলও ফুরিয়ে এল। জল আনতে একটু দূরে গিয়েছিলাম; ফিরে এসে দেখি তিনি সেখানে নেই। জলপূর্ণ পাত্র হাতে নিরাশ হৃদয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু পরেই আমার এক শিষ্যের সঙ্গে দেখা হল। সে আমায় বলল যে এক শাহজাদা আর এক সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের সে ঐ দিকেই যেতে দেখেছে।

সিয়ার। তবে তারা পিতাকে বন্দী করেই নিয়ে গেছে, হোসেন আলি খাঁ। সন্ন্যাসি, কে যুদ্ধে এসেছিল জান ?

প্রেমদেব। শাহজাদা জাহান।

সিয়ার। জাহান পিতাকে বন্দী করেছে? অকৃতজ্ঞ জাহান ভুলে গেছে পিতা তাকে কত স্নেহ করতেন। হোসেন আলি খাঁ! আপনারা এখনও চুপ করে রয়েছেন, আপনারা না পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী!

আবদুল্লা। তাইত, কি করা যাবে ভাবছি—পরাজয় হয়েছে—শাহজাদা আজিম বন্দী হয়েছেন। সময় বড়ই খারাপ পড়েছে,—সিয়ার! প্রতিকার একরকম কিছুই দেখছি না।

সিয়ার। (হোসেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া) আপনারও কি এই মত—?

হোসেন। না সিয়ার! শাহজাদাকে উদ্ধার করতেই হবে। আবদুল্লা! অনেক নিমক খেয়েছ এখন শোধ করবার সময় এসেছে—

আবদুল্লা। সে বুঝি হোসেন কিন্তু কি করে শোধ করবে,—উপায় ভেবেছ কি?

হোসেন। যুদ্ধে নামতে হবে। সৈন্য সংগ্রহ করে দিল্লী আক্রমণ করতে হবে—

আবদুল্লা। হোসেন! তুমি পাগল হয়েছে মুষ্টিমেয়, অশিক্ষিত কতকগুলি সৈন্য নিয়ে মোগলের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া একটা ঘোরতর পাগলামি।

হোসেন। একটুও পাগলামি নয়, আবদুল্লা! তুমি এখন যেটা অসম্ভব বলে ভাবছ তাকে সম্ভবে পরিণত করবই করব। চাই শুধু অপ্রতিহত মনের বল আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এ দুটোতে হোসেন কারো চাইতে কম নয়। সবই আমি করব তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সিয়ার! প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় আমি দিল্লীর সিংহাসনে নিশ্চয়ই বসাব।

সিয়ার। সুবাদার! পিতাকে উদ্ধার করতে হবে।

আবদুল্লা। প্রতিজ্ঞা করাটা বড়ই সোজা—হোসেন! শুধু কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেই হল কিন্তু পালতেই যত অসুবিধা ও বাধা এসে পড়ে। তবে——কিনা, সিয়ার! যদি আমার একটা সাধ তুমি পূর্ণ করতে সম্মত হও তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

সিয়ার। বলুন আপনার কি সাধ।

আবদুল্লা। জুলেখা আমার প্রাণের চেয়ে আদরের মেয়ে তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে।

সিয়ার। আমি রাজী আছি, সুবাদার!

হোসেন। বেশ কথা! এখন ত তোমার কোনও আপত্তির কারণ নেই—

আবদুল্লা। না হোসেন!

হোসেন। সন্ন্যাসি, রুস্তম কোথায়?

প্রেমদেব। জানিনো, বোধ হয় তাকেও বন্দী করে নিয়ে গেছে। মারবার রাজ অজিতসিংহ একজন অধীনস্থ সামন্তরাজকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়াছিলেন, তিনি অসীম

বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ের কোনই সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে দেশের দিকে প্রস্থান করেছেন।

হোসেন। ভালই হয়েছে, রাজপুতবীর কখনই এ পরাজয় সহ্য করবে না, তা হলে মারবারাধিপতি অজিতসিংহের সাহায্যও আমরা পাব। সন্ন্যাসি, তুমি এখন যাও বিশ্রাম করগে। আর কিছু কি বলবার আছে?

প্রেমদেব। হাঁ সুবাদার। রাত্রির সেই গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে তিনি বলতে লাগলেন "হোসেন আর আবতুল্লাকে বলো তাদের হাতে বিশ্বাস করে আমি সিয়ারকে সঁপে দিয়েছি। সিয়ার যেন সকল কাজেই হোসেনের পরামর্শ মত চলে।"

সিয়ার। সন্ন্যাসি, সিয়ার পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তুমি এখন যাও,—বিশ্রাম কর।

(প্রেমদেবের প্রস্থান।)

আবতুল্লা। হোসেন কাজটা ভাল হোল না। সন্ন্যাসি সকল কথা প্রকাশ করে দিতে পারে, তবে সব শ্রম ব্যর্থ হবে।

হোসেন। কোন হ্যায় রে—

প্রহরী। হুজুর— (সেলাম করিয়া অবস্থান)

হোসেন। ঐ সন্ন্যাসিকে এখনই বন্দী করে নিয়ে এস।

প্রহরী। যো হুকুম (সেলাম করিয়া প্রস্থান।)

আবতুল্লা। ঐ কাফেরদের কোনদিনও বিশ্বাস করবে না। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যতটা খাতির রাখা দরকার কেবল ততটা করবে।

(প্রহরী ও প্রেমদেবের প্রবেশ)

হোসেন। সন্ন্যাসি, তোমায় বিশ্বাস করতে পারলুম না। আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে সে আশঙ্কায় তোমাকে বন্দী করছি। যতদিন সৈন্য নিয়ে আমরা দিল্লীর দিকে না যাত্রা করি ততদিন তোমায় কারাগারে থাকতে হবে।

প্রহরী। সেলাম, সুবাদার সাহেব। বান্দা দেখেছে এ দুষমণ বাইরে গিয়েই একটা লোকের সঙ্গে চুপি চুপি কি আলাপ করছিল।

প্রেমদেব। চুপ্ কর, মিথ্যাবাদী।

সুবাদার সাহেব, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—আমায় বন্দী করবার হুকুম দিয়েছেন ঠিকই করেছেন। আপনারা এসেছেন বিদেশে থেকে, দেশজয় করেছেন, রাজ্যশাসন করবেন। শুধু পাওনার দাবীটাই ভাল করে বুঝবেন, দেবার কর্ত্তব্য কোথায়? আপনারা রাজা আর আমরা প্রজা এ সম্বন্ধের মাঝে সহানুভূতি দয়া মায়া একটুও নেই, যা আছে সে শুধু অবিশ্বাস ঘৃণা আর কঠোরতা। কিন্তু একটু বিশ্বাস করলে ভাল করতেন। আপনাদেরই বা দোষ দেব কি? এই দেখুন আমারই স্বদেশবাসী, আপনাদের কাছ থেকে একটু কৃপার ভিখারী; তাই আজ অম্লান বদনে একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলল। (প্রহরীর হাত ধরিয়া) কেন মিথ্যাকথাটা বলে আজ তোকে এমন করে নাবিয়ে দিলি—আমরা যে একই মায়ের ছেলে, তোর সঙ্গে আমার প্রাণের টান রয়েছে আর আমরা দুজনে হাত ধরে দাঁড়াই।

(হোসেনের প্রতি)

বিশ্বাস করতে শিখুন, সুবাদার! তা না হলে দেশে যে বাতাস এসেছে, সে বাতাসে ঐ সাম্রাজ্য ধূলিমুষ্টির মত উড়ে যাবে।

পট পরিবর্ত্তন।

স্থান—চিনকালিচ খাঁর বাসভবন।

সময়—রাত্রি—প্রথম প্রহর।

(গান)

করুণা। আকুল অন্তরে ওগো একি মম হোল?
দূরে যে রয়েছে প্রিয়, কেন জোছনা আলো?
একা, একা, একা রজনী পোহালো
কই প্রিয়তম মিছে এই মালিকা
শুকাল কলিকা ব্যাকুল বালিকা
জলভরা আঁখি কালো॥

আজ দাদামশায়ের কাছে শুনেছি জাহান যুদ্ধ হতে ফিরেছে, নিশ্চয়ই সে বড় ক্লান্ত তাই আসে নি—যদি সে একবার আসত তবে সিয়ারের খবরটা বোধ হয় পাওয়া যেত—সিয়ারকে ত যুদ্ধের ভেতর কেউ দেখে নি—সে তবে কোথায় গেল? যেখানেই সে থাক, তাকে ভাল রেখো—খোদা।

(জাহানের প্রবেশ)

জাহান। কার জন্য প্রার্থনা করছিলে, লয়লা? আমার জন্য বোধ হয়?

লয়লা। (একটু লজ্জিত হয়ে)—তোমার জন্য কেন করব, জাহান? তুমি ত যুদ্ধ জয়ী হয়ে এসেছ যারা হেরেছে তাদের জনাই প্রার্থনা করছি।

জাহান। তবে আমার জনাও একটু করো লয়লা।

লয়লা। কেন, তোমার সুখের ভরা আরও সুখে ভর্ত্তি করতে!

যারা সংসারে কষ্ট পায় তাঁদের জনাই আমার প্রাণ কাঁদে। তোমার ত কোন দুঃখ নেই জাহান—তুমি জয়লাভ করে এসেছ—

জাহান। না লয়লা—এ যুদ্ধে সব চাইতে বড় পরাজয় আমার হয়েছে—এ সংসারের জুয়াখেলার ঘরে আমার সব চাইতে বড় জিনিষটা ধরে ছিলুম—আমি সব হারিয়েছি।

লয়লা। সে কি—তুমি কি হারিয়েছো, জাহান? তোমার কথা হেঁয়ালীর মতো লাগছে যে?

জাহান। শুনবে, শুনবে—আমার কি হারিয়েছে। আমি এই প্রকাণ্ড মোগল-সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার লোভে প্রলুব্ধ হয়েছিলুম। জাহান্দার আমায় বলেছিল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পর আমার অভিষেক হবে, তাই স্বেচ্ছায় উৎসাহী হয়ে আমি যুদ্ধে গিয়েছিলুম। সেখানে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা সব বলি দিয়ে এসেছি—ভ্রাতৃরক্তে হাত কলঙ্কিত করেছি—উঃ—কি দুরপনেয় কলঙ্ক সমস্ত সাগরের জলেও প্রক্ষালিত হবার নয়।

লয়লা। এ লোভে তুমি কেন পড়লে জাহান! সত্যি, এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হয়েই এসেছ।

জাহান। এ লোভে আমি কেন পড়লুম? তোমার জন্য লয়লা—শুধু তোমার জন্য—

লয়লা। আমার জন্য?

জাহান। হাঁ, তোমাকে এই মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী করবার জন্য—আমার প্রেমের উপহার ঐ কোহিনুরমণি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবার জন্য।

লয়লা। তুমি ভুল করেছ, জাহান—মস্ত ভুল করেছ।

জাহান। হাঁ আমি ভুল করেছি—লয়লা! আমি কেন ও কথায় বিশ্বাস করলুম—আমি প্রতারিত হয়েছি—জগতের অর্দ্ধেক লোকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি—কি ভয়ানক প্রতারণা!

লয়লা। সে ভুলের কথা আমি বলছি না—তুমি আরও ভুল করেছ—তুমি প্রেমও বোঝ নি আমাকেও বোঝ নি।

জাহান। কেন?

লয়লা। জাহান—জেনো—যথার্থ প্রেম রিক্ততাকেও বরণ করে সুখী হ'তে পারে—সংসারের—সুখে যেটুকু 'কম্‌তি' পড়ে, হৃদয়ের পূর্ণতা দিয়ে সে তাকে 'ভর্‌তি' করে দেয়।

জাহান। তবে পুরুষের শৌর্য্য নারীর ঐ কমনীয় দেহটাকে সাজাবার জন্য সংসারের আহবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কেন লয়লা?

লয়লা। সে পুরুষের অহঙ্কার,—পুরুষের ধর্ম্ম।

জাহান। তবে তুমি আমার হৃদয়ের পূজাটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারবে লয়লা?—

লয়লা। তাই বলেছিলাম তুমি আমাকেও বোঝ নি, জাহান। তোমার ভালর জন্যই তোমাকে এ কথাটা আজ আমার বলতে হবে। আর যেন ভুল করে—মনুষ্যত্বকে খাটো না কর। আমার জন্য তোমার জীবনের আদর্শটা হ'তে চ্যুত হয়ো না।

আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি—প্রেমের বিনিময়ে যে ত্যাগটা করতে পারা যায় জাহান সে ত্যাগ তোমায় আমি শ্রদ্ধার বিনিময়ে করতে দেবো না।

জাহান। লয়লা, কি বল্লে, তবে একি শুধু শ্রদ্ধা।

লয়লা। হাঁ জাহান—তুমি কষ্ট পাবে তবুও তোমায় বলতে হচ্ছে—তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি—কিন্তু—

জাহান। আর না—থামো—চোখ পুড়ে যাবে স্পষ্ট করে জানবার অত আলো আমার এ চোখে সহ্য হবে না—

ভক্তি! শ্রদ্ধা! আমি চাই না—কি ঘৃণা এর আছে—সেদিনকার যুদ্ধে আমি গলা চেপে এদের নাশ করে এসেছি যদি পার প্রেম দাও।

(তরবারির উপর হস্তার্পণ)

এ দুঃখের জগতকে সৃষ্টি করে, খোদা! তোমার এ খেলা খেলবার—কি প্রয়োজন ছিল।

(একটু নিম্ন স্বরে)

লয়লা! এ কথা তুমি আমায় কেন জানালে—আমি মিথ্যা নিয়ে ছিলাম মিথ্যা নিয়েই থাকতুম—আমি ভুল করেছি সমস্ত জীবনটা আমার—ভুল করেই কেটে যেত কি ক্ষতি তোমার ছিল—একটা শান্তি তাও কারো সহ্য হল না।

লয়লা। ক্ষমা করো জাহান আমি তোমার ক্ষমা চাচ্ছি।

জাহান। ক্ষমা! আজ জগতে সকলকেই ক্ষমা করতে পারব, লয়লা—কিন্তু একজনকে নয়—এ দুনিয়াটাকে সৃষ্ট করেছে সে সেই নিষ্ঠুরকে।—

দুষমন,—যদি প্রাণ দিয়েছিলে তবে ব্যর্থতা সৃষ্টি করলে কেন—ভবিষ্যৎকে যদি এত ভীষণ করে রেখেছ তবে প্রাণে আশা দিয়েছ কেন—তোমার খেলবার সাধটা মেটাবার জন্য নয়? ভাঙ্গা হৃদয়ের পাহাড় গড়ছ, চোখের জলে সাগর তৈরী করছ—আর—বেদনার আর্তধ্বনির সঙ্গে তোমার কৌতুকের অট্টহাসি মিশিয়ে বীণার ঝঙ্কারের সৃষ্ট করছ।

তোমার এ খেলার আমোদটুকু আজ আমি আর হতে দিচ্ছি না লয়লা! এ কি তুমি কাঁদছ এ কিসের জন্য—দয়া!

আমার কোনই দুঃখ নেই হৃদয় পাথর করেছি—

(জুলফিকার খাঁ ও হামিদ খাঁ কতিপয় সৈন্য নিয়ে প্রবেশ)

(জুলফিকার খাঁ)—এই যে, হামিদ বন্দী করো—

জাহান। কে জুলফিকার খাঁ? আমায় বন্দী করতে এসেছ বাদশার হুকুম তামিল করতে এসেছ।

(তরবারি কোষমুক্ত করণ)

না,　　(তরবারি দূরে নিক্ষেপণ)

এসো, এই নাও—(হস্ত প্রসারিত করে দণ্ডয়া)

৭

জুলফিকার খাঁ, এ জগতের সঙ্গে হিসাব নিকাশ সব শেষ করে ফেলেছি—তোমাকেও ক্ষমা করেছি কিন্তু একজনকে পারি নি—

(লয়লার প্রস্থান)

(চিনকালিচ খাঁর প্রবেশ)

চিনকালিচ। এ কি! জুলফিকার তুমি এখানে।

জুলফিকার। বাদশার আদেশে বিদ্রোহ করবার আশঙ্কায় জাহানকে বন্দী করতে এসেছি খাঁ সাহেব।

চিনকালিচ। বাদশার আদেশে জাহানকে বন্দী করা—কিন্তু আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এ আদেশ পালন করবার হুকুমও কি বাদশাই দিয়েচেন ?

হামিদ খাঁ। বাদশার আদেশ সব স্থানেই পালন করা যায়।

চিনকালিচ। চোপরাও হামিদ কি জুলফিকার চুপ করে রইলে যে ? অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার অধিকার বাদশার নিজেরও নেই। সম্রাট জাহান্দারকে বলো এ অপমান চিনকালিচ খাঁ কখনও সহ্য করবে না—আর তোমায় বলছি জুলফিকার খাঁ তোমারও সময় হয়ে এসেচে—যাও শীঘ্র বেড়িয়ে যাও।

প্রস্থান। (পটনিক্ষেপ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—যোধপুর, কাল অপরাহ্ন।

অজিতসিংহ ও রাজসিংহ।

অজিতসিংহ। বাংলা হতে হতভাগা আজিমের পুত্র এই যে পত্র পাঠিয়েছে—

(রাজসিংহের হস্তে পত্রার্পণ)

তার নামটা যেন কি ভুলে যাচ্ছি।

রাজসিংহ। ফরাকসিয়ার।

অজিতসিংহ। হাঁ, ফরাকসিয়ার। আচ্ছা, রাজসিংহ তাকে তুমি দেখেছ ?

রাজসিংহ। না. মহারাজ—সে ত যুদ্ধক্ষেত্রে আসে নি, শাহজাদা আজিম তাকে বাংলায় রেখে এসেছিলেন।

অজিতসিংহ। কতটা বয়স তার হবে এখন জান ?

রাজসিংহ। না।

(অজিতসিংহের হস্তে প্রত্যর্পণ)

অজিতসিংহ। রাজসিংহ—আমিই এবার যুদ্ধে যাব, তোমায় এখানে থেকে রাজ্যরক্ষা করতে হবে। একবার পরাজিত হয়েছি সত্য কিন্তু আমি নিরাশ হই নি—দেখব এবার ভারতের অদৃষ্ট গতি একটা নূতন দিকে চালিয়ে দিতে পারি কি না ?

হোসেন আলি খাঁ আর আবদুল্লা খাঁ কে বলতে পার।

রাজসিংহ। শুনিছি এরা সৈয়দবংশীয় মুসলমান শাহজাদা আজিমের অধীনস্থ বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার।

অজিতসিংহ। বেশ। রাণা অমরসিংহ আবার মিলিত হবার জন্য আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছেন—বড়ই কঠিন সমস্যা এসে পড়েছে। কর্ত্তব্য অবধারণ বড়ই শক্ত। আমি রাণাকে লিখে দিয়েছি শাহজাদা আজিমের পুত্র ফরাকসিয়ারকে সাহায্য করবার জন্য আমি সসৈন্যে আগ্রার দিকে চলেছি। সে যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমি সেখান হতে ফিরে এসে তারপর পারমর্শের জন্য মিলিত হব।

রাজসিংহ। মহারাজ ! আমার একটা নিবেদন আছে।

অজিতসিংহ। কি, বল।

রাজসিংহ। আপনার অনুপস্থিতিতে দেওয়ান রঘুনাথ আর যুবরাজ অভয়সিংহ রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাব এই আমার প্রার্থনা।

অজিতসিংহ। পরাজয়ে তুমি মর্ম্মাহত হয়েছ রাজসিংহ। এ যুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমার প্রণষ্ট গৌরবটা পুনরুদ্ধার করবার সুযোগ আমি তোমায় দেব, তা না হলে তোমার প্রতি অবিচার করা হবে। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হল।

(দুর্গাবতীর প্রবেশ)

(রাজসিংহ প্রস্থানোদ্যত)

দুর্গাবতী। যেয়ো না, রাজসিংহ ! দাঁড়াও মেবার হতে আসবার পথে এ কি শুনলুম, মহারাজ ! রাজসিংহ ! এ কি সত্যি ?

অজিতসিংহ। হাঁ রাণী, আমাদের পরাজয় হয়েছে।

দুর্গাবতী। তুমি মাথা নীচু করে রইলে কেন রাজসিংহ? এ পরাজয়ের জন্য দায়ী তুমি নও।

মহারাজ! আজ এ কোন্ গৌরবের মুকুট তুমি আমার জন্য আহরণ করেছ? মোগলের দাসত্ব আবার তার উপর এই পরাজয়! উঃ এ কি অলঙ্কার তুমি আমায় পরিয়েছ। এর বিষের জ্বালায় আমার সমস্ত শরীর যে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমি বলেছিলাম মহারাজ এ যুদ্ধে যাবার কোনই দরকার নেই, মোগলের জয়ে রাজপুতনার কি স্বার্থ? এ অপমান তুমি স্বেচ্ছায় বরণ করেছো!

আমি মেবারের রাজকন্যা—আমি যে বংশে জন্মেছি সেই শিশোদীয় বংশ কোনও দিন মোগলের দাসত্ব করতে যায় নি, পেরেছে ত সমস্ত জীবন যুদ্ধ করে প্রাণপাত করেছে। তোমার এ পরাজয়ে আমার কোনও সহানুভূতি নেই—।

অজিতসিংহ। দুর্গাবতি! আজ তুমি আমায় যত কঠোর কথাই বলো, আমাকে নীরবে সহ্য করতেই হবে—কেন না আমার পরাজয় হয়েছে। কিন্তু এ পরাজয়ে আমি হতাশ হই নি। যে কাজটাকে আমি কর্ত্তব্য বলে বুঝেছি সে আমি কখনই ছাড়ব না। তোমার শ্লেষ, তোমার পরিহাস আমার প্রাণে বিষম বেদনার সঞ্চার কর বটে কিন্তু যে ব্রত আমি হাতে নিয়েছি তা হতে আমায় নড়াতে পারবে না—এ তুমি ঠিক জেনো রাণি!

সংসার আমার শ্মশান হয়েছে—যে উৎস হতে কর্ম্মী পুরুষ মাঝে মাঝে কর্ত্তব্য পালনের শক্তি সংগ্রহ করে থাকে সে উৎস আমার একেবারে শুষ্ক হয়ে গেছে—যাক্ সব চুকে যাক্ শুধু আমি, আর আমার ব্রত।

রাজসিংহ। রাণি মা! আমি আবার যুদ্ধে যাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ করুন এ যুদ্ধে যেন আমার জীবন দান করতে পারি—তবেই আমার এ কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

দুর্গাবতী। রাজসিংহ পরাজয়ের কথা বলেছি দুঃখিত হয়ো না। আশীর্ব্বাদ করি এ যুদ্ধে তুমি জয়ী হবে।

রাজসিংহ। আপনার আশীর্ব্বাদে এবার আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।

(প্রস্থান)

অজিতসিংহ।—(একটু হাসিয়া) রাণি, মেঘ হতে বাজ এসে উঁচু গাছের চূড়াটাকেই মুষড়ে দিয়ে যায়, তাই তোমার যত বিরোধ সব আমার সঙ্গে, নয় ?

(প্রস্থান)

দুর্গাবতী। ভগবান, তুমি আমায় কি করলে !

আমার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কেন জাগিয়ে দিলে ?

নারী করে সংসারে পাঠিয়েছ যদি তবে নারীর মনটা কেড়ে নিলে কেন,—স্বামীর ইচ্ছার অনুগমনই যে স্ত্রীর ধর্ম্ম এ শিক্ষা যে আমি ছোট বয়সে মার কাছে থেকে পেয়েছিলুম।

মহারাজা তুমিই না আমায় শিখিয়েছ যে নারীর একটা ভিন্ন অস্তিত্ব আছে—আমাকে তুমি সমান অধিকার দিয়েছ—আজ সে অধিকারের বলেই নিজের মনটা একটু একটু করে খুলে দিচ্ছি—দুজনের মাঝখানে এত বড় ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে যে তুমি তোমার সাধের সংসারকে আজ শ্মশান বলেছ।

না, আর এগোব না। যে শিক্ষায় সংসারে অশান্তি এনে দেয় সে শিক্ষা নারীর নয়।

ভগবান্! এ বিরোধ ঘুচিয়ে দাও আমি আর কিছু চাই না—সেই চোখে চোখে হাসিতে—, হৃদয়ের সুখের মিলনে, প্রেমের মধুরতায় জীবনটাকে সহজ সুখের করে দাও।

স্বামী আমার !

পটনিক্ষেপ।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মরণ আড়াল

-০:০-

দশম পরিচ্ছেদ।

অঁতুলের অকাল মৃত্যু অলকার প্রাণে কি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলাম। সহানুভূতি জাগ্রত হইবার কারণ ছিল, ডাক্তারের প্রতিদিনের ব্যবহারে বুঝিতে হইতেছিল—অলকার ভবিষ্যত ক্রমেই গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার ভারি ব্যস্ত,—প্রায়ই গোপনে পরামর্শ চলিতেছে,—কি বিষয়ে আমার তাহা জানিবার উপায় নাই,—অপর পক্ষ কে তাহা অবগত নই,—তবুও কেন যেন মনে হয় অলকার অদৃষ্ট তাহাতে জড়িত। অসহায়া অলকা, সরলা বালিকা,—বাগুড়াবদ্ধ হরিণী—সে জানে না,—শোক হইতেও আরও কি ভীষণ মনঃকষ্ট তাহার অদৃষ্টে লিখত আছে। অদৃষ্টের কঠিন কুলীশ ঘাতে জর্জ্জরিত আমি,—ভাগ্যচক্র কাহাকেও নিষ্পেষিত করিতে উদ্যত দেখিলে আমাকে আকুল করে। অনেক সময় মনে হয়—আমি যাহা জানি তাহা অলকাকে খুলিয়া বলি—সাবধান করিয়া দেই—কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল,—তাহাতে তাঁহার উপকার হইতে অপকারেরই সম্ভাবনা বেশী। ইচ্ছা হয় না আর এখানে থাকি—কিন্তু আমারও অবস্থা অলকারই মত,—ডাক্তারের পাশচ্ছেদ করিবার শক্তি আমার নাই।—সহ্য করিতেই হইবে! সহ্য করিতে হইবে বলিয়াই কি পশুর মত নীরবে সহ্য করিব—বিনা বিচারে ডাক্তারের অঙ্গুলীহেলনে উঠিব বসিব,—আত্মরক্ষার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিব? এতই অসহায় হেয় হইয়াছি আমি! না, তাহা কখন হইতে দেব না,—প্রাণপণ—ডাক্তারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতেই হইবে। অলকা একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সহায়তা ভিক্ষা করিছিলেন আমি তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিব না। প্রকাশ করিয়া সমস্ত কথা বলিতে না পারিলেও--অলকাকে আমি আভাষে শক্ত হইতে বলি,--বৃথা বুঝাইতে চাই শোক করিবার এ সময় নহে তাঁর। সে সুযোগও এখন আমার কম! পুরাদস্তুর এখন আমাকে কাজ করিতে হইতেছে,—ডাক্তারের বিরাট কারবারের প্রধান কর্ম্মচারী আমি,—নিখিল বাবু

নাম মাত্র আমার উপরে। কাজ কম নয়,—প্রায় সমস্ত দিন খাটিয়াও পাড়ি জমান দায়,—অলকার নিকট বসিবার অবসর আমার কম,—কখন সন্ধ্যার পর একটু অবসর, সে সময়ই প্রায়ই নিখিল বাবুও উপস্থিত থাকেন,—বাজে গল্পগুজবে,—নিখিল বাবুর তরল হাস্যরসে সময়টা কাটিয়া যায়,—অলকার সহিত কোন গূঢ় বিষয় আলোচনা করিবার বা তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার সুবিধা কমই ঘটে।

ডাক্তারের সহিত এখন প্রায় কোন বিষয়ে আলোচনা হয় না বলিলেই হয়। সময় সময় তিনি আফিসে উপস্থিত হন—আমার কাজ কর্ম্ম দেখেন,—উপদেশ দেন—আমার কার্যপ্রণালীর অযাচিত উচ্চ প্রশংসা করেন—বস্তুতঃ আমি কর্ত্তব্যপালনে সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টা করি কিন্তু তাহা বা ডাক্তারের প্রশংসা আমাকে শান্তি দিতে পারে না,—মনে হয় এ ভূতের বোঝা টানিয়া ফল কি! হয় ত এক দিন এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ঐশ্বর্য্যবান হইব—সে ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণে শান্তি কোথায়,—অজ্ঞাতনামা কুলাঙ্গার আমি, স্বজনস্নেহবঞ্চিত হতভাগ্য—অদৃষ্টের দাস—অর্থে আমার প্রয়োজন! যে অর্থে ইচ্ছামুযায়ী একটি অসহায় প্রাণীর উপকার করিবার সাধ্য নাই,—সে অর্থের উপকারিতা কি?—কিসের মোহ?—যে অবস্থা, সংসারে আমার প্রিয়তম যে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে,—সে অবস্থা কিসে প্রার্থনীয়,—শ্লাঘ্য কিসে! চায় না মন অর্থ—চায় না মন পালিত পশু অধিকার,—পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী পালকের অপরিমেয় আদর,—মূলচ্ছেদ করিয়া শিরে বারিসিঞ্চনে মঙ্গলের বাহ্যিক-অভিনয়—দেখিতে বেশ—প্রাণরক্ষা হয় কি?

প্রাণ কাঁদে অতীত ফিরিয়া যাইতে, বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া ফেলিয়া আত্মভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে, নিজেকে ফিরিয়া পাইতে; মনে হয় এই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া পলায়ন করি! দুর্দ্দম্য মনের বিদ্রোহভাব দমন করিতেই কার্য্যে নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করিতে প্রয়াস পাই—বৃথা চেষ্টা,—কে বলে, বাহিরের কাজ অন্তরকে জয় করতে পারে—কর্ম্মের মাদকতা আত্মবিস্মৃতি ঘটায় ক্ষণিকের জন্য,—ক্ষতস্থানে স্নিগ্ধ লাগিয়াই থাকে!

দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্ত পথিক ঐ নিজালয়ে ফিরিতেছে—দারিদ্র্যের শতচিহ্ন তাহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—আশঙ্কার সীমা নাই—দরিদ্র নিরন্ন গৃহী বুঝি,—তোমরা তাহার অবস্থাকে দুঃখের বলিবে,—না—বড়ই মধুর ঐটী, প্রাণের টানের অমন প্রকাশ আর কোথাও

নাই! ধনী বুঝে না প্রাণের মর্ম্ম—সে চায় অর্থ,—মনুষ্যের সুখ দুঃখ প্রাণের হিসাব তাহার প্রকাণ্ড লেজারে নাই। কার্য্যান্তে যখন শ্রান্তক্লান্তঅবসন্ন হইয়া বাসায় ফিরি, মনটা আমার হাহাকার করিয়া উঠে—কবে আবার দেখা হইবে—হইবে কি না জীবনে কে জানে—চন্দ্রমাহীন রজনী—ঘোর অন্ধকার!

অফিস হইতে ফিরিয়াই সে দিন শুনিলাম ডাক্তারের আহ্বান—বলিতে কি এখন তাঁহার আহ্বানে আমার প্রাণে আসে আতঙ্ক—তাঁহার আত্মীয়তায় জাগে আশঙ্কা!

ডাক্তার বিশ্রাম-কক্ষে একাকী,—সাধ্য নাই কাহারও তাঁহার বিনা আহ্বানে নিকটে আসে—এ বিশ্রাম গৃহ নয়—আমার পক্ষে দ্বিতীয় কারাগার!

ডাক্তার পার্শ্বের চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "বসো নবকুমার,—খুব খাটছ দেখছি,—বেশ বেশ,—আমি লোক খুব চিনি—উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত লোক তুমি,—তোমাকে দিয়াই আমার সব রক্ষা হবে—আমারই বা কি এসব—তোমাদেরই—তোমাকে আমি নিজের ছেলে বলেই জানি—এখন তোমাদের কাজ তোমরা কর—আমি দেখে সুখী!"

ভূমিকায় বুঝিতে বাকি থাকিল না—আরও বা কোন গুরুতর ষড়যন্ত্রে আমাকে অচিরে লিপ্ত হইতে হইবে। বলিলাম—"আপনার অনুগ্রহ!"

"অনুগ্রহ কেন বল—আমার কর্ত্তব্য। নিখিল আমার একমাত্র পুত্র—কিন্তু সে কাজ-কর্ম্মের কেউ নয়—সবে মাত্র তুমি—আমি তোমাকেই অবলম্বন করেছি—পুত্রের অধিক বিশ্বাস আমার তোমাতে—জানি আমি, তুমি তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত! এমন অনেক কথা বলেছি তোমাকে—নিতান্ত আত্মীয় মনে না করলে যা অন্যের কাছে বলা চলে না। তুমি পুত্রের মতই আমার সাহায্য করেছ—তোমার পরামর্শেই আমি এত সহজে অতুলের মৃত্যুর কিনারা করতে পেরেছি,—বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—"

শুনিতে আমার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল—আমি আত্মভাব গোপন করিয়া বলিলাম—"কেন আমায় লজ্জিত করছেন—কি করতে হবে বলুন, আমার সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও আপনার আদেশ পালনে ত্রুটি হবে না।"

"জানি,—কাজটা এমন কিছু নয় কিন্তু অতি গোপনীয়,—খুব সাবধানে করতে হবে—যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে, বুঝলে? একজনের জীবন মরণ নিয়ে সম্বন্ধ—দায়িত্বটা কম

নয়! রাজচন্দ্রকে তুমি নিশ্চয় জান,—তুমি জান আমি জানি,—অনেক কথাই তোমার আমি জানি—হঠাৎ এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ো না, রাজচন্দ্র আমার আত্মীয়,—আমি তার বাড়ীতে গিয়াছিও কয়েক বার,—তুমি তার প্রতিবেশী ছিলে,—তোমায় আর আমি জানব না। দেখ, বিধাতার কি খেলা,—কোন সূত্রে তোমাতে আমাতে এমন ভাবে ঘনিষ্ঠতা—বাপ আর ছেলের মত ঘটে গেছে,—তোমার পূর্ব্বের কথা জানাতে আমার পক্ষে ভালই হয়েছে, তোমাকে আরও আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পেরেছি। মনে একটুও দ্বিধা রেখ না—আমি তোমায় ছেলে না ভেবে পারি না,—আমার কাছে নিখিলের চাইতে কম স্নেহের বস্তু নও তুমি,—ছেলের কথা বাপে জানলে ভাল বৈ তাতে মন্দ হবার কিছুই নেই।"

"রাজচন্দ্র বড় বিপন্ন, একটা লোকের, একটা মতলবী পাগলের মাথায় ঢুকেছে রাজচন্দ্রকে খুন করতেই হবে—একদিন রাজচন্দ্রকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে নাই,—ভাগ্যে ভাগ্যে রাজচন্দ্র বেঁচে গেছে সে দিন। এ লোকটাকে কৌশলে সরাতে না পারলে রাজচন্দ্রের প্রাণ সংশয়! লোকটাকেও জান তুমি—তোমাদের গ্রামের সিংপাড়ার আব্বাস সর্দ্দার। ডাল-কুত্তাও আব্বাসের মত ভয়ঙ্কর হয় না—রাজচন্দ্রকে পেলে ছিঁড়ে ফেলে দেবে,—অথচ এই লোকটাই ছিল রাজচন্দ্রের অতি বাধ্য! হঠাৎ ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়,—তখন রাজচন্দ্র ওকে ঢাকা পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করে—ওর জন্য, ওর পরিবারের জন্য রাজচন্দ্রই যত ব্যয়বিধান করেছে, এখনও বোধ হয় করে কিন্তু লোকটার বিশ্বাস হয়ে গেছে উল্টা! আজকাল সব ডাক্তারও হয়েছে যেমন—একটা নতুন সাহেব ডাক্তার পাগলা গারদের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছে,—পাগলের প্রকৃতি সে বুঝে কি—বাহিরের কথাবার্ত্তা শুনে আব্বাস ভাল হয়ে গেছে ভেবে ওকে ছেড়ে দিয়েছে। দেখ না একের বুদ্ধির দোষে অন্যের কি ভয়ানক বিপদ!"

জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় আছে সে এখন? আমার সে চেনা লোক, পাছে, আমায় চিনে ফেলে—"

ডাক্তার বলিলেন "সে কথা কি আমি ভাবি নি; চিনতে পারবে না। কত দিন পূর্ব্বে সে তোমায় দেখেছে,—তখন ছিলে তুমি ছেলেমানুষ—পরিবর্ত্তন ত কম হয় নি, এ বেশে চিনতে পারবে না। আর তুমি নিজে তার কাছে যেতে যাচ্ছ কেন,—কৌশলে তাকে তোমার ফাঁদে ফেলতে হবে। সেইটার জন্যই তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলের দরকার—নৈলে

যাকে তাকে দিয়ে এটা হতে পারতো! রাজচন্দ্র বা আমার সংস্রব এতে আছে—এটা ওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না, বুঝলে? জানলেই আরও বিপদ!"

বুঝিতে আমার বাকি নাই। জেল আমাকে অনেক বুঝাইয়াছে—ডাক্তারের সংস্রব জেল হইতে আমায় কম বুঝায় নাই, বুঝিতে হইবে আরও অনেক। আমি প্রস্তুত! দেখি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! বলিলাম—'না, সে জানাব কেন,—দেখা যাক।'

ডাক্তার আমার আরও নিকটে আসিয়া বলিলেন—"লোকটা খুনে, অতি ভয়ানক, খুব সাবধান,—কোন রকমে যেন ও সন্দেহ করতে না পারে; টাকায় সংসার বশ টাকার মায়া করো না—একের জায়গায় দু'দিয়া ওকে বশ করে ফেলবে!

বলিলাম "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

"বেশ বেশ—তা হলে তুমি আজই মিস্লটে রওনা হচ্ছ। খবর পেয়েছি লোকটা এখনও ওর বাড়ীতেই আছে—সিংপাড়ায়। খুব সাবধানে সেখানে চলাফেরা করবে—সে তোমার দেশ—বিপদের আশঙ্কা কম নয় তা জান, তোমায় বলতে হবে কি!"

"যে কাজ করতেই হবে—বিপদ বলে পেছপা হয়ে ফল কি তাতে,—আজ্ঞা করছেন আজিই রওনা হব। রাজচন্দ্র বাবুও কি বাড়ীতে?"

"আজ্ঞে না,—অত কাঁচা কি আমি—তাকে সরিয়েছি,—জেনে রাখ রাজচন্দ্র হতে তোমার বিপদ নাই,—সে সব আমি ঠিক করেছি—কখনও তোমাতে তাতে দেখাশুনা হয় যদি সে তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতে বাধ্য হবে—সে জানে তুমি আমার লোক সাধ্য নাই তার তোমার শত্রুতা করে। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে তুমি আজ তাকে বিপদমুক্ত করতে যাচ্ছ,—মানুষ হয়ে সে এত বড় মোটা কথাটা বুঝবে না!"

অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না—যাক্ সে কথা! ও সকল কূট তর্ক মনে তুলিবার অবসর আমার নাই, প্রাণ তখন আমার উতলা বুকের রক্ত টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে! আবার চলিয়াছি সেই দেশে—আমার দেশে—এই ভাবে! আতঙ্ক না আনন্দ-শিহরণ, গমনের অনিচ্ছা না বিদ্যুদ্বেগে ছুটিবার আকাঙ্ক্ষা আত্মহারা করিবার উপক্রম করিয়াছে আমাকে! সংযত হইতে চেষ্টা করিয়া ডাক্তারকে বলিলাম—"তবে আজই,—গাড়ীর ত বেশী দেরী নাই,

সাড়ে আটটায় —আর কি কিছু বল্‌তে আছে ? লোকটাকে সরিয়ে দেবার কোন উপায় ঠিক করেছেন কি ? টাকার কথা বল্‌ছিলেন—টাকা দিলে সে বিদায় হবে কি ?”"

ডাক্তার বলিলেন "পার ত ভাল।"

বলিলাম "পারবো মনে হয় না—যে কারণেই হ'ক্ ওর প্রাণে একটা তীব্র প্রতিহিংসার ভাব জেগেছে, টাকায় ওকে শান্ত করতে পারবে না, ওর মন ফিরাতে হবে অন্য ভাবে. বাঙ্গালী চায় চাকুরী—সব মোহ কাটে—বাঙ্গালী চাকুরীর মায়া ছারতে পারে না, ওকে একটা ভাল চাকুরীর প্রলোভনে দেশান্তরী করতে হবে—কিন্তু সেটার উপায় করি কি করে! আপনি বল্‌ছেন আপনার কারবার সংশ্রবে ওকে রাখা হবে না।"

"হাঁ, হাঁ ওটি করো না, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—একটা উপায় করতেই পারবে।"

বুদ্ধিমান নই আমি—কণ্টক উদ্ধারের কণ্টক,—কণ্টক উদ্ধার করিবই—কিন্তু ডাক্তার, পরকে বিপদগ্রস্ত করিয়া নিজের এ নিরাপদ হইবার চেষ্টা কয় দিন চলিবে ? বিষ, বিষনাশক হইতে পারে কিন্তু তাহাতে বিষ প্রাণনাশক ধর্ম্ম হারায় না !

সেই রাত্রেই রওনা হইলাম, বিদায়ের পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল একবার অলকাকে বলিয়া যাই, নানা দিক চিন্তা করিয়া সে ইচ্ছা দমন করিলাম ! আমি নিজেই অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্তলিকা অন্যকে সাহায্য করিব কি প্রকারে ? ধিক্কার আসে প্রাণে,—শক্তিহীন—নামগোত্রহীন আমি আমার আবার জীবন ! এই জীবন লইয়া আবার চলিয়াছি,......কোথায় ?......কাহার কাছে ?—কি দেখিব কে জানে ?

ক্রমশঃ—

শ্রী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৃষ্টি সমভাবেই চলিতেছে। পরিমাণ ৫১.২৬ ইঞ্চি। গত বৎসর এ সময় ছিল ৫২.৯০ ইঞ্চি। অতিবৃষ্টিতে স্থানে স্থানে ধান্য ও পাটের ক্ষতি হইয়াছে। তরি-তরকারী দুর্ম্মূল্য। স্থানীয় মৎস্যের আমদানী নাই বলিলেই হয়। ভরসা চালানী ইলিশ, তাহাও অগ্নিমূল্য। সাধারণ ছোট

মাছ ৸৹—১৲ সের। স্বাস্থ্য মন্দ নয়। গো-মড়ক কমিয়াছে। চাউল মোটা ৮০ তোলায় মণ—৫॥ হইতে ৬।৹ টাকা।

এ দিকে বৃষ্টির বিরাম নাই, তাহাতে আবার পবন দেবের কৃপাও কম হয় নাই। বিগত ১০ই জুন তুফানগঞ্জ মহকুমায় প্রবল ঝড়ে বহু বৃক্ষ ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। তুফানগঞ্জ মহকুমার কাছারী গৃহের ছাদ সম্পূর্ণ উড়িয়া গিয়াছে; ডাক্তারখানা, স্কুল ও ছাত্রাবাস প্রভৃতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এ জন্য স্কুলের গ্রীষ্ম বন্ধ আরও ১৫ দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইয়াছে। এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায়ও কোন প্রাণহানি হয় নাই, ইহাই সুখের বিষয়।

আমাদের শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর নাবালক। এই কালে রাজকার্য্যের পরিচালনের জন্য ২১শে মে তারিখে রিজেন্সি কাউন্সিল (সরবরাহকারী মহামান্য রাজসভা) স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাণী মহারাজমাতা রিজেন্সি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও রিজেন্ট, এইচ, জে, টোয়াইন্যাম এস্কোয়ার, বি, এ, আই, সি, এস্ ভাইস্ প্রেসিডেন্ট, শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ (মহারাজ পিতৃব্য) এবং শ্রীযুক্ত জগদ্বল্লভ বিশ্বাস এম-এ, বি-এল, সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রথিতযশাঃ ও সুযোগ্য ব্যক্তি, ইঁহাদিগের হস্তে রাজ্য পরিচালনভার ন্যস্ত হওয়ায় প্রজাকুল আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছে।

স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে বর্ত্তমান ২৩সন হইতে বি, এসসি, ক্লাশ খোলা হইবে। ভিক্টোরিয়া কলেজ স্বনামধন্য স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহার দ্বারা দেশ উপকৃত ও উন্নত হইতেছে। বাঙ্গলার বহু ছাত্র এ কলেজে অধ্যয়ন করে। এই কলেজ বিদ্যমান থাকায় রাজ্যের প্রকৃতিবর্গ ও কর্ম্মচারীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন। কলেজের এতদিন বি, এসসি, বিভাগ না থাকায় স্থানীয় অনেক ছাত্রকেই অন্যত্র ব্যয় বাহুল্যের জন্যই পাঠে বিরত হইতে হইত; সে অভাব নিরাকৃত হইলে স্থানীয় অধিবাসীবর্গের একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

বিদেশী কাপড়ের কাটতি কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু স্বদেশী বস্ত্রের দিকে লোকের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে আর সন্দেহ নাই। লোকের আর্থিক অবস্থা ও স্বদেশী জিনিষের দুর্ম্মূল্যতা এবং তাহারও সরবরাহের সুবন্দোবস্তের অভাবেই বিদেশী বস্ত্রের এত কাটতির কারণ। সুখের বিষয় কোচবিহারে একটি বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অবসর কালে যুবকগণ এই বিদ্যালয়ে বস্ত্রবয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ও দেশজাত সূত্রে বস্ত্রবয়ন করিয়া দেশসেবায় নিজকে নিয়োগ করুন। বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞাপন প্রচার হইয়াছে, তাঁহারা চরকায় সুতা ক্রয় করিতে এবং তুলা ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া সূত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতে ইচ্ছুক। এদিক হইতে এই বিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়া নিজের উপার্জ্জনের পথ সহরবাসী পরিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। বস্ত্রসমস্যার সমাধানের সহিত ইহাতে দারিদ্র্যেরও একটা কিনারা হইতে পারে। কোচবিহারে একদিন চরখার অতি প্রচলন থাকিলেও বর্ত্তমানে চরকা নীরব। আশা করি এই সুযোগ অনেক বেকারই অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া দেশ ও নিজকে উপকৃত করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে মহাসমারোহের বিগত ৮ই ও ৯ই অগ্রহায়ণ নৈহাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রমুখ বঙ্গের অধিকাংশ বিখ্যাত সাহিত্যিকই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাব ও ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্কিমত্ব,—তাঁহার নিকট বঙ্গ ও বঙ্গভাষা কতদূর ঋণী তাহা উপস্থিত সকলের প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাও সময়োপযোগী ও সুন্দর হইয়াছিল। তিনি দুইটী প্রস্তাব তাঁহার বক্তৃতায় অবতারণা করেন, প্রথমটী সাহিত্যসেবীগণের উৎসাহ কল্পে চারি সহস্র মুদ্রার একটি পুরস্কার ও দ্বিতীয়টি ভিন্ন ভাষা হইতে উপযুক্ত গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ। সভার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আতিথেয়তায় ও সুবন্দোবস্তে সাহিত্যিকগণ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-ভবন বঙ্গের সাহিত্যিকগণের পুণ্যতীর্থ। সে তীর্থের রেণু স্পর্শ করিয়া সকলেই ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু রেল কোম্পানী এই তীর্থকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। বঙ্গবাসী ইহার রক্ষার জন্য সচেষ্ট না হইলে এই

স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাহিত্যিকগণ অচিরে সাহিত্য সম্রাটের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য তৎপর হউন।

গত বৎসরের দুর্ঘটনার পরও সান্তাহার-সিরাজগঞ্জ রেল লাইনে এখনও জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। যে একটি পুল নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহা সম্পন্ন হইলে চলন বিলের বিরাট জলরাশি নির্গমে ইহা কোন সহায়তা করিতে পারিবে না। এই রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বের সমুদয় ধান্য এই মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডুবিয়া গিয়াছে। লাইনের এক পার্শ্বে। জল অন্য পার্শ্বের জল অপেক্ষা সময় সময় এক হাত, দেড় হাত পরিমাণ উঁচু হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে আবাদের আর সুফলের আশা নাই। ৭।৮ বৎসর হইতে ক্রমাগত অজন্মা। এই অঞ্চল পাবনা জেলার প্রধান শস্য ভাণ্ডার—অথচ ইহাই একেবারে শস্যহীন হইয়া গেল। সময় থাকিতে ইহার প্রতিকার না হইলে দেশ ধ্বংশ হইলে কি হইবে প্রতিকারে।

শত শত গৃহস্থ গত বৎসরের বন্যায় গৃহহীন হইয়াছে। ভারতবাসী অকাতরে অর্থ দান করিয়া বহুপ্রাণ রক্ষা করিয়াছেন,—যে সহৃদয়তার পরিচয় দেশের লোক দুস্থের জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় কিন্তু এতগুলি অর্থ এ দরিদ্র দেশের ব্যয় হইল কাহার দোষে? মূল সংস্কৃত হইল না—অসহযোগীতা রক্ষা করিয়াছে সহস্র প্রাণ! কিন্তু তাঁহারা আবার প্রস্তুত হইয়া থাকুন এরূপ দানের জন্য! দুর্ঘটনার কারণ সংশোধিত না হইলে দুঃখ দূর হইবে না! যে সহানুভূতি দুস্থের দুঃখ দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে সেই সহানুভূতি মূল সংশোধনে তৎপর হক!

কুসংস্কার দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে! সৎশিক্ষার উন্নত চিন্তায় দেশের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে, কেবল রাজকীয় অধিকার লাভের চেষ্টা দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ করিতে হইবে না। গৃহের অন্ধকার দূর করিতে না পারিলে বাহিরের বিদ্যুতালোকে কি উপকার সাধিত হইবে! উচ্চচিন্তা উচ্চভাব,—পারিবারিক আদর্শ, ভারতের নিজস্ব ক্রমেই হত

হইতেছে; বাহ্যিক সাজসজ্জায় বাক্য আড়ম্বরে আমরা সভ্য হইলেও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা,—সারল্য, সহৃদয়তা আমরা হারাইতেছি। শিক্ষিত যুবক, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না যুবতীর ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় নাই—তাহার প্রামাণ নিত্য প্রাপ্ত হইতেছি। গুরুজনের সম্মান, ভক্তি, বশ্যতা, পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা, সহ্য করিবার শক্তি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। পুত্র পিতাকে গ্রাহ্য করিতে অনেক স্থলেই রাজী নয়,—তাহাতে নাকি স্বাধীন মতের অবমাননা করা হয়,—পিতার মুখে মুখে তর্ক ত বঙ্গ পরিবারের নিত্য ব্যাপার। উপার্জ্জনশীল সন্তান পিতার সাহায্যে আসে কমই,—তাহাদের উপার্জ্জনে নিজেদের উদর পুরণ হয় না,—ব্যয় বাহুল্যতা, বিলাসিতা ইহার মূল! উন্নতি তাহা হইলে কোথায়? কোন আদর্শে এ কি পরিণতি!

স্বাবলম্বনই নাকি ইংরাজী শিক্ষার দান কিন্তু কোথায় বাঙ্গলার সে স্বাবলম্বন? চাকুরীর জন্য উমেদারের ত অভাব দেখি না! চাকুরীর চেষ্টায় বড় লোকের দরবারে শিক্ষিতের ভাঁড়ামী দেখিলে—অশিক্ষিতকেও লজ্জিত হইতে হয়। দুইটি পয়সার জন্য সে কি খোসামোদ,—পরচর্চ্চা, তথাপি উদরান্নের সংস্থান হয় না! শক্তের ইহারা ভক্ত আর সুযোগ পাইলে দুর্ব্বলের যম! আমরা দুইটি টাকার জন্য উচ্চশিক্ষিতকে অনৃতের আশ্রয় লইতে দেখিয়া অবাক হইয়াছি,—আশ্চর্য্য হই নাই। শিক্ষিত যুবক শ্বশুরের অর্থে আত্মতৃপ্তি করিতে না পারায় বধূনির্য্যাতনে তৎপর হইতে দেখিয়াছি। কত দুর্ঘটনা, কত অত্যাচার অবিচার নিত্য এইরূপে ঘটিতেছে। তথাপি দেশের চোখ ফোটে না, মোহ কাটে না। এক স্ত্রী বর্ত্তমান দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে, এম-এ,ও এ দেশে কুণ্ঠিত নন,—স্ত্রী অপরাধ দাবী পরিপূরণে পিতৃপুরুষের অক্ষমতা।

* * *

সুখের ত শেষ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই আবার রমণীই বাঘিনী! অশিক্ষিতা শাশুড়ী বধূকে পশুর মত খাটাইয়াই কর্ত্তৃত্বপণার চরম করেন। রোগযন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া দিবা রাত্র পরিশ্রমের একশেষ করিতে পারিলেই এ দেশে বধূর প্রশংসা—বহু পুরুষ ও স্ত্রী অভিভাবককে এরূপ উক্তি করিতে শুনিয়াছি "আমরা ত বড় লোক নই মশায়, স্ত্রী গৃহ কার্য্য না করিলে আমাদের চলিবে

কেন!" নিজের সংসারে আত্মীয়ের জন্য পরিশ্রমকে কে অন্যায় বলে? কিন্তু রাঁধিবার বেলায়, বাঁটিবার বেলায় বধূ, আর আহারের বেলায় তাহার ভাগে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট কেন? বিনা ঔষধে তাহার রোগ আরোগ্য হইবার ব্যবস্থা কি তাহার পক্ষে প্রশংসার! এ প্রশংসার শেষ হইবে কবে! কন্যার ন্যায় বধূও যত্নলাভের সৌভাগ্যবতী হইবে, মুখে আমরা কন্যাকে বধূর সহিত তুলনা করি কিন্তু মনে মনে জানি বধূর মৃত্যুতে আমাদের অপকার কমই বরং অর্থ লাভের আশা আছে—ছেলের দ্বিতীয় বিবাহে!

বধূর আত্মহত্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রতিকারের কি পথ নাই! কোচবিহারে সংয়ের বুকে একটি নির্য্যাতিত বধূ বস্ত্র কেরোসিনে সিক্ত করিয়া আগুনে আত্মহত্যা করিল! কম দুঃখে কি কেহ এরূপ ভীষণ মৃত্যু বরণ করে! কি সে যন্ত্রণা! জীবন তাহার যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কাটা ছাগের মত অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সে ভোগ করিয়াছে! আত্মহত্যার কি ভীষণ পরিণাম! শশুড়ীর অত্যাচারই নাকি এ মৃত্যুর কারণ,—হৃদয়হীন স্বামী তাহার সহযোগী,—এইটি তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—প্রথমাও অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিনা চিকিৎসায় জীবনপাতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। তথাপি এ দেশের লোক এমন পরিবারে ও এমন বরে আবার কন্যাদান করে! এরূপ ভাবে কন্যা হত্যা করিতে কন্যাদানের ধর্ম্ম অর্জ্জন না করিলেই কি নয়! সমাজ এ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেছে! তৃতীয়বার দার পরিগ্রহও এ বরের পক্ষে কঠিন হইবে না। হিন্দু সমাজে কন্যাদান করাই চাই!

যতদিন বঙ্গের বালিকাকে স্বাবলম্বী হইবার মত শিক্ষা দেওয়া না হইবে ততদিন এ রোগের ঔষধ নাই!

বৈদিক পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের দেহাবসান ঘটিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও ছিলেন উৎসাহের অবতার,—অক্লান্ত কর্ম্মী,—সুবক্তা, গবেষণাশীল; তিনি বৈদিক যুগের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—স্বাধীন ভাবে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত—ঋগ্বেদের প্রকৃতার্থবোধিনী টীকা ও মানবের আদিজন্মভূমি প্রভৃতি গ্রন্থ সভ্য সমাজে আদরনীয় হইয়াছে। পরিচারিকার পাঠক তাঁহার রচনার সহিত সুপরিচিত। বিদ্যারত্ন মহাশয় অকালে মহাপ্রস্থান করেন নাই, তথাপি এরূপ একজন পণ্ডিতের তিরোধানে আমরা ব্যথা পাইয়াছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি!

স্থানাভাবে প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করিতে না পারায় আমরা লজ্জিত আছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৭ম বর্ষ। শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল। ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

প্রেম-স্বপ্ন।

—:০:—

জানি সখি ফুরায়েছে প্রণয়-স্বপন,
নিমেষে হাসির ছটা, আকুল নিঃশ্বাস,
বোঝাতে বুঝিতে কথা প্রেম-নিবেদন,
চোখে চোখে আলাপন, বচন-উচ্ছ্বাস!
জানি গো নাহিক আর আবেগ-চঞ্চল
দ্বিধালাজ-দুরুদুরু কম্পন হিয়ায়,
নব সাধ আকিঞ্চন, ভাবনা তরল,
বিরহ মিলন-গীতি হর্ষে বেদনায়।

স্বপন যা' ছিল সে যে সত্য সবি আজ,
কল্পনার মায়লোক মিলায়েছে তাই,
বাহির লুকালো ধীরে অন্তরের মাঝ,
ভাদরের ভরা নদী প্রশান্ত সদাই।
মূর্ত্তিমতী গেহে তুমি হে মানসী মোর!
নয়নে টুটেছে তাই স্বপনের ঘোর।

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষ্টেশনে পঁহুছিয়া শুনিতে পাইলাম, অতিবৃষ্টিতে নীচে কোথায় পাহাড় ধসিয়া পড়ায় ৩ নং উর্দ্ধগামী যাত্রী গাড়ীখানি আসিতে পারে নাই। বর্ষাকালে পাহাড়ে মাঝে মাঝে এরূপ Landslip হওয়ায় রেলগাড়ী চলাচলের বড়ই অসুবিধা ও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময় এরূপও ঘটে যে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান লাইনে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকায় কলিকতা হইতে আগত অনেক যাত্রীকে শিলিগুড়ী হইতে আবার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

পূর্ব্বে প্রায় প্রতি বৎসর পাগলাঝোরার নিকটবর্ত্তী কোন না কোন স্থলে Landslip হইত, কখনও বা পাগলার উচ্ছ্বসিত উদ্দাম জলস্রোত রেলপথ প্লাবিত করিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইত। ইহার প্রতিবিধান কল্পে দার্জ্জিলিংএ একবার নাকি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারগণের এক বৈঠক বসে, এবং সেই বৈঠকের পরামর্শ অনুযায়ী

পাগলার প্রধান জলপ্রবাহটিকে প্রায় বার চৌদ্দটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হয়, তদবধি পাগলাঝোরার নিম্নস্থ রেলপথ কিয়ৎ পরিমাণে নিরাপদ হইয়াছে।

অপরাহ্ন ৫টার গাড়ীতে ব্যতীত দার্জ্জিলিং যাইবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। ষ্টেশনের পশ্চাদ্দিকস্থ ব্যাঙ্ক রোড ধরিয়া Eagles craig নামক পাহাড়টি দেখিতে গেলাম। একটি সরু চড়াই পথ দিয়া পাহাড়ের উপরে আসিয়া উঠিলাম, পাহাড়ের উপর হইতে পর্ব্বতপাদমূলে অবস্থিত তরাই প্রদেশের দৃশ্য কি মনোহর ও নয়নাভিরাম। দূর হইতে পাহাড়টির আকৃতি দর্শন করিলে সত্য সত্যই ইহাকে Eagles craig বলিয়া মনে হয়। Eagles craig হইতে নামিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে বর্দ্ধমান মহারাজের কাছারীবাড়ী দেখিতে পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কাছারীতে তহশিলদার বাবুই সর্ব্বদা বাস করেন। উপর হইতে মাঝে মাঝে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কেহ কেহ আসিয়াও দু'এক রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। কোন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে কথাপ্রসঙ্গে অবগত হইলাম, পূর্ব্বে যখন দার্জ্জিলিংএ শুধু সেনানিবাস ছিল এবং লোকে দার্জ্জিলিংকে কেবলমাত্র দুঃসহ শীতপ্রধান জঙ্গলদেশ বলিয়া জানিত সেই সময় কার্শিয়াং লায়াল ব্যাঙ্কের অধিপতি মিঃ লায়ালের নিকট হইতে তদানীন্তন বর্দ্ধমান মহারাজ চারি হাজার টাকা মূল্যে এই কার্শিয়াংএর জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। মহারাজ বাহাদুরের এ কার্য্য নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত মনে করিয়া রাজ সরকারের জনৈক পুরাতন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী দুঃখের সহিত কহিয়াছিলেন যে মহারাজা এতগুলি টাকা শুধু শুধু জলে ফেলিয়া দিলেন। অন্তরাল হইতে রাজা বাহাদুর প্রভুভক্ত বৃদ্ধ আমলার এ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "বাবা, টাকা জলে ফেলি নাই, টাকার গাছ পুঁতিয়াছি, দেখবে কালে সোণা ফলবে।" মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, বর্ত্তমানে কার্শিয়াং সম্পত্তির বাৎসরিক মুনাফা চারি হাজারের কত গুণ বেশী দাঁড়াইয়াছে তাহা একবার মাত্র যাঁহারা কার্শিয়াং টাউনটি দেখিয়াছেন তাঁহারাই ধারণা করিতে পারেন। গল্পে গল্পে গাড়ীছাড়ার সময় হইয়াছে দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ীতে যাত্রীগণের জন্য শৌচাগারের কোনও বন্দোবস্ত নাই, এবং বৃষ্টি

হইলে সকলকেই বাবুই পাখীর মত বসিয়া বসিয়া ভিজিতে হয়। কোম্পানীর এ সব দিকে কোন দৃষ্টি না থাকিলেও ১৯ মাইল পথের মধ্যে কমপক্ষে অন্ততঃ ।৫ বার টিকট পরিদর্শনের বিশেষ কড়া বন্দোবস্ত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। রেলের কর্ম্মচারী গার্ড, চেকার, ড্রাইভার প্রভৃতির অধিকাংশই দেশীয়, দু'চারিটি মাত্র সাহেব ও বাঙ্গালী আছেন। এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট এবং কোন বিষয়ে বিশেষ কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন করেন না বলিয়া রেল কর্তৃপক্ষ নাকি দেশীয়গণকেই অধিক পছন্দ করেন, শুনা যায়। এ লাইনে Signal এর কোন বন্দোবস্ত নাই, এবং একখানি গাড়ীর (Train এর) পশ্চাতে "হুড় হুড়" করিয়া পাঁচ, ছয়খানি (Train) গাড়ীও সময় সময় ছুটিতে থাকে, এবং প্রায় প্রত্যেক গাড়ীর (Carriage বা Wagon) পশ্চাদ্ভাগে বরাবর এক এক জন করিয়া (Brakesman) ব্রেকস্‌ম্যান দাঁড়াইয়া থাকে। রাস্তায়, ষ্টেশন ভিন্ন অনেক স্থানেই গাড়ী থামিতেছিল এবং অনেক যাত্রী নামা উঠা করিতে ছিল। তাহাদিগকে টিকেট দেওয়া এবং তাহাদিগের নিকট হইতে টিকেট গ্রহণ করা সকল কার্য্যই গার্ড বাবুকে করিতে হইতেছিল। এই রূপে নানা স্থানে থামিয়া এবং পথের মধ্যে যথা অযথা কারণে বিলম্ব করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ট্রেনখানি দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছল। গাড়ী প্লাটফরমে প্রবেশ করিতেই "বাবু কুলী, বাবু কুলী" রবে কুলীরমণীরা "নামলো" লইয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, ডাকগাড়ীর সময় কুলী যুবতীরা যেরূপ যাত্রীর মাল লইয়া পরস্পরের সহিত টানাটানি গালাগালি আরম্ভ করিয়া দেয়, রাত্রিতে কুলীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় তেমন কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হইল না। কুলীর পিঠে মাল চাপাইয়া আগে হস্তে আর্দ্দালি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

মাথার উপরে স্তরে স্তরে অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়া নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপের মত সমস্ত সহরটিকে অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করিয়াছিল। দীর্ঘ প্রবাসান্তে দার্জ্জিলিংএ প্রত্যাগমন করিয়া দার্জ্জিলিংএর সান্ধ্যছবি দর্শনে মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। পথিপার্শ্বে গৃহমধ্যে কর্ম্মনিরতা কোন পাহাড়ী যুবতী "ম ত য মু পর পরদেশ" গানটি—আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছিল, বায়োস্কোপ ফেরত কোন যুবক সুরাবিজড়িত স্বরে "রাণী বোনাই মা, দিদি কাঞ্চী বোনাই মা, একলা ছোড়েও দাজু, পানকা দোকানমা"

গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিতেছিল, কোথাও বা লাইট্-পোষ্টের অস্পষ্ট আলোকে দাঁড়াইয়া ক্কচিৎ যুবতী কোন উন্মার্গগামী যুবকের সহিত প্রেমালাপে ব্যাপৃত ছিল, আবার কোন স্থলে পানের দোকানের সম্মুখে কোন কোন যুবতী সুর্ম্মারঞ্জিত চক্ষু যুবকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল। এই সকল অভিনব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ থিয়েটার হলের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, রাত্রে পাহাড়িয়া থিয়েটারে "শকুন্তলা" নাটকাভিনয় হইবে বলিয়া হলে বহু লোক সমাগম হইয়াছে। পাহাড়িয়া থিয়েটার দর্শন জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল, সুতরাং যথা সত্বর বাটী পৌঁছিয়া আহারাদি সমাধা করিয়া অনতিবিলম্বে হলে আসিয়া পৌঁছিলাম। বেশী ভিড় ছিল না বলিয়া অনায়াসেই একটি মনোমত স্থান খুঁজিয়া পাইলাম। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই যুবক যুবতী ও বালকবালিকা, সকলেই মনোযোগের সহিত অভিনয় দর্শন করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সিগারেট পান করিতেছিল। সম্মুখ ভাগে উত্তম বেশে সজ্জিতা তিনটি যুবতী দু'টি যুবকের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অভিনয় দর্শন করিতে করিতে সাধারণ শ্লীলতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতে ছিল।

অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে ইহাদের মধ্যে একটি কোন ধনাঢ্য সর্দ্দারের কন্যা, সুদূর পল্লী হইতে পিতামাতার অজ্ঞাতে সহর দর্শন ও সহরের আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতে আসিয়াছে, দ্বিতীয়া কোন.........শুশ্রূষা কারিণী, তৃতীয়া বর্ত্তমানে সহরবাসিনী কিন্তু পূর্ব্বে প্রথমারই ন্যায় কোন সুদূর পল্লীবাসী পিতামাতার গৃহ অলঙ্কৃত করিত। যুবক দু'টির অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, ইহারা সহরবাসী এক এক জীব, নিজেদের বিশেষ কোন ব্যবসায় বা জীবিকা কিছুই নাই কিন্তু মাঝে মাঝে এরূপ দু'চারিটী শিকার সংগ্রহ করিয়া বেশ আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইয়া দেয়; দার্জ্জিলিংএ নাকি প্রায়ই এরূপ অনেক অবিমৃশ্যকারিণী যুবতী গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সহরে বেড়াইতে আসে, এবং এই শ্রেণীভুক্ত কোন যুবকের কবলে পতিত হইয়া কিছুকাল সহরের আমোদপ্রমোদ ও ভোগবিলাসে অর্থসম্পদাদি ব্যয় করিয়া ফেলে পরে হৃতসর্ব্বস্বা হইয়া কেহ কেহ পুনঃ লজ্জাহীনার মত গৃহে ফিরিয়া যায়, কেহ বা সহরেই কোন একটা কাজকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লয়।

অভিনয় মোটামুটি মন্দ হইতেছিল না, মাঝে মাঝে পাহাড়িয়া বালকগুলি তাহাদিগের নৃত্যগীতনৈপুণ্যে দর্শকগণের মনমুগ্ধ করিতেছিল। উপযুক্ত শিক্ষা ও যত্ন চেষ্টার ফলে কালে যে ইহারা অভিনয় বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শরীর বিশেষ অবসন্ন ও ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল দেখিয়া অভিনয় এক অঙ্ক শেষ হইলেই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

* * *

গোদোমা যাত্রা :—

কিছুদিন দার্জ্জিলিং-এ অবস্থান করিয়া পুনরায় গোদমা যাত্রা করিলাম। সেপ্টেম্বর মাস অতীত প্রায় কিন্তু তখনও পাহাড়ে বর্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। বর্ষাকালে এদেশে মফঃস্বল পথে ভ্রমণ যে কিরূপ বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য তাহা একমাত্র ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। যেগুলিকে "কোম্পানী বাটো" বা সরকারী রাস্তা বলে সেগুলিরই এমন ভীষণ অবস্থা ঘটে যে বর্ষার প্রারম্ভেই সরকার হইতেই নোটীশ দিয়া ইহার কোন কোন পথে লোক চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অপরিসর চড়াই দুর্গম হইয়া উঠে, তদুপরি অতি-বৃষ্টির ফলে কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় অনেক সময় হয়ত পথের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, আবার কোথাও বা পাহাড় ধসিয়া পড়ায় উভয় দিকের পথই বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পথে চলিবার সময় হঠাৎ পাহাড় ধসিয়া পড়ার (Land slip হওয়ার) যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

২৪ শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহরে দার্জ্জিলিং হইতে রওনা হইয়া সিপাযারী ডাওসেসান বালিকা বিদ্যালয়ের নিকটে গো গাড়ীর পথ পরিত্যাগ করিয়া বামদিকে পুলবাজার অভিমুখে নামিয়া চলিলাম। দেশীয় ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ানদিগের গোর ভূমির পার্শ্ব দিয়া উৎরাই পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথের অবস্থা দর্শনে বিশেষ চিন্তা-ন্বিত হইয়া পড়িলাম। উৎরাই পথে অশ্বারোহণ সুবিবেচনার কার্য্য নহে বলিয়া পদব্রজেই রওনা হইয়াছিলাম; বন্ধুর পিচ্ছল পথে প্রায়ই পা পিছলাইয়া যাইতেছিল। বহুকষ্টে সিংটাম চা বাগানের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা পাওয়া গেল।

বাগান হইতে গবর্ণমেণ্ট রাস্তা মেরামতের কোন ব্যবস্থা করিয়াছে কি না তাহা জানি না কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে পথের যে অংশটুকু চা বাগানের মধ্য দিয়া গিয়াছে সেটুকু অপেক্ষাকৃত কম বন্ধুর ও সম্ভব মত সুগম।

প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রম করিতেই দূরে জলপ্রপাতের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র একটি বাঁশ জঙ্গল উত্তীর্ণ হইতেই অতি নিম্নে একটি রজত রেখার মত শুভ্র জল স্রোত দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমশঃ শব্দ স্পষ্টতর ও নদীর ক্ষীণ কায় বৃহত্তর বোধ হইতে লাগিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীতীরে উপনীত হইয়া দেখিলাম যে ক্ষুদ্র তরঙ্গিনীর শুভ্র ফেনিল খর জলস্রোত উভয় তীরবর্ত্তী প্রস্তরময় সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে বাধা প্রাপ্ত হইয়া গভীর গর্জ্জনে নিম্নদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর উপরে পারাপারের নির্ম্মিত লৌহ সেতু বর্ত্তমান ছিল সুতরাং অনায়াসে পুলের সাহায্যে এ পারে আসিয়া পঁহুছিলাম। পুলের সন্নিকটে পথিকগণের বিশ্রামার্থ কোন পরলোকগত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া রহিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ তথায় উপবেশন করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম, কিন্তু তথা হইতে আবার কিয়দ্দূর চড়াই উঠিতে হইবে জানিয়া মহা প্রমাদ গণিলাম। গত্যন্তর নাই, সুতরাং বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম, সৌভাগ্যক্রমে অল্প পথ গমন করিয়াই অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি পাওয়া গেল, তৎপরেই আবার নিম্নদিকে নামিতে নামিতে উৎরাই পথে একেবারে ছোট রঙ্গীতের উপরের ঝুলায়মান লৌহ সেতুর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। পুলের উভয় পারেই বাজার তবে হাটের দিন ওপারেই হাট বসে। শুক্রবার দিন, নদীর বিস্তীর্ণ বালুকাময় তীরের উপর বেশ বড় রকমের হাট লাগে, হাটে আলু, মাখন, মুরগী, পাঁঠা, এলাচি যথেষ্ট আমদানি হয় বলিয়া বহুদূর হইতে লোক এই হাটে ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকে।

সিকিম রাজ্য হইতে যে সকল দ্রব্যাদি লোকে হাটে বিক্রয় জন্য লইয়া আসে, এবং ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হাট হইতে ক্রয় করিয়া সিকিমে লইয়া যায় তাহার একটি হিসাব রাখার জন্য হাটে একটি ট্রাফিক্‌ অফিস আছে এবং তথায় একজন মুহুরি সরকার হইতে নিযুক্ত আছেন।

হাটের উত্তরে প্রায় একশত ফুট্ উর্দ্ধে ঠিক নদীর উপর পুলবাজার থানা অবস্থিত। বাজার হইতে থানায় যাইতে হইলে সরু একটি নালার মত ক্ষুদ্র ঝরণা পার হইয়া চড়াই উঠিতে হয়। গত বৎসর বর্ষাকালে ক্রমাগত কয়েক দিবসের অতি বৃষ্টির ফলে হঠাৎ এক রাত্রিতে উপরে Landslip হয় এবং এই ক্ষুদ্র ঝরণা পথে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড নীচে গড়াইয়া আসায় বাজারবাসী বহুলোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। এ জন্য লোকে ঝরণার পার হইতে দোকান পাট উঠাইয়া হাটের অপর প্রান্তে লইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহারা এখনও ঝরণার কিয়দ্দূর ব্যবধানে দোকান করিয়া আছে তাহারা বর্ষাকালে কোন ক্রমেই তথায় রাত্রি যাপন করে না।

অপরাহ্ন প্রায় টার সময় থানায় পৌঁছিলাম। থানায় বিহার দেশীয় জনৈক কায়স্থ দারগা ছিলেন, তিনি আমাকে অভ্যাগত দেখিয়া অতি যত্ন আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তাঁহার অমায়িক মধুর ব্যবহার দর্শনে মনে হইতেছিল যেন তিনি আমার কত দিনের পরিচিত পুরাতন বন্ধু। পথশ্রমজনিত ক্লান্তি অপনোদন জন্য তিনি যথাসত্বর আমার জন্য চা ও জল-খাবার প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন, জলযোগান্তে একটু সুস্থ হইয়া উভয়ে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে রাত্রির ভোজ প্রস্তুত হইল, বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া, যথাসময়ে আহার সমাধা করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, জাগরিত হইয়া ঢাকের শব্দ ও রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। জানালা খুলিয়া দেখি যে বাজারের উপর কয়েক খানি চা-দোকানের সম্মুখে বহু স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া মশালের আলোকে নৃত্যগীত করিতেছে।

ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত মনে মনে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম, এ দিকে পুলবাজার দার্জ্জিলিং অপেক্ষা ৭।৮ মাইল নিম্নে অবস্থিত হওয়ায় শীতও বেশ অনেকটা কম ছিল, সুতরাং একখানি আলোয়ানে দেহ আবৃত করিয়া বাজারের দিকে নামিয়া গেলাম। যে স্থানে স্ত্রীপুরুষেরা গোলাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মধ্যস্থলে একটি যুবক ঢাক বাজাইয়া গান গাইতেছিল এবং অদূরে একটি কিশোরী যুবতী সেই বাজনার তালে তাল মিলাইয়া

নৃত্য করিতেছিল। সমবেত দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতেও মাঝে মাঝে দু'চারিটী যুবকযুবতী কখন কখন তাহাদিগের সহিত নৃত্যগীতে যোগদান করিতেছিল।

অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে যুবতীটি কোলুং-এর নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে দু'একজন সমবয়সী "সাথী"র সহিত পুলবাজার হাটে বেড়াইতে আসিয়াছিল। যুবক তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া লিম্বু জাতির জাতীয় প্রথানুযায়ী তাহাকে সঙ্গীত যুদ্ধে আহ্বান করে, কিন্তু বালিকা পরাজিত হওয়ায় সে তাহাকে বিবাহার্থ বন্দিনী করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিয়াছে। যদি নিজ সঙ্গীত নৈপুণ্যে যুবতী জয়লাভ করিত তাহা হইলে যুবক লজ্জায় সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিত এবং সে যথেচ্ছা গমন করিতে পারিত।

নৃত্যগীত শেষ হইলে এক মুণ্ডিত মস্তক লামা আসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বরকনে উভয়ে কুক্কুটকুক্কুটীযুগলকে হস্তে ধৃত করিয়া তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে লামা বরকনেকে সম্বোধন করিয়া লিম্বু ভাষায় কি যেন বলিলেন তখন বর কনের করতলে করতল বিন্যস্ত করিল।

মন্ত্র পাঠান্তে লামা নবীন দম্পতির হস্ত হইতে কুক্কুট দুইটিকে গ্রহণ করিলেন। খুকরী সাহায্যে কুক্কুট-গ্রীবাচ্ছেদন পূর্ব্বক, নির্গত রুধির ধারা এক খণ্ড কদলীপত্রে ধারণ করিলেন। ইহা হইতে নাকি পরিণীত যুবকযুবতীর ভবিষ্যজ্জীবনের শুভাশুভ নির্ণিত হয়।

একখানি কদলিপত্রে সিঁদুর গুলিয়া রাখা হইয়া ছিল, বর দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সেই সিন্দুর লিপ্ত করিয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "সুন্দরি! আজ হইতে তুমি আমার স্ত্রী" এইরূপ কয়েকবার কহিয়া সেই অনুলেপনে নবপরিণীতা পত্নীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত সিঁদুর রঞ্জিত করিয়া দিল।

তৎপরে সমাগত আত্মীয়কুটুম্ববর্গ সকলে ভোজন করিতে বসিল। ভোজের নিমিত্ত আর মদ্য, শূকর মাংস ও অন্ন প্রভৃতি পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিবাহ শেষ হইয়া গেল দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতে শুনিতে পাইলাম,—এ বিবাহ দম্পতির পক্ষে শুভকর হয় নাই কারণ লামা যে আত্মীয়া আয়াকে 'আহ্বান' করিয়া বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করিতে আদেশ করিয়া

ছিলেন সে আত্মা তাহাদিগকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করে নাই। বরের মাতা এ নিমিত্ত অশুভাশঙ্কায় ভীতা হইয়া লামার দ্বারা গ্রহশান্তি করাইতেছে। গ্রহশান্তির প্রয়োজন হইলেই লামাগণের আরও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সুতরাং প্রেতাত্মা যখন তাঁহাদেরই বাগ্‌যন্ত্র সাহায্যে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া থাকেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। গ্রহশান্তি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেলে যুবতী মুক্তিলাভ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এরূপ ঘটে যে কন্যা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না।

কয়েকদিন পরে আরমদা, শূকর শাবকের মৃতদেহ ও একটি রৌপ্য মুদ্রা উপঢৌকন লইয়া ঘটক কোলবুং পাত্রী আনিতে যাত্রা করিল। লিম্বুদিগের বিবাহও যেমন আশ্চর্য্য রকমের পাত্রী প্রার্থনাও তদ্রূপ অদ্ভুত ধরণের। শুনিতে পাইলাম যে ঘটক পাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন দ্রব্যগুলি ভূমিতে রক্ষা করিলে পাত্রীর পিতা নাকি ক্রোধের ভান করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, এবং "তোমরা কেন আমার কন্যাকে গোপনে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলে" এইরূপ বলিতে থাকেন। ঘটক তখন বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করে এবং ক্রোধোপশমন জন্য আরও একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করে।

পরে পাত্রীর মূল্য বাবদ একটি শূকর ও কিঞ্চিৎ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হয়, বরের আর্থিক অবস্থা অনুসারে এই পণের পরিমাণ দশ হইতে একশত কুড়ি মুদ্রা পর্য্যন্ত হইতে পারে। বরপক্ষ নগদ মুদ্রা দিতে অক্ষম হইলে নির্দ্ধারিত পণের বিনিময়ে তুল্য মূল্যের দ্রব্যাদি দান করিবারও প্রথা আছে।

আদান প্রদান শেষ হইলে কন্যাকে ঘটকের নিকট সমর্পণ করা হয়, কিন্তু কন্যা ইত্যবসরে গৃহের কোণে লুক্কায়িত হইয়া থাকে। পিতা কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া "আমার কন্যা হারাইয়া গিয়াছে, কেহ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর" এইরূপ কহিলে ঘটক অনুসন্ধানকারীর পারিশ্রমিক বাবদ আরও দু'একটি মুদ্রা বাহির করিয়া দিলে কন্যা অন্তরাল হইতে আপনা আপনি বহির্গত হইয়া আইসে।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

কদম্বমূলে।

আজ,　　শ্যামের বামে দাঁড়াল রাই
　　　　　　　　ব্রজের আসরে,—
যেন　　মেঘের গায়ে সৌদামিনী
　　　　　　　　আকাশ-বাসরে !
　　নাচে　　নবীন তৃণে খঞ্জন এ,
　　আঁকা　　হেমের ঘড়া অঞ্জনে,
মরি,　　জড়া'ল ঐ কনকলতা
　　　　　　　　তমাল-পাশ রে !

একি　　নীল গগনে শারদশশীর
　　　　　　　　মত্ত উদয় ?
এযে　　কমল মাঝে ভৃঙ্গ গাঁথা
　　　　　　　　মত্ত-হৃদয় !
　　ওগো,　　কজ্জলে আর চন্দনে
　　বাঁধা　　রূপ যে রূপ যে যুগল বন্ধনে,—
যোবে　　হাসি বাঁশী এক ঠাঁয়ে আজ
　　　　　　　　কেকার কাঁসরে !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

রক্তাম্বরা।

-ঃক্কঃ-

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর :)

বিয়ের সর্ত্ত।

আমি তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা হলে খুন করাটাও আপনার টাকা দেবার একটা সর্ত্তের মধ্যে ?"

"আমি ত বোল্‌ছি যে সে সন্ধ্যার আগে মরবেই। যেমন করেই হোক কয়েকঘণ্টার বেশি সে বাঁচবে না। তুমি ডাক্তার তুমি তাকে শীগি্‌গর শীগি্‌গর মৃত্যুযন্ত্রনার হাত থেকে রেহাই দিতে পার।"

আমি ক্রোধভরে বলিলাম "পরিষ্কার কথা এই যে আপনি চান, আমি তাকে মারি আপনি যে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে চান তা বিয়ের জন্য নয় তাকে মারবার জন্য।"

তিনি বেশ শান্তস্বরে বলিলেন "ওঃ! তুমি সমস্তটা ভুল বুঝেছ। খুনের ত অনেক রকম পর্য্যায় থাকতে পারে। মরণোন্মুখী বালিকাকে মেরে ফেলা দয়ারই কাজ, তাতে পাপ নেই।"

আমি অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলাম "তার জীবনের এক মুহূর্ত্ত থেকেও তাকে বঞ্চিত করা আমি পাপ মনে করি। আর মশাই আপনি নিজের অবস্থার কথা ভেবে দেখ্‌ছেন না ? কাউকে খুন করবার জন্য লোককে ঘুষ দিলে রাজদ্বারে দণ্ড পেতে হয় তা জানেন না ?" তিনি মৃদু হাসিলেন।

"ওসব বোকামিতে, মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক আমার কাজের জন্য আমি দায়ী। তোমার কোন সাক্ষী আছে ? তুমি আদালতে নালীশ কোরলে কে তোমায় বিশ্বাস কোরবে ?"

সত্যিইত তাঁর কথাই ঠিক। সাপকে বেশী খেলান ভাল নয় ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহলে বুঝতে হবে যে এই উভয় প্রস্তাবেই আপনার স্বার্থ আছে ?"

আমার আশা ছিল আমি ভিতরের কথা কিছু জানিতে পারিব। কিন্তু তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "সে আমি বুঝব।"

"তাহলে আমার বিবেকও বোধ হচ্ছে আপনার। আমি কাউকে খুন করে আমার বিবেককে খুন কোরতে চাই নে। আপনার টাকায় নমস্কার।"

তাঁহার চক্ষু আগুনের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন "তাহলে তুমি অস্বীকার কোরছ ?"

"নিশ্চয়। সে ত দূরের কথা আমি উপরে গিয়ে তোমার কন্যাকে বাঁচাবার চেষ্টা কোরব।"

"বাঁচান! অসম্ভব। কিছুতে সে সারবে না। তা তোমার মত ভেল্কীবাজরা হয় ত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।"

"হতে পারে। আমি তাকে নিশ্চয়ই খুনের হাত থেকে বাঁচাব।"

"তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও ?"

"আমি তোমার নিজের মেয়েকে তোমায় খুন কোরতে দেব না। তা ছাড়া তার ঘরে ঢুকতে আমি তোমায় বারণ কোরছি। আমি ডাক্তার, তুমিই আমাকে তার চিকিৎসার জন্য আনিয়েছ। সুতরাং আবার যদি আমার বারণ সত্বেও তুমি তার ঘরে যাও আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।"

লোকটার মুখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু আবার হাসিও দেখা দিল, বলিল "সব বাজে। তুমি আমায় তার শয্যার কাছে যেতে বারণ করবার কে ?"

"আমার অধিকার আছে তাই কোরছি। তুমি বোলেছ যে তোমার স্বার্থের জন্য কাল সন্ধ্যার আগেই সে ম'রবে! তুমি নিজেই তাকে মারতে, কিন্তু ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে গেলে পরে গণ্ডগোল হয় সেই ভয়ে আমায় ডেকে ছিলে।"

সে খুব ধীরভাবে বলিল "ঠিক বোলেছ। সেই জন্যই তোমায় চল্লিশ হাজার টাকা দিচ্ছি। তোমার ডাক্তারি বিদ্যের জন্যই।"

"আর মরণের সার্টিফিকেট দেবার জন্যও বটে।"

নিশ্চয়ই তা বটেই ত।"

"বেশ তাই আমি সোজা বোল্‌ছি যে তুমি খুনী বদমায়েস। তোমার কন্যার জীবন তোমার কাছে কিছুই নয়। তোমার মত লোকের কাছে ভদ্রলোকের মান বাঁচান দায়।"

"তোমার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ! তোমার মত ভদ্রলোকের মান বড় অদ্ভুত ধরণের। তুমি অনায়াসে এক অচেনা অজনা মেয়েকে টাকার লোভে বিয়ে কোরলে।"

আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলাম "লোভ ত তুমিই দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কোরলে! ভাগ্যে আসল পাপ করবার আগে আমার টাকার নেশা ছুটে গেছে! আমি চল্লেম। এ সবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

"তা কি হয়? তুমি যে আমার জামাই।"

"তাইতে ত তোমার মেয়েকে খুন করবার অধিকার পেয়েছি।"

"তুমিই বল স্বামী ছাড়া আর কে তাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে?"

"আর কারই বা তাকে বাঁচাবার বেশী অধিকার আছে?"

"বাঁচান ত অসম্ভব।"

"কেন?"

"সে মরবেই।"

"তোমার কথায় নাকি! আরও একটা কথা, তার রোগ সত্যিই যদি মারাত্মক হোত, তা হলে তাকে মারবার জন্য আমায় অত টাকা ঘুষ দেবে কেন? কয়েক ঘণ্টার হেরফের এ তোমার ক্ষতিটা কি?"

"ক্ষতি আমার হইতেই হবে। সন্ধ্যার আগে তাকে মরতেই হবে।"

"যদি আমি বাধা দিতে পারি তা হলে মরবে না।"

"তা হলে টাকার মায়া কাটালে?"

"টাকার কাণাকড়িও ছোঁব না।"

"যদি ছুঁতে বাধ্য হও?"

"তার মানে?"

"মানে বুঝবে একদিন। তখন এমন দিন থাক্‌বে না। আমার সঙ্গে মিলে কাজ কোরলে ভাল কোরতে।"

"ভাল তোমার হোত,—আমার নয়।"

"না তোমারই। তুমি আগেই ত চল্লিশ হাজার টাকা নিতে রাজি হোয়েছ।"

"ঢের হোয়েছে। পুলিশে খবর দিলে এক ঘন্টায় জেলে যাবে।"

"ওসব ভয় আমার নেই তা ত আগেই বোলেছি। আমি কোন কাজে কখন ভুল করি না।"

"আমিও বাজে কথা কিছু বলি না।"

প্রথম হইতেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেওয়ায় ও পরে আমার দ্বারা তাহাকে খুন করায় তাহার বিশেষ স্বার্থ আছে। সে আমাকে তাহার অসৎ কার্য্যের সঙ্গী করিতে চায়। আর একটা কথা এক্ষণে মনে পড়িল। আমার হাতের ভিতর যে ছোট হাতটি ছিল তাহা ত রোগীর হাত নয়, সে হস্ত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। আমি তাহার নাড়ীর গতি অনুভব করিয়াছিলাম তাহাতে জ্বর বা কোন রকম অসুস্থতার চিহ্নও ছিল না কিন্তু সে নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ নিজে করিতে পারে নাই। যেন মন্ত্রমুগ্ধ! আমার প্রলুব্ধকারী এইখানেই আমায় ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পারে নাই। শেষকালে সে বন্ধুত্বের ভান করিয়া খুব মিষ্ট স্বরে বলিল "সত্যিই কি কিছু করতে পারবো না ডাক্তার? শত্রুতায় তোমার ত লাভ নেই মিত্র হলে বরং আছে। মনে রেখো এই বিয়েতে তুমি আমার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে।"

"তোমার উত্তরাধিকারী?" আগে সেকথা ভাবি নাই। এখন মনে পড়িল। বাড়ী দেখিয়া খুব ধনবান বলিয়া বোধ হয় বটে। আমি বলিলাম "তুমি বড় দয়াবান। কিন্তু অজানা লোকের কাছ থেকে অত বড় দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে নেই।"

ওঃ! আমি ত আর অজানা নই। আমার নাম অনন্তকুমার আদিত্য।"

"আচ্ছা আদিত্য মশায় এবার তবে আসি। যাবার আগে একবার স্ত্রীকে দেখতে চাই।"

সে হাসিয়া বলিল "এ ত খুব স্বভাবিক, তুমি যে তাকে দেখতে চাইবে কিন্তু দেখতে পাবে না।"

"তোমার কথায় ?"

সেই ছোট হাতটির অধিকারী কে জানিবার আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছিল। বাড়ীটি অতি রহস্যপূর্ণ কিন্তু সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আমার প্রবল বাসনা হইল। আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি দরজা আগ্লাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল "একটি মাত্র সর্ত্তে তুমি যেতে পারো। সে সর্ত্তের কথা তোমায় আগেই বলেছি।"

"তাকে মার্ব ? না আদিত্য মশায়, অন্য লোক দেখুন। আমার দ্বারা হবে না।"

"আরও দশ হাজার দিলে ?"

"যদি এক লক্ষ দেন তবুও নয়।"

"কেন তুমি ত প্রথমে রাজি ছিলে!"

"কখনো ছিলাম না।"

"তাহলে তার ঘরে যেতে পাবে না।"

এমন সময় কে দ্বারে করাঘাত করিল। বাহির হইতে কে বলিল "দরজা খোল আদিত্য।"

"কে মেজর, এস এস ভেতরে এস" বলিয়া আদিত্য দ্বার খুলিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দর-দর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্রবেশ করিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "দরজা বন্ধ করে কি হচ্ছে? খবর সব ভাল ত?"

"সব ভাল। ইনি আমার জামাই, বিলেতের পাশ করা ডাক্তার। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।"

তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল "ইনি মেজর দত্ত। অনেক দিন সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ছিলেন।"

"এস এস বাবা সুখে থাক।" বলিয়া আমার মেজর দত্ত মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। "আমি তোমার বিয়ের কথা সব জানি। আমি ও আদিত্য অনেক দিনের বন্ধু। অদ্ভুত এ বিয়ে! বেলা বেচারী! সেদিন আদিত্যর খাস জমিদারীতে তাকে দেখলাম একটুকু ফুটফুটে মেয়ে। যেন বাড়ীর লক্ষ্মী নী মন্ত্রবলে সে.........! মানুষের

জীবনের কিছু ঠিক্ নেই বাবা—কিছু ঠিক্ নেই। সবই তাঁর ইচ্ছা বাবা—সবই তাঁর ইচ্ছা ! কেমন আছে সে এখন ?"

আদিত্য বলিল "সেই রকমই। আজ রাতটুকুও কাটবে না।"

"আহা ! আহা !" মেজর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, সেই সময়ে আমার প্রলুব্ধকারী উঠিয়া বাহিরে গেল। আমিও উঠিয়াছিলাম কিন্তু মেজর বলিলেন "আমার বন্ধুর এরকম করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার খেয়াল কেন হোল কে জানে !"

আমি বলিলাম "আমার আদিত্য মশাইকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।"

"উনি খুব ভাল লোক, আর ওঁর বিস্তর টাকা। তোমার ভাগ্য ভাল। ভবিষ্যতে সবই ত তোমার।"

"আজকের দিন আমার জীবনে একটি বিশেষ দিন। সকালবেলা অবধি ভেবেছি—কখনো জীবনে বিয়ে কোর্‌ব না, আর এ বেলা আমার বিয়ে হ'য়ে গেল।"

"অনুতাপের ত কিছু নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার যেমন ছিলে তেমনি হবে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম এ লোকটিও একজন ষড়যন্ত্রকারী কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম "আমার মত এরকম সচরাচর কারও হ'তে দেখা যায় না।"

মেজর সিগারকেস বাহির করিয়া একটি নিজে ধরাইলেন, একটি আমায় দিলেন। তারপর অসুখের আগে বেলা কি রকম ছিল সেই গল্প করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি অসুখ তার ?"

"নাম জানি না। ছয় সাত জন ডাক্তার রাত দিন দেখেও ঠিক কোরতে পারে নি। কেউ বলে কিছু আমি বলি সবই শ্রীহরির ইচ্ছে। আদিত্য বিস্তর খরচ করেছে কিন্তু কি হবে ? বেলাকে কি সে কম ভালবাসে ? ওই একরত্তি মেয়ে রেখে তার স্ত্রী যখন মারা গেল কত কষ্টেই সে মানুষ কোরলে ও'কে। ও'র মুখ চেয়ে বিয়ে অবধি আর কোর্‌ল না। ওই ওর সর্ব্বস্ব। আহা বেচারীর কি কষ্ট !"

আমি উত্তর দিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে ভীষণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক চীৎকারধ্বনি কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমি চমকিয়া বলিলাম "শুনুন শুনুন, এ কি ?"

আবার সেইরূপ চীৎকার। হঠাৎ মনে হইল আদিত্য নিজেই নিজের মেয়েকে খুন করিতেছে। আমি দৌড়িয়া উপরে উঠিলাম।

রক্ষাকবচ।

উপরে গিয়া দেখি ঘরের দ্বার আগ্‌লাইয়া আদিত্য মশায় দাঁড়াইয়া। আমি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম "সরে যাও।"

"কেন বৃথা চেষ্টা কোরছ, যেতে পাবে না ভেতরে।"

"আমি কার কাতর-চীৎকার শুন্‌লাম। আমার স্ত্রী নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। আমি তার স্বামী তাকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাব।"

"খুব কর্ত্তব্যজ্ঞান ত। একমুঠো টাকার জন্য যে নিজেকে বিক্রী করে তার আবার কর্ত্তব্যজ্ঞান!"

আমি সরোষে চীৎকার করিয়া বলিলাম "আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হোয়েছিলেম সত্যি কিন্তু আমি পাষাণ নই,—পাপও কিছু করি নি।"

লোকটি হাসিল। তারপর আরও ভাল করিয়া দ্বার প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

হায়। কেমন করিয়া ভিতরে গিয়া আমার স্ত্রীকে বাঁচাইব!

আদিত্য আবার বলিল "তুমি টাকা চেয়েছিলে, টাকা দিতে রাজি ছিলাম। এখন টাকা চাও না,—চলে যাও।"

"যাব না। এই রাত্তের কথা তোমাকে চিরদিন মনে রাখ্‌তে হবে।"

লোকটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি আবার বলিলাম "সরে যাও বোল্‌ছি নয়ত ভাল হবে না।"

সে কয়েক পা পিছাইয়া ঠিক দ্বারের সম্মুখে আস্তানা নিল। তারপর পিস্তল বাহির করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিল। মুহূর্ত্তে আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। আমি বুঝিলাম আমার জীবন সঙ্কট। আমার পত্নীও বিনারোগে মৃত্যুমুখী। আমি লোকটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণপণ বলে বন্দুকটি কাড়িয়া লইলাম। লোকটির আকার দেখিয়া তাহাকে দুর্ব্বল বলিয়া ভাবিয়াছিলাম কিন্তু সে বেশ বলবান। ধস্তাধস্তির সময় একটা গুলি আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আঘাতও একটু লাগিল। লোকটি যে সুবিধা পাইলে আমার হত্যা

করিত এই চিন্তা আমায় পাগলের মত করিল; আমি পিস্তল কাড়িয়া লইয়া দরজার উপর ক্রমান্বয়ে পিস্তলের আঘাত ও লাথি মারিতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আমার স্ত্রী পালঙ্কের উপর রেশমের বিছানায় লাল বেনারসী পরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিল। হাতে সেই আংটী, তাহাকে দেখিয়া গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। এক মিনিট পূর্ব্বে বালিকা-কণ্ঠে করুণ স্বর শুনিয়াছি তাহাতে ত কোন ভুল নাই। তবে সে ঘুমাইল কেমন করিয়া? আমি দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মুখটি দেওয়ালের দিকে—ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। কেন যে লোকটি আমায় প্রবেশ করিতে বাধা দিল, এমন কি মারিবার চেষ্টা করিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সব রহস্য-পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল! আমি খুব মনোযোগের সহিত তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি পরীক্ষা করিলাম। অতি মৃদু নিঃশ্বাস পড়িতেছে। তাহার হাত দুখানি পাথরের মত হিম ও কঠিন।

এক মিনিট ইতস্ততঃ করিয়া আমি প্রবল বাসনার বশে তাহার মুখখানি দেখিবার আশায় খাটখানি দেওয়ালের নিকট হইতে সরাইয়া আনিলাম, তারপর ঘুরিয়া দেওয়ালের দিকে গেলাম। হঠাৎ গলায় ও ঠোঁটে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করিলাম। সব যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে, বোধহয় ভারী খাটখানি সরাইতে গিয়া কোন শিরা বা উপশিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পত্নীর মুখখানি দেখিবার ইচ্ছা তখন এত প্রবল যে আমি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহার গায়ের ঢাকা খুলিলাম। কি দেখিলাম? সে অপূর্ব্বদৃষ্ট! মানুষ সেরূপ দেখিলে পাগল হইয়া যায়। চক্ষু দুটি উন্মীলিত কিন্তু নিশ্চল। কি সে ভ্রমর কৃষ্ণ পক্ষ্মঘেরা জলকর। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালআয়ত কৃষ্ণতারকা! মুখে মৃদু হাসির আভাস। সে হাসিটুকু মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়াছিল। আমি নত হইয়া ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার অসুখ কোরেছে? কি হয়েছে বল দেখি? আমি ডাক্তার, তোমায় ভাল কোরে দেবো।" কোন উত্তর নাই। নিশ্চল দেবীপ্রতিমা। আমার তখন সন্দেহ হইল, আমি আবার পরীক্ষা করিলাম। গালে হাত দিলাম। উঃ! যেন বরফ। এতক্ষণে বুঝিলাম। আমার স্ত্রী মরিয়াছে। সন্ধ্যা আসিবার বহু পূর্ব্বেই সে মরিল। কিন্তু মৃত্যু আমায় লইতে

পারিল না। এত রূপ জীবনে দেখি নাই মৃতই হউক আর জীবিতই হউক দেখিয়া মজিলাম।

সে যদি জীবিত থাকিত। চিরদিন ওই রূপরশি হৃদয়ে লইয়া পূজা করিতাম। সে মুখ হইতে চোখ ফিরান যায় না। শিশুর মত পবিত্র ও কোমল সে মুখ। রোগের ছায়ামাত্র নাই। কেন সে চীৎকারও করিল? ঘরের দ্বারই বা কেন বন্ধ ছিল? তাহাকে ত্যাগলে খুন করা হইয়াছে। আমি চাদর খুলিয়া লইলাম। গলায় সরু চেনহারের সঙ্গে একটী প্রশ্নচিহ্নের আকারের রক্ষাকবচ। তাহার গঠন অতি বিচিত্র। সুন্দর সুন্দর বড় বড় হীরা বসান। আমি কবচখানি আমার পত্নীর স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ রাখিবার মানসে খুলিয়া লইলাম। সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিয়াও মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিলামনা। তাহার বক্ষের বসন উন্মোচন করিয়া হৃদয়ের গতি পরীক্ষা করিলাম। বক্ষের মধ্যস্থলে উল্কি—তিনটি হৃদ্‌পিণ্ড একগাছি মালিকায় গ্রথিত—উল্কিতে চিত্রিত করা হইয়াছে। আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম আজকালকার মেয়েরা উল্কি খুব কমই পরে। চক্ষু পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ চক্ষুটির অপেক্ষা বাম চক্ষুটী মুদিয়া গেল। তখন বুঝিলাম তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে। একটু আগেই সে মরিয়াছে। এই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সে চীৎকার করিয়াছিল। তখন তার জ্ঞান ছিল। আমি সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন বোতল বা পুরিয়া পাইলাম না। তারপর যদি অসুখ হইয়া থাকে এই ভাবিয়া প্রেসক্রপসন খুঁজিলাম তাহাও পাইলাম না। তাহার শয্যার পাশে বিবাহের মালাখানি ঝুলিতেছে কিন্তু অপূর্ব্বসুন্দরী সেই আমার স্ত্রী, হত্যাকারীর কবলে পড়িয়া চিরজন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। তাহার জীবনহীন সুন্দর দেহ শয্যায় শায়িত।

অনেক খুঁজিয়া মাথার বালিশের নীচে একটুকরা কাগজ পাইলাম তাহাতে লেখা "জহুরা আসিয়াছে।" জহুরা! সে কে? সেই কি আমার স্ত্রীর প্রণয়ী? ঘরের আসবাব ও সজ্জা দেখিয়া বোধ হয় আমার স্ত্রী বিদুষী ছিলেন। শিল্পে ও সঙ্গীতে তাঁর অধিকার ছিল। ঘরের দেওয়ালে তাঁহার স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র লম্বিত। চারিপার্শ্বেই তাঁহার শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি আবার তাঁহার শয্যার কাছে ফিরিয়া গেলাম। আবার গলায় ও ঠোঁটে

সেই রকম যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। আমার গলা ঠোঁট জ্বলিয়া যাইতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না। পায়ে যেন কে গরম লোহার শিক বিঁধিয়া দিতেছিল, বিশ্ব অন্ধকার ঠেকিল, মুখ নাড়িবার ক্ষমতা ছিল না, বুঝিলাম মেট্রর আমাকে সিগারেটে বিষ মাখাইয়া দিয়াছিল কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং অবশেষে আমি চেতনা হারাইলাম।

প্রবাস যাত্রা।

একদিন জ্ঞান হইল। তখনো গলায় ও ঠোঁটে ব্যথা ও ফোলা আছে। ঘরের বাহিরে চাপা গর্জ্জনের শব্দ শুনিলাম। ঘরটি যেন দুলিতেছিল। তারপর কল চলিবার আওয়াজ কানে গেল। চক্ষু খুলিয়া দেখি বেশ আলো হইয়াছে আমার বামদিকে ছোট গোল একটা ফুকর ছিল তাহার ভিতরদিয়াই আলো আসিতেছিল মাঝে মাঝে ঢেউ আসিয়া ফুকরটিকে ঢাকিয়া দিতেছিল তখন বুঝিলাম যে আমি সমুদ্রের উপর চলিয়াছি। ঘরটি সরু ও ছোট। বড় অপরিষ্কার। আমি যে গদির উপর শুইয়াছিলাম সেখানি অত্যন্ত শক্ত। জাহাজখানি নিশ্চয়ই যাত্রী জাহাজ নয়। আমার সদ্য মৃত পত্নীর বক্ষ হইতে এত শীঘ্র এই জাহাজে কেমন করিয়া আসিলাম? তৎক্ষণাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলি আমার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল আমার স্ত্রীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ের ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত দেখিলাম। কিন্তু তবুও আমার প্রলুব্ধকারীর কতকগুলি কার্য্যের কোন কারণই পাইলাম না। আমার গলার ও ঠোঁটের যন্ত্রণা ও ফোলার জন্যই অতীত ঘটনাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। আমি একঘণ্টার ভিতর বিবাহিত এবং বিপত্নীক হইলাম!

অনেক কষ্টে উঠিয়া বসিলাম। পায়ে একটুও শক্তি ছিল না। সমুদ্রপীড়া আমার হয় নাই কারণ আমি পূর্ব্বে সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়া গিয়াছি। কয়েক মিনিট পরে আমি উঠিয়া অতি কষ্টে দ্বারের নিকট গেলাম। দ্বার বাহির হইতে বন্ধ দেখিলাম। তখন গদির উপর বসিয়া পড়িয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সেই রক্ষাকবচটির কথা মনে পড়িল। সেটী পকেটেই পাইলাম। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেটীকে দেখিতে লাগিলাম। প্রশ্নচিহ্ন আঁকা অনেক লকেট, সেফ্‌টিপিন দেখিয়াছি তাহাদের গঠন এমন মনোহারী নয়। ইহার গঠন অতি বিচিত্র।

এইটিই আমার স্ত্রীর একমাত্র স্মৃতি। সেই "ছহুরা আসিয়াছে" লেখা কাগজটিও পকেটে পাইলাম। এ ছহুরা কে? কেন বা আসিল? বুঝিতে পারিলাম না। হয় ত ইহার দেখা পাইলে সব রহস্য ভেদ করিতে পারিব। কামরার বাহিরে যাইবার বড় ইচ্ছা হইল। চারিদিকে কাল রংএর ধূলো ও আলকাতরা দেখিয়া মনে হইল জাহাজটি কয়লা জাহাজ। আমি উঠিয়া এক টুকরা কাঠ লইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলাম। বাহিরে সমুদ্রগর্জ্জনের শব্দে সে শব্দ ডুবিয়া গেল। আমি তখন প্রাণপণে আঘাত করিতে লাগিলাম তখন দুইজন বলিষ্ঠ আকারের নাবিক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল" কি বাবু? এত গোলমাল কোরছ কেন?"

"গোলমাল কি? আমি বাহিরে যেতে চাই।"

লোকটা হাসিয়া বলিল "তার আর আশ্চর্য্য কি? খোলা হাওয়ায় যেতে চাও?"

"হাঁ।"

"কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার স্বাস্থ্যের হানি হবে। এইখানেই থাকো। ভাল কামরা পেলে বোধ হয় সুবিধা হোত না?"

আমি স্থিরভাবে বলিলাম "একটা উপকার আমার কর। তোমাদের কাপ্তানকে ডেকে দাও। তোমরা কাপ্তানের আদেশে আমায় বন্ধ রেখেছ আমি তাঁর সঙ্গে কথা বোলতে চাই।"

দুজনে আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল তারপর বলিল "তুমি গোলমাল যদি না করতে তাহালও আমরা কয়েক মিনিট পরে তোমায় দেখতে আসতুম।"

আমি হাসিলাম "যাও কাপ্তানকে ডাক।"

"বেশ দরজা বন্ধ করে দেব কিন্তু।"

"তা দাও। তবে না খেতে দিয়ে মেরো না" দুজনে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে দরজা লাগাইয়া দিল তারপর একজন অপরকে বলিল "লোকটা ত বদমায়েস নয়, ওত ভদ্রলোক।"

পাঁচ মিনিট পরে লম্বা দাড়িওয়ালা একজন লোক দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কাপ্তান?"

সে বলিল "হুঁা"

"কোন অধিকারে এখানে আমায় বন্ধ রেখেছ! আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান হয়ে দেখি সমুদ্রের উপর বন্দী অবস্থায়।"

"তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য। সমুদ্রযাত্রায় তোমার উপকার হবে।"

"তা হলে শরীর সারাতে এখানে এসেছি? এ জাহাজের নাম কি?"

"তুমি নিজে বের করে নাও না?"

"তা সে বেশী কথা নয়; কিন্তু কাপ্তানই হও আর যাই হও আমায়বন্দী ক'রবার অধিকার তোমার নেই।"

"হুঁা কর্ত্তা, আমার যা খুশী তাই কোরব। তুমি যদি মুখবন্ধ না কর ত আর দেশ দেখ্‌বার আশাও ছাড়!"

"খুব ভদ্রভাবে কথা বোলতে জান ত তুমি!"

"যে বন্দরে জাহাজ লাগাবে সেখানকার কন্সাল তোমার এ ব্যবহারের প্রতিশোধ দেবেন।"

"আমি ওদের মানি না। আমিই আমার জাহাজের কর্ত্তা।"

"কিন্তু জাহাজ চালান বন্ধ হ'লে অন্যরকম মনে হবে।"

"আমার জাহাজ চলা বন্ধ কোরতে হ'লে তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধির দরকার।"

"আমাকে স্বাধীনতা দিলে, আর কেমন কোরে আমি এখানে এলাম সরল ভাবে সব জানালে তোমার পক্ষে বোধ হয় ভালই হোত।"

"তোমাকে এখানে পাঠান হোয়েছে কেন, আমি তার কি জানি?"

"কে এখানে পাঠাল আমায়?"

"আমি তখন জাহাজে ছিলাম না,—জানি না।"

"এখন আমরা কোন্ সমুদ্রে?

"পরে জান্‌বে। এখন থেকে অত ভেবো না।"

"নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌বার মত কামরাটাও আমায় দেওয়া হয় নি, এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হবার উপদেশ!"

"এ, তো যাত্রী জাহাজ নয়। খাবে কিছু!"

""খাবার আগে একটু বেড়াতে পেলে ক্ষিদে হোত।"

"না, রদ্দুর লাগলে সন্দিগর্ম্মি হবে।"

"এখানে থাকলে দমবন্ধ হ'য়ে মারা যাব যে।"

"সেও ভাল।"

"তাহলে তুমি আমায় স্বাধীনতা দিতে নেহাৎ নারাজ?"

"হাঁ, তোমায় আপাততঃ এখানে থাকতে হবে।"

"কার আদেশে?"

"জানতে পাবে না।"

"ওঃ! ঘুষ খেয়েছ? কিন্তু ভেবে দেখো খুনের সাহায্য করার ফলটা কি।"

"হাঃ হাঃ হাঃ কে প্রতিফল দেবে? তোমার কল্পনা নাকি? যতক্ষণ কাগজ পত্রে গোলমাল না থাকে ততক্ষণ ওরা কিছু বলে না।"

"কিন্তু বিনাপরাধে বন্দী করবার জন্য যদি গ্রেপ্তার করাই তোমাকে?"

"আমার মনে হয় তুমি তা পারবে না বাবু।"

"কেন সরলভাবে সব কথা বল না বাপু?"

"কাকে বে'লব? তোমার কি মাথার ঠিক আছে?"

"পাগল বলে বাইরে যেতে দিচ্ছ না?"

"হাঁ শুনেছি তোমার উপর নজর রাখা দরকার।"

"এটা জেনেও অজ্ঞান অবস্থায় আমায় জাহাজে নিলে?"

"বলেছি ত আমি তখন জাহাজে ছিলেম না, ফিরে এসে তোমায় দেখতে পাই।"

"তাহলে আমার সমুদ্রে হাওয়া খাওয়ার জন্য যে তোমায় ঘুষ দিয়েছে তার নাম জান না?"

"আমি কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে কাজ কোরছি।"

"তোমার কর্তৃপক্ষ? কে তারা? জাহাজের কি নাম?"

"Hanways রা কর্তা। জাহাজের নাম প্রোট্রেন।"

"কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

"উপর হতে আমার প্রতি আদেশ,—সেসম্বন্ধে তোমায় কোন খবর না দেওয়া; আর যতদূর সম্ভব ভাল ব্যবহার করতে।".

"তুমি বুদ্ধিমান, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা কি ঠিক নয় ?"

"না কর্ত্তাদের আদেশ আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"জেনে রেখো তুমি নিজকে খুনের মামলায় জড়াচ্ছ।"

"মিলছে বেশ—তাঁরাও বলে দিয়েছিলেন ঐটাই তোমাতে গোল, জ্ঞান হ'লে তুমি ওই সব বোল্‌বে। আমি চল্লেম। তুমি মনে করতে পার এ যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছ।"

এই কথা বলিয়া নাবিক দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, আমি তবে বন্দী!

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

গান।

—:০:—

যে যাতনা অযতনে,—
মনে মনে মনই জানে;
পাছে লোকে হাসে শুনে,
লাজে প্রকাশ করি নে।

প্রথম মিলনাবধি,
যেন কত অপরাধী;
নিরবধি সাধি প্রাণপণে;—
তথাপি সে নাহি তোষে
আরও দোষে অকারণে!!

৺রামনিধি গুপ্ত।

স্বরলিপি।

[রচনা ও সুর—৺রামনিধি গুপ্ত।* স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।]
(ওর্ফে নিধুবাবু)

মিশ্র সিন্ধু—মধ্যমান।

স্থায়ী।

২´
পা –া ধা পা মা II{–া জ্ঞা রা স রা –া –া –া
যে ০ যা ত না ০ অ য ত নে ০ ০ ০

–া । রা পা মা পা –া –া | মা –া –জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা রা –া –া –া
০ ০ ম নে ম নে ০ ০ ম ০ ন্ ই জা নে ০ ০ ০

|(–া –া । পা –া ধা পা মা)}I –া –া । র্সণা –া ধর্সণা –া ধা I
০ ০ ০ 'যে ০ যা ত না' ০ ০০ এ০এ০ ০ ০ এ

২´ ৩
I –পা মা –জ্ঞা রসা –রা পা –া পা | –া পা –া মা জ্ঞা মপা মা –া |
০ এ ০ এ০ ০ এ ০ এ ০ এ ০ ম নে ম০ নে ০

০ ১
| –া –া –জ্ঞরা রজ্ঞা –মপা –মজ্ঞমা জ্ঞা রা | –া –া –জ্ঞরা রা ণা ধা ণা ধা I
০ ০ ০০ ম০ ০০ ন্০ই জা নে ০ ০ ০০ পা ছে লো কে জা

* কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গানখানি শ্রীধর কথক কর্তৃক রচিত। —লেখিকা।

I{ ণা -া ধা ণা -া -া -া -া | -া ধা র্সা -া -া -া র্সা ণা |
সে ০ ও নে ০ ০ ০ ০ ০ লা জে ০ ০ ০ প্র কা

০ ১
| -ধা ণা -া -া ধা পা -া -া | {(-া -া -া রা ণা ধা ণা ধা)} I
শ্ ক ০ ০ রি নে ০ ০ ০ ০ ০ 'পা হে লো কে হা'

১ ২
I -া -া I সা -া মা -পা ধা I -া ণর্সা ণা -া ধণধা -পা পা -া পা |
০ ০ ০ এ ০ এ ০ এ ০ এ০ ০ ০ এ০০ ০ এ ০ এ

৩ ০
| -া পা -া পা ধা -া -া -া | ণা র্সা -ণধা পমা -ধা -ণর্সা ণা ধপা মজ্ঞা |
০ এ ০ লা জে ০ ০ ০ প্র কা ০শ্ ক ০০ ০০০ রি০ নে

১
: -া -রসা -রা র্সণা -রর্সণা ধা পা মা II
০ ০০ ০ 'যে ০০০ যা ত না'

অন্তরা।

২
মা মা মা পা -া II{ -া মা মা জ্ঞা রা -া -া রা |
প্র থ ম মি ০ ০ ল না ব ধি ০ ০ যে

৩ ০
| জ্ঞা রা ম -া -া জ্ঞ রা সা | রা -া ণ্া রা সা রা রা জ্ঞা |
ন ক ত ০ ০ অ প রা ধী ০ নি র ব ধি সা ধি

১ ১
| (র্জ্ঞা মপা -া মা মা মধা পা -া)} I -া রা জ্ঞা মা পা -া -া I
প্রাণ পণে ০ 'প্র থ ম০ মি ০' ০ প্রা ণ প ণে ০ ০০

২´ ৩ ·

I মা মা ণ্ণা ধা ণণর্সা নর্সর্র্সা না র্সর্সা | –া না না র্সনা র্সা –া –া না |
এ এ এ এ এ০০ এ০ ০ ০ এ এ ০ ০ যে ন ক ০ ত ০ ০ অ

০

| র্সনর্সর্র্সণর্সা ণর্সণা ধা –া পর্সা ণধা পা পধণধপধপমগা |
প ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা০ ০ ধা ০ নি র০ ব থি০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

১

| মপা পণধা –পধা না –র্সর্রা র্সনধনা র্সা –া I
সা০ থি০০ ০ ০ প্রা ০ ণ প০০০ ণে ০

২´ ৩

I{ –া –া মা পা মা পা –া –া | মা জ্ঞা রা সা –া –া রা –জ্ঞজ্ঞা |
০ ০ ত থা পি সে ০ ০ না হি তো যে ০ ০ আ র্ ও

০ ১

| রা মা –া –া জ্ঞা রা সা রা | (–া –া মা ণ্ণা ধা –া –া ধা) }I
দো ষে ০ ০ অ কা র ণে ০ ০ 'ত বু সে ০ ০ তো'

১ ২´

I –া –া | মা ণ্ণা ধা –া ধা I –া ধা –া ণা –ধণা পধণর্সা –া ধা |
০ ০ ০ এ ০ এ ০ এ ০ এ ০ এ ০০ এ০০০ ০ এ

৩ ০

| –পা পা –া পা –ধধা ণা র্সা –া | –া ণা –ধা পমা –ণধা –ণর্সণা –ধপা জ্ঞা |
০ এ ০ আ র্ও দো ষে ০ ০ অ ০ কা রু০০ ০০০ ০র ণে

১ ৩

| –া –রসা –রা ণ্ণা –ধর্সণা ধা পা মা II II
০ ০০ ০ যে ০০ ০ বা ড় ন

রাজতরঙ্গিণী

তৃতীয় তরঙ্গ।

রাজা সন্ধিমতী কাশ্মীরসিংহাসন পরিত্যাগ করিলে পর মন্ত্রীগণ গান্ধারে গমন পূর্ব্বক মহা সমারোহে মহামতি মেঘবাহনকে কাশ্মীরে আনায়ন করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইয়াছিল। মেঘবাহন উত্তরকালে সহৃদয় ও দয়ালু নৃপতিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। জীবে তাঁহার অসীম করুণা। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রখ্যাতনামা ভিক্ষুগণও তাঁহার ন্যায় জীবে দয়াশীল ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার রাজ্যে জীবহত্যা এক কালে নিবারিত হইয়াছিল। ব্যাধ প্রভৃতি যে সকল জাতির পশু হননই জীবিকা, তিনি অর্থদান করিয়া তাহাদিগের জীবনধারণের উপায় করিয়া ছিলেন। তিনি দুইটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মেঘবন নামক একটি গ্রামের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল ব্রাহ্মণগণ এই গ্রামে বাস করিতেন। মেঘমঠ নামক তিনি একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করেন তাঁহার মহিষী অমৃতপ্রভা বৌদ্ধদিগের জন্য তাঁহার নামানুযায়ী অমৃতভবন প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যতম মহিষী যুকদেবী সপত্নীর যশঃ গৌরব নির্জ্জিত করিবার মানসে নদবন নামক এক অপূর্ব্ব বিহার নির্ম্মাণ করান। ইহার একাংশে বৌদ্ধ ছাত্রগণে জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, অপরাংশে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণিগণ সপরিবারে বাস করিত। অপর মহিষী ইন্দ্রদেবী ইন্দ্রদেবী-ভবন নামক একটি সুউচ্চ সমচতুষ্কোণী মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। আদম, মাম্মা প্রভৃতি অপরাপর মহিষীগণ সপত্নীগণের উদাহরণ অনুযায়ী তাঁহাদিগের নিজ নিজ নামানুসারে বহু মঠ ও বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্মীরে তৎকালে বহু সৎকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। রাজা অহিংসা পরমধর্ম্ম প্রচার কায় ও অন্যান্য রাজন্যবর্গকে জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে বিজয়-অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি লঙ্কাদ্বীপে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। লঙ্কায় যখন তিনি রোহনা নামক পর্ব্বত পাদমূলে উপস্থিত হন, সৈন্যগণ যখন তালীবন ছায়ায় বিশ্রাম করিতে ছিল, বিভীষণ পারিষদ সমভিব্যাহারে মেঘবাহনের সম্বর্দ্ধনা সঙ্গ.৫ করিতে করিতে তাঁহার

সমীপে বন্ধুভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লঙ্কেশ্বর কাশ্মীরাধিপতিকে সসম্মানে লঙ্কায় অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ উপচারে অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাংসলোলুপ রক্ষগণকে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর বিভীষণ, কাশ্মীর রাজাকে পতাকা উপহার প্রদান করেন। এই সকল পতাকায় বিনম্রাবনত রাক্ষসগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এমন কি অদ্যাপি যখন কাশ্মীর রাজ কোন পর্ব্বোপলক্ষে বহির্গত হন, পরধ্বজ নামক এই সকল পতাকা সেই শোভাযাত্রার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে। তিনি এই প্রকারে রাক্ষস রাজ্যে জীবহত্যা নিবারিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও বনানী মধ্যে কেহই জীবহত্যা করিতে সমর্থ হইত না। আমরা এই অতি সদাশয় দয়ালু নৃপতির কাহিনী জঘন্য স্বভাব ব্যক্তিগণ সমক্ষে বিবৃত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, কিন্তু ঋষিগণ পুণ্যকাহিনী বিবৃত করিবার কালে শ্রোতাগণের সন্তোষ অসন্তোষের বিচার রাখেন না। রাজা চতুস্ত্রিংশৎ বর্ষ, রাজত্বের পর দেহত্যাগ করেন।

তদীয় পুত্র শ্রেষ্ঠসেনা পিতৃসিংহাসনারূঢ় হন। ইনি প্রবরসেনা ও তুঙ্গজিন নামেও অভিহিত হইতেন। ইনি মাতৃচক্র, প্রবরেশ্বর ও আরও অনেক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু রাজাকে তিনি শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। ত্রিংশ বৎসর সুভাবে প্রজাপালনান্তর শ্রেষ্ঠ দেহত্যাগ করেন। ইনি সর্ব্বদা তাঁহার মণিময় তরবারি ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে হিরণ্য পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অপর পুত্র তোরামান ভ্রাতৃ রাজ্যশাসনে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি ভল্লরাজ প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহার স্থগিত করিয়া দীনরা নামক মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁহার এই কার্য্যে রাজা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন। তোরামানের সহধর্ম্মিণী ইক্ষাকুবংশীয় বরেন্দ্র রাজকন্যা অঞ্জনা স্বামীর সহ স্বইচ্ছায় কারাবাসিনী হন। তদবস্থায় তিনি দোহদবতী হন। অঞ্জনা আসন্নপ্রসবা হইলে গোপনে এক কুম্ভকারালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন; তথায় তাঁহার এক পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট হয়। অতি যত্নে কুম্ভকারগৃহিণী সন্তানকে নিজ পুত্ররূপে লালন পালন করে। কুম্ভকার ও তাহার পত্নী ব্যতীত অন্য কেহ সেই বালকের প্রকৃত পিতৃমাতৃ তত্ত্ব অবগত ছিল না। বালকের জননীর অনুরোধে সেই সন্তানের নামকরণ

পিতামহের নামানুযায়ী হইয়াছিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সাধারণ ইতর ভাবাপন্ন বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল ও সুযোগ ও সুবিধামত সমৃদ্ধ বালকগণের সঙ্গ লাভের চেষ্টা করিত। ক্রীড়া কালেও সে নিজে রাজা সঙ্গীগণকে প্রজারূপে পালন করিবার অভিনয় করিত এবং শিষ্টকে পুরস্কৃত ও দুষ্টকে দণ্ড প্রদান করিয়া তাহার রাজ প্রবৃত্তির পরিচয় দিত। কুম্ভকার মৃণ্ময় পাত্র প্রস্তুত করিবার জন্য যে মৃত্তিকা দান করিত সে তদ্বারা শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিত। একদা বালকের মাতুল জয়েন্দ্র তাহাকে এরূপ ক্রীড়ারত দেখিয়া এবং বালকে তাঁহার ভগ্নিপতির সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বালকের পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। বালক তাঁহার পরিচয় অবগত ছিল না। তিনি তাঁহার নাম বালকের নিকট প্রকাশ করিলেও কোন ফলোদয় হইল না। ক্রীড়াবসানে বালক যখন নিজালয়ে প্রস্থানপর হইল, জয়েন্দ্র তাহার অনুগামী হইলেন এবং তথায় তাঁহার ভগিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। বহুদিন পরে এরূপ ভাবে ভ্রাতাভগিনীর সাক্ষাৎ এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। তাঁহাদিগকে এইরূপ ভাবে ক্রন্দননিরত দেখিয়া বালক কুম্ভকারগৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'মা ইনি কে?' কুম্ভকার গৃহিণীকেই বালক মাতৃ সম্বোধন করিত। কুম্ভকারগৃহিণী উত্তর করিল "ইনি তোমার গর্ভধারিণী মাতা ও উনি তোমার মাতুল। তৎশ্রবণে বালক ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল 'সে কি?' অমূল ঘটনা বিবৃত করিলে বালক তথায় তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মাতুল সহ স্বদেশে আগমন করিল এবং বহু চেষ্টায় সে পিতার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু হতভাগ্য পিতা সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মাতা স্বামীর সহগমনে উদ্যতা হইলে সন্তান তাঁহাকে নিরস্ত করিল কিন্তু নিজে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে অসমর্থ হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইল। রাজা হিরণ্য তৎকালে দ্বাত্রিংশ বৎসর দুই মাস রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলেন।

এই কালে উজ্জয়িনী নগরে মহাপরাক্রম বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অপর নাম হর্ষ। তিনি একচ্ছত্রপতি রাজা ছিলেন। শক ও ম্লেচ্ছগণকে তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার সভায় বিদ্বজ্জন সমাদৃত হইতেন এবং তিনি বিবিধ শিল্প কলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশ্বযশাঃ কবি মাতৃগুপ্ত তাঁহার

সভায় তৎকালে অবস্থান করিতেছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাতৃগুপ্ত বহু রাজ সভায় জয় লাভ করিয়া অবশেষে উজ্জয়িণীতে উপস্থিত হন। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সাহিত্য-স্পৃহা ও ন্যায় বিচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রভুরূপে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় ক্রূর নীচাশয় কলহপরায়ণ ও দাম্ভিকগণের স্থান ছিল না। রাজা প্রকৃতিবর্গের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ ভাবে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অকাতরে দান করিতেন। গুণীর গুণগরীমা তাহার নিকট অপুরস্কৃত থাকিত না। তিনি হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ ও গঙ্গ বারির ন্যায় পবিত্র ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ কেহই অসূয়াপরবশ ও পরনিন্দাপরায়ণ ছিল না। আগন্তুকবর্গ তাঁহার সভায় আদৃত হইত। তিনি কোন স্বার্থান্ধের যুক্তি গ্রহণ করিতেন না; এমন কি অতি নীচাশয় ব্যক্তিও তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইত। মাতৃগুপ্ত এইরূপ রাজার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন 'এতদিনে আমি মনোমত নৃপতির সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি।' মহাকবি সেই উন্নতমনা সংযতচরিত্র রাজার পরিচর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া দেশ-ভ্রমণ স্পৃহা ত্যাগ করিলেন। রাজসভায় সকলেরই অবারিত দ্বার; মাতৃগুপ্ত প্রতিদিন রাজসভায় উপস্থিত হইতেন কিন্তু রাজাদেশে, সভা পণ্ডিত বিদ্বজ্জন মধ্যে তাঁহার স্থান নিরূপিত হইল না। বিদ্বান হইলেই উন্নতমনা হইবে এরূপ কোন কথা নাই, রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া মাতৃগুপ্তের সততা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এবং পরীক্ষা মানসেই রাজা কবির প্রতি প্রথমে কোন প্রকার অনুগ্রহই প্রকাশ করেন নাই। মাতৃগুপ্তও তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া অনন্যমনে রাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন,—তাঁহার পরিচর্য্যায় অসন্তব কিছু পরিলক্ষিত হইত না, তাচ্ছিল্যও প্রকাশ পাইত না, রাজ-অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেও রাজা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন না—তীক্ষ্ণ ধী মাতৃগুপ্ত ছায়ার ন্যায় প্রভুর ইচ্ছার অনুগমন করিতেন। রাজঅন্তঃপুর-পরিচারিকাবর্গের প্রতি তিনি কখনও [illegible]ত করেন নাই, ইর্ষান্বিত দাসগণের সহিত তিনি কোন সংস্রব রাখিতেন না। তিনি রাজ সমক্ষে কখন প্রগলভতা প্রকাশ করেন নাই,—সভাসদের মধ্যে রাজকার্য্যচর্চ্চাকারীর অভাব ছিল না,—তিনি রাজার নিকট তাহাদের গুপ্ত মন্তব্য কোন দিন আভাসেও নিবেদন করেন নাই। প্রভুর কৃপালোলুপ সভাসদগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ

করিলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না ;—তিনি নিজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন,—অন্যের গুণাবলী মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিতেন এবং নিজের গুণ যাহাতে পরিস্ফুট ও পরিলক্ষিত হয় সেরূপ কার্য্য তাঁহার করণীয় ছিল। সভাসদগণকে তাঁহার গুণে তাঁহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইয়াছিল,—এইরূপে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় মহাকবি মাতৃগুপ্ত সাধারণভাবে একটি বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভ্রমণে বহির্গত হইবার কালে মাতৃগুপ্তের মলিন বেশ, ছিন্ন বস্ত্র, অতিকৃশ দুর্ব্বল দেহ দর্শন করিয়া ব্যথিত হইলেন। সামান্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মাতৃগুপ্তের ন্যায় একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত, অধ্যবসায়ী, উপযুক্ত ব্যক্তির কি দুর্দ্দশাই না করা হইয়াছে! বিদেশে বন্ধুহীন, যত্ন করিবার তাহার কে আছে? সে শীততাপে কষ্ট পাইলেও কেহ দেখিবার নাই। রোগযন্ত্রণায় কাতর হইলেও কেহ ঔষধ পথ্য প্রদান করিবার নাই—দুঃখে কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার নাই। রাজা চিন্তা করিলেন কর্ম্মক্লান্ত দেহে বিশ্রাম প্রয়াসী হইলে তাহাকে শুশ্রূষা করিবার কে আছে? এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে ব্যক্তি তাঁহাকে সেবা করিতেছে,—তাহাকে তিনি প্রতিদানে কি দান করিয়াছেন,—উল্লেখযোগ্য কিছুই না! মাতৃগুপ্তের উপযুক্ত পুরস্কার কি,—সাধারণ অভাব নিরাকরণ ইহার যোগ্য প্রতিদান নহে—সেই পুরস্কার নির্দ্ধারণের চিন্তাতেই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া শীত ঋতুর আবির্ভাব হইল। প্রচণ্ড শীত সে বৎসর। চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন; দিবা পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল, সূর্য্যদেব গগণে নাম মাত্র দেখা দিয়া সমুদ্রের বাড়বানলের তাপে উষ্ণ হইবার আশায় সাগরবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ব্যস্ত।

গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন,—কক্ষে অগ্নি আধারে জ্বলন্ত অঙ্গার উজ্জ্বল রহিলেও দীপশিখা শীতবাতে নিষ্প্রভ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়াছে। তিনি দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য রক্ষীগণকে আহ্বান করিলেন কিন্তু তাহারা সকলেই নিদ্রাভিভূত। রাজা তখন উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"কে আছ?" উত্তর হইল "আমি মাতৃগুপ্ত।" রাজ-আদেশে মাতৃগুপ্ত সজ্জিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দীপশিখা বর্দ্ধিত করনান্তর প্রস্থানোন্মুখ হইলে রাজা তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। শীতে ও ভয়ে মাতৃগুপ্ত তখন কম্পিত কলেবর। রাজা প্রশ্ন করিলেন "এখন কোন যাম?" মাতৃগুপ্ত উত্তর করিলেন "ত্রিযামা শেষ যামে

উপনীত!" রাজা বলিলেন "কি প্রকারে তাহা তুমি অবগত হইলে—তুমি কি সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিতেছ ?"

আত্ম অবস্থা নিবেদনের সুযোগ সমুপস্থিত এইরূপ বিবেচনায় মহাকবি তৎমুহূর্ত্তেই একটি শ্লোক রচনা করিয়া বলিলেন,—অনন্ত উৎকণ্ঠা-সমুদ্রে নিমজ্জিত যে, শীতে যে আর্ত্ত—ক্ষুধায় যাহার কণ্ঠ ক্ষীণ, হৃদয়ের সন্তোষ ব্যক্ত করিতে অসমর্থ—ওষ্ঠ কম্পন মাত্রই সার,—তাহার সান্নিধ্য হইতে যেবিতা নিদ্রা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর ন্যায় সুদূরে পলায়ন করিয়াছে। সুশাসিত রাজ্যের ন্যায় রজনীও আমার নিকট দীর্ঘ! রাজা কবির দুঃখ শ্রবণে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিতে বলিলেন। গুণীর গুণকে এরূপ ভাবে উপেক্ষা করা হইতেছে,—সে চিন্তা রাজাকে ব্যথিত করিল, কিন্তু কবির উপযুক্ত পুরস্কার কি, তাহা তিনি অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া কাতর হইলেন। অবশেষে তাহার স্মরণ হইল—ভূস্বর্গ কাশ্মীর সিংহাসন এখন শূন্য,—ইহাকে কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ়কল্প হইয়া,—সেই রাত্রেই কাশ্মীর রাজ্যে গুপ্তভাবে দূত প্রেরণ করিলেন,—দ্বিধাহীন হইয়া মাতৃগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করিতে কাশ্মীরের মন্ত্রীগণকে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিলেন। যথারীতি লিখিত আদেশ পত্র স্বয়ং মাতৃগুপ্তই বহন করিয়া লইয়া যাইবেন—তাহা দূতগণকে বিজ্ঞাপিত করিতে বলিলেন। দূতগণ প্রস্থান করিলে রাজার আর সে রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হইল না—তিনি লিখিত-আদেশ প্রেরণের উৎকণ্ঠায় অবশিষ্ট রজনী বিনিদ্র ভাবে যাপন করিলেন।

অন্যপক্ষে মাতৃগুপ্ত আশাহত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন ;—রাজ সমীপে তাহার আত্ম-নিবেদন বৃথা ও কেবল লজ্জার কারণ হইল—মহারাজার কৃপা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে ক্রটী করি নাই, কিন্তু আমার সকল আশায় অন্ত হইল। আশাই অশেষ অশান্তির কারণ, আশাকে সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দিয়া আমি মহাশান্তিতে পর্য্যটনে বহির্গত হইব। অন্যের নিকট শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম—রাজা বিক্রমাদিত্য সেবা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যশঃ হইতে সকল সময় সত্য নির্ণীত হয় না। রাজা অতি মেধাবী, তিনি অনুগৃহীতকেই অর্থ প্রদান করেন। ইহার জন্য রাজা নিন্দনীয় এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে কারণ আপনার কর্ম্মের দ্বারাই

মনুষ্যের ভাগ্য নিরূপিত হয়, মানুষ আত্মভাবে দুঃখ ভোগ করে। রত্নাকর বেলাভূমিতে মূল্যবান রত্নরাজি নিক্ষেপ করেন কিন্তু কেহ যদি বিপরীত ঝটিকাতাড়িত হইয়া সেই রত্নপূর্ণ উপকূলে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হয়, সে দোষ সমুদ্রের নয়—হতভাগ্যের অদৃষ্টের। যদি কেহ রাজদান অভিলাষী হয়, তাহার উচিত রাজ পারিষদের পরিচর্য্যা করা কারণ রাজ-হৃদয় আকর্ষণ করা অতি কঠিন কার্য্য! স্বয়ং মহাদেবকে যে উপাসনা করে তাহার ভাগ্যে ভস্মলাভই সার হয় আর যে শিববাহন বৃষের পরিচর্য্যা করে সে প্রতিদিন স্বর্ণলাভ করিতে সমর্থ হয়। আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ এরূপ কিছু অনুষ্ঠিত হয় নাই যাহাতে রাজা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। সাধারণ দ্বারা ঢক্কানিনাদিত না হইলে রাজদৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। কেবল পরিচর্য্যার ইচ্ছাই রাজদ্বারে যথেষ্ট নহে,—নীচও সাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হইলে রাজ-অনুগ্রহ লাভ করে। বারিবিন্দু সমুদ্রবক্ষে অবস্থান কালে আত্মসত্বা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না—তাহার অস্তিত্ব কেহই অনুভব করে না কিন্তু যখন সেই বারিবিন্দুই মেঘ দ্বারা নীত হইয়া পুনঃ তরঙ্গবিক্ষোভিত সমুদ্র বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই মুক্তার ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া কবি প্রভুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। সুধীজনেরও সদ্বিবেচনা দারিদ্র্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রজনী প্রভাত হইল। রাজা সভায় অধিষ্ঠিত হইলেন। দৌবারিককে মাতৃগুপ্তকে রাজসভায় আনয়ন করিবার আদেশ হইল। তৎপরে কবিবরকে রাজ সকাশে উপস্থিত করা হইল। কবি বিনীত ভাবে রাজাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান। রাজা মহাফেজকে আদেশ-পত্র প্রদান করিতে ইঙ্গিত করিয়া মাতৃগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কাশ্মীরের পথ অবগত আছ কি? এই লিপি কাশ্মীরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রীকে প্রদান করিতে হইবে,—পথি মধ্যে এ পত্র পাঠ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর।"

মহারাজের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে—এরূপ অঙ্গীকার করিয়া মাতৃগুপ্ত রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সৌভাগ্যদেবী তাঁহাকে বরমাল্য দান করিতে বিস্তৃত হস্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন—মাতৃগুপ্তের নিকট তাহা তখনও অজ্ঞাত! রাজা যথারীতি রাজকার্য্যে মন নিবেশ করিলেন। এরূপ নিঃসহায় ও বন্ধুহীন ভাবে মাতৃগুপ্তকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন, মাতৃগুপ্তের ন্যায় গুণবান ব্যক্তিকে হেয় পত্রবাহক রূপে নিযুক্ত

করায় সকলেই রাজাকে নিন্দাভাগী করিলেন। নির্ব্বোধ রাজা, অবশেষে কিনা যিনি সৌভাগ্যের আশায় তাঁহাকে দিবারাত্র সমভাবে অক্লান্ত সেবা করিলেন, তাঁহাকেই এইরূপ শ্রমসাধ্য ক্লেশকর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভৃত্যেরা ভবিষ্যত সৌভাগ্যের আশাতেই প্রভুর সেবা করিয়া থাকে কিন্তু প্রভু, ভৃত্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল সেবাতেই তাহার সার্থকতা মনে করেন। গরুড়ের ভয় হইতে ত্রাণ লাভের আশায় নাগগণ নারায়ণের সেবা করে কিন্তু নারায়ণ নাগগণকে গুরুভার বহনে সমর্থ বিবেচনা করিয়া পৃথিবীর ভার ধারণে আদেশ করেন। এই বহুগুণে বিভূষিত বিদ্বান, কবিবর রাজসভায় পণ্ডিতগণকে সমাদৃত হইতে দেখি। রাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজার মনুষ্য চরিত্রে জ্ঞান অতি অল্প, নতুবা কেন তিনি সুবিদ্বান মাতৃগুপ্তকে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন! শিখি মেঘে ইন্দ্রধনু দর্শনে আনন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে কিন্তু জলদ প্রতিদানে নিছক বারিবিন্দু ব্যতীত তাহাকে কিছুই দান করে না।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য

[শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা]

[সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন উপলক্ষে বরিশালে গিয়াছিলেন। বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা হইতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণের উত্তরে শরৎ বাবু বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আমি বক্তা নই। কিছু বল্‌তে আমি আদপেই পারিনে। ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, আর বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার

বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, কিন্তু কিছুদিন থেকে লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্য-সেবাই বড় সার্থকতা মনে হ'ল না। আমাদেরই সাহিত্যব্যাপারে কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে! সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হ'য়ে তার ভিতরের বাসনার কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে কাজে চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিকই মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিষ দেবার যো নেই। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের Church আছে, Navy আছে Army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাওয়ার যো নেই, ওদিক যাবার যো নাই, কোনদিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে! তারই মধ্যে যে একটু আধটু পারে সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ভেবে ভেবে যদি বা একটা প্লট ঠিক করি তার নায়ককে ভেবে ভেবে বামুন ক'রতে হবে। কায়েতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রাখার যো নেই—তা'হলে সমাজ তেড়ে উঠ্‌বে।

আর এক কথা, স্বাধীনতার মানে অরাজকতা anarchy নয়। রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। "সিডিশন" (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। আমার মনে হয় বড় সাহিত্যিক এখন আমাদের হবে না। রাজনীতিতে, ধর্ম্মে আচারে যে দিন আমাদের হাতবাঁধা পা-গুটানো থাক্‌বে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখ্‌তে পারবো, সেদিন বুঝ্‌ব সাহিত্য লিখ্‌ছি! বড় কথা বল্‌বার আমার শক্তি আছে। দু-বছর লেখা আমার বন্ধ। যেদিন আপনাদের মন চাইবে বড় আদর্শ, মুক্তির আনন্দ সেদিন বাস্তবিকই আনন্দ পাব। সকলের যদি বন্ধন-খসানোই আদর্শ মনে হয়, তবে আমিও তাই করব। আপনারাও যদি সাহায্য করেন, তবেই হবে। আমার ইচ্ছে এই, আমার কামনা এই, যেন এর চেয়ে বড় সাহিত্য লিখ্‌তে পারি। আমি লিখ্‌তে চাই মুক্তির সাহিত্য। এতে আপনাদের আনুকূল্য ও সহানুভূতি চাই, তবেইত সফল হব। আমি সামান্য যা কিছু লিখি তাতে কত সময় কত গালাগালি খাই। সমাজ একদিন গালাগালি দেবে না—অনুকূল

হবে; পারিপার্শ্বিক অবস্থা আশানুরূপ হয়ে উঠ্‌লে, যদি বেঁচে থাকি, সেইদিন হয়ত বড় সাহিত্য রচনা করতে পারবো। আর এখন যা লেখা হয়েছে, তা—মন্দ কি? ভালই হয়েছে। (সকলের হাস্য)

—তরুণ, জ্যেষ্ঠ।

মোগল-সন্ধ্যা

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—দরবারকক্ষ কাল—প্রভাত।

জাহান্দার ও জুলফিকার।

জাহান্দার। জুলফিকার খাঁ! এ রাজ্যের সম্রাট কে?—বলো—

জুলফিকার। (একটু আশ্চর্য্য হয়ে) বেয়াদপি মাফ করবেন, আজ এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

জাহান্দার। বলো, আমার প্রয়োজন আছে।

জুলফিকার। জাহাপনাই এ দুনিয়ার মালিক।

জাহান্দার। তবে কার হুকুমে এ দুনিয়াটা চলবে?

জুলফিকার। আপনারই হুকুমে, জাঁহাপনা।

(ইমতিয়াজ প্রবেশোদ্যত)

জাহান্দার। আহানকে বন্দী করেছ?

জুলফিকার। হাঁ করেছি খোদাবন্দ।

জাহান্দার। যখন সিংহাসনেই বসেছি তখন পুতুল সাজতে পারব না, জুলফিকর খাঁ। তোমার বিচার হবে—আহানকে বন্দী করবার আদেশ আমি দিয়েছিলাম?

(ইমতিয়াজের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। তুমি দেও নি, সম্রাট্ কিন্তু আমিই দিয়েছি।

জাহান্দার। অধিকারের একটা সীমা আছে, সম্রাজ্ঞী। যাও, জুলফিকার, এবার তোমায় ক্ষমা করলুম—সাবধান।

(জুলফিকারের কুর্ণিস করিয়া প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। ভেবেছিলুম সম্রাজ্ঞী হয়েছি, রাজকার্য্যেও আমার অধিকার আছে—সে আমার ভুল—বাদশার বিলাসের লীলা পূর্ণ করবার জন্য ইমতিয়াজ বেগম হয়েছে। এত অপমান! বাদসা দয়া ক'রে বেগম করেছ—এ দয়া ত যেচে আমি ভিখারীর মত নেই নি।

এ রইল তোমার কোহিনুর মণি—ইমতিয়াজের বেগম সাজবার পালা শেষ হয়ে গেছে।

(মুকুট জাহান্দারের পায়ের কাছে রেখে)

(আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে)

জাহান্দার। ইমতিয়াজ,—তোমার চোখের কোণে, এ কি শিশিরের মত টল্ টল্ করছে? হৃদয়ের ব্যথা এখনি গলিত নীহারের মত ঐ ইন্দীবর আঁখি দুটী হতে অবিরল ধারে প্রবাহিত হয়ে আসবে। তোমার চোখে জল? ইমতিয়াজ!

ইমতিয়াজ। না বাদশা! তোমার জিনিষ তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি তাতে আমার চোখে জল আসবে কেন?

(আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে)

জাহান্দার। (মুকুট তুলে হাতে নিয়ে) এসো, এই নাও আমিই তোমায় পরিয়ে দিচ্ছি।

কি বেদনা ভরা মানুষের জীবন—বেদনার অনন্তলহরী গুণে গুণেই জীবনের অবসান এসে পড়ে। জীবন আঁধারময়। সুখের আশা এ আঁধারে আলেয়ার আলোটুকু জ্বেলে—জীবনকে আরও দুর্ব্বিসহ করে তোলে।

ইমতিয়াজ তোমায় ভাল বেসেছি, তোমার ঐ কালো আঁখিতারার আবেশ সাগরে সব ডুবিয়ে দিয়েছি, তবু কেন বিরাট হাহাকার সমস্ত জীবনটাকে দাবানলের জ্বালায় পুড়িয়ে দিচ্ছে—জানি না এ শূন্যতা আমার কিসে ভরবে,—

ইমতিয়াজ। জীবন একটা সুখের খেলা বাদশা। এ সারা আলোর জগৎ; যখন যে রঙের কাচের ভিতর দিয়ে দেখবে, সে রঙ্ তখনি এতে প্রতিফলিত হবে। তুমি ভেবে ভেবে একে দুঃখের করে তুলচো।

জোহেরা সিরাজী লে আও।

(জোহেরার প্রবেশ)

জাহান্দার। হাঁ মাঝে মাঝে কব বাত করে কে আমায় পাগল করে তোলে!

ইমতিয়াজ, এ সিরাজী আমার সকল বেদনা দূর করে দিতে পারবে?

ইমতিয়াজ। হাঁ, পারবে।

জাহান্দার। তবে দাও—(এক গ্লাস পান করে) আর এক গ্লাস (পান করা) একেবারে ডুবে যাবে কোন হায়ার. জুলফিকর খাঁকে বোলাও—বাঁদী, তুই গাইতে পারিস্?

বাঁদী। হাঁ পারি, জাহাপনা।

জাহান্দার। নাচতে পারিস?

বাঁদী। নাচতে পারতুম কিন্তু আর পারব না জাহাপনা, মাপ করবেন।

ইমতিয়াজ। কেন কি হয়েছে তোর?

বাঁদী। সে শুনে আর কি হবে—ঐ সেই কাণার ছেলেটা চিন্‌কালিচ্ খাঁ আমায় পালকী থেকে নামিয়ে মার দিয়েছে। আগের দিনে বেগমদের বাঁদীর কত আদর ছিল, কত ক্ষমতা ছিল এখন সব শেষ—যে না বেগম তেমনি বাঁদী।

ইমতিয়াজ। চুপ কর্ জোহেরা। যা, তোকে আর গাইতে হবে না।

(জোহেরার প্রস্থান)

জাহান্দার। কে চিনকালিচ খাঁ অপমান করেছে এত সাহস তার!

(জুলফিকর খাঁর প্রবেশ)

জুলফিকর। জাহাপনা!

জাহান্দার। চিনকালিচ খাঁর স্পর্দ্ধা বড়ই বেড়েছে, বেগমের বাঁদীকে অপমান! জুলফিকার! তাকে বলবে—যে তার বিরুদ্ধে—অভিযোগ আছে—আমি সাক্ষাৎ আর সদুত্তর চাই।

জুলফিকর। যে আজ্ঞে, সম্রাট্ !

জাহান্দার। আর একটা কথা আজ হতে সমস্ত রাজকার্য্য সম্রাজ্ঞীর ইমতিয়াজের নামে পরিচালিত হবে। রাজমুদ্রায় সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকবে, বুঝলে। সকল ক্যজেই, জুলফিকর খাঁ! তোমাকে সম্রাজ্ঞীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে—দেখো যেন অন্যথা না হয়।

জুলফিকর। যে আজ্ঞে,—জাহাপনা !

ইমতিয়াজ। আমার আদেশ পালন করতে গিয়ে তোমাকে অনেক রূঢ় কথা শুনতে হয়েছে জুলফিকর খাঁ! অসন্তুষ্ট হয়ো না।

জুলফিকর। না বেগম সাহেবা! কিছু মাত্র না।

(হামিদ খাঁর প্রবেশ)

হামিদ। (কুর্নিশ করিয়া) খোদাবন্দ! একটা জরুরী খবর আছে।

ইমতিয়াজ। কি খবর হামিদ ?

হামিদ। বাংলা থেকে গুপ্তচর সংবাদ এনেছে—যে শাহজাদা আজিমের পুত্র ফররুকসিয়ার বাংলা ও বিহারের সুবাদার দুজনের সহায়তায় দিল্লী আক্রমণ করবার উদ্যোগ করছে।

ইমতিয়াজ। এ কি সত্য জুলফিকর খাঁ ?

জুলফিকর। হাঁ আমিও শুনিছি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি—এত সাহস তাদের পক্ষে সম্ভব নয়—সে জন্যই এ খবরটা আপনাদের জানান প্রয়োজন মনে করি নি।

জাহান্দার। সুবাদার দুজন কে ? জুলফিকর !

জুলফিকর। হোসেন আর আবদুল্লা।

ইমতিয়াজ। তুমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। কত সৈন্য যুদ্ধে যেতে পারবে তা আমায় জানাবে।

জাহান্দার। যাও প্রস্তুত হও, আমিই সৈন্য পরিচালনা করব।

জুলফিকর। যে আজ্ঞে—(কুর্নিশ করিয়া চিন্তিত মনে প্রস্থান)।

ইমতিয়াজ। (হামিদকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া) দাঁড়াও হামিদ !

(হামিদের কুর্নিশ করিয়া অবস্থান)

জাহাঙ্গীর। এ শুধু গোলযোগের সূত্রপাত,—যাই দেখি কি হয়।

(জাহাঙ্গীরের প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে হামিদ! কুসুম কোথায় জান—

হামিদ। হাঁ জানি সম্রাজ্ঞী! সে দিল্লীতেই আছে।

ইমতিয়াজ। তাকে এখুনি বন্দী করবে, তা না হলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। আরও একটা কাজের ভার তোমায় দিচ্ছি, শুনে রাখো। ঐ জুলফিকার খাঁর উপর তোমার দৃষ্টি রাখতে হবে। যাবার সময় তার অন্তরের উত্তেজনার দীপ্তি মুখে ফুটে উঠেছিল, কেমন একটা ক্রুর—ক্ষুরধার হাসি ওর ঐ চাপা ওষ্ঠের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল।

হামিদ। হাঁ সম্রাজ্ঞী।

ইমতিয়াজ। ও হাসির অর্থ বড় ভাল নয়। মনে হচ্ছে যেন সে একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে হামিদ! তার প্রতিপদক্ষেপ তোমায় লক্ষ্য করতে হবে, এ কাজ তুমি পারবে?

হামিদ। হাঁ নিশ্চয়ই পারব।

ইমতিয়াজ। দেখো বিশ্বাসঘাতকতা করো না,—যদি পার পুরস্কার পাবে।

(হামিদ কুর্নিশ করিলে পর ইমতিয়াজের প্রস্থান)

হামিদ। এ জীবনকে একটা নূতন পথে চালিয়ে দিতে হবে। শাহজাদা জাহানের কথার প্রতিধ্বনি এখনও আমার কাণে বাজছে যে পথে আমি চলেছি সে পথে আমার মঙ্গল নেই। মঙ্গল অমঙ্গল জানি না কিন্তু সবার হাতে দড়ী বাঁধা বানর সাজবার ইচ্ছে আর আমার নেই। সবাই বলে "হামিদ" যদি এ কাজ কর পুরস্কার পাবে। আমার দুর্বলতার সামনে একটা টোপ ফেলে আমায় গাঁথতে চেষ্টা সবাই দেখছি। তাই বাতাসের মত বয়ে চলেছি কখনও এ দিক আবার কখনও বা ও দিক।

এবার বয়ে যাচ্ছি লালকুমারী না ও কি বলছি সম্রাজ্ঞী ইমতিয়াজের অনুকূলে জুলফিকার খাঁ! তরী সামাল এতদিনে অনুকূল বাতাস আজ হতে তোমার পালে সম্মুখ হতে এসে আঘাত করবে।

(পটনিক্ষেপ)

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার নিকটবর্ত্তী প্রান্তর।

সময়—মধ্যরাত্রি।

জুলফিকার। কী ভয়ানক আঁধার! আকাশে ঘন কালো মেঘ স্তরে স্তরে সাজানো অচঞ্চল, দিগন্ত-প্রসারিত। দিকে দিকে আঁধার গাঢ় জমাট শক্ত হয়ে উঠেছে। সব মৃতের ন্যায় নীরব নিঝুম।

এই নীরবতার মাঝে কিসের ঐ আর্ত্তনাদ বিদ্যুতের ঝলকের মতো আঁধারের পরদাটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে গেল?

ও পাখীর ডাক।—

ঐ যে যমুনার কালো জল আঁধারকে বুকে ধরে—শয়তানীর মত ফাঁদ পেতে বসে আছে।

কে যেন অলক্ষ্য থেকে আমার অনুসরণ করছে—আঁধারের আবরণে কে সেই অস্পষ্ট ছায়া, অশরীরী প্রেতের মত মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে আবার লুকাচ্ছে?

(পশ্চাত হতে এসে হামিদখাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা
জুলফিকারের বাম হস্ত ধারণ)

হামিদ। প্রেত নয়, জুলফিকার খাঁ, আমি হামিদ তোমার দুরভিসন্ধি—আমি বিফল করব।

(হামিদ খাঁর মুঠোর ভিতর হতে হাতখানি ছাড়াইয়া
সেই হাতে তার দক্ষিণ হস্ত ধারণ)

জুলফিকার। হামিদ! ভালই হয়েছে শত্রু সৈন্যের অবস্থান দেখতে এসে আঁধারে পথহারা হয়ে পড়েছিলাম; চলো, আর একটু এগিয়ে যাই, ঐ যে দূরে জোনাকীর মতো আলোগুলি দেখাচ্ছে ঐখানে বোধ হয় শত্রুদের শিবির—চলো।

(হামিদের হাত ধরে নিষ্ক্রান্ত হওয়া)

হামিদ। (একটু পরেই) জুলফিকার খাঁ, বিশ্বাসঘাতক পিশাচ, খোদা তোমার বিচার করবে ওঃ—

(রক্তাক্ত কৃপাণ হস্তে জুলফিকার খাঁর প্রবেশ)

জুলফিকার। খোদার বিচার! জুলফিকার সে ভয় কখনও করে নি আজও করবে না। হাঁ, এই খোদার দোহাই দিয়ে দুর্ব্বল যারা তারা সবলের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়।

রূপমুগ্ধ যুবক! নিশ্চয়ই তুই ইমতিয়াজের কথায় আমার পেছনে লেগেছিলি। কুকুর, কেমন শাস্তি পেয়েছিস্!

মিথ্যা পাপ পুণ্য, এ ভেদ মানুষে করেছে—যদি মিথ্যাই না হবে তবে পাপের সুযোগ এ গাঢ় অন্ধকার আকাশ থেকে আজ ঢলে পড়বে কেন?

জাহান্দারও আমার বিচার করতে চেয়েছিল, তার শাস্তির আয়োজন চলছে -ভেবেছিলুম তোমার সিংহাসনে বসিয়ে প্রভুত্ব আমিই করব—কিন্তু সে আমার হল না—তাই তোমাকে আজ সরাতে যাচ্ছি—

ক্রমশঃই যে আঁধার বেড়ে চলেছে—কে যেন ঐ আসছে?

(হোসেন আলি খাঁর প্রবেশ)

হোসেন আলি। কে, জুলফিকার খাঁ?

জুলফিকার। কি, হোসেন?

হোসেন। হাঁ, আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি বোধ হয়—এ আঁধারে পথ চিনে আসতে দেরী হয়ে গেল।

(একটু কাছে এসে) এ কী, আপনার হাতে রক্তাক্ত শাণিত ছুরিকা, আপনাকে অতিশয় উত্তেজিত বোধ হচ্চে।

(ছোড়া কোষবদ্ধ করে)

জুলফিকার। হাঁ, একজন সৈনিক আমার অনুসরণ করেছিল তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। যাক্, সব প্রস্তুত এখনি উপযুক্ত সময়—

হোসেন। চলুন শিবিরে, সেখান হতে সকলে একসঙ্গে রওনা হবো।

প্রস্থান।

(পটনিক্ষেপ)

জাহান্দার। কে তুমি মিঠে হাতে বীণার তারে ঘা দিলে ?

ইমতিয়াজ। একেবারে উন্মত্ত! বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় নরকের আঁধার খোলা দরজা পেয়ে শ্রাবণের ধারাসারের মত পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দীপগুলি নিবে গেছে। যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। নাথ! এ রূপের শিখা ধরে আমিই যখন তোমায় পুড়িয়েছি, সুরার সাগরে তোমায় বিভ্রান্ত তরীর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেছি, তখন আমাকেই আজ তোমার রক্ষার ভার গ্রহণ করতে হবে। থাক তুমি তোমার বিলাস নিয়ে, ইমতিয়াজ চলল—এ কি কেন যেন মনে হচ্ছে আজকের এ বিলাসই যেন শেষ। জুলফিকর খাঁ কোথায় গেল যাই,—দেখি।

জাহান্দার। কোন হ্যায় রে বাইজী লে আও—

মিছে যে আমার রজনী যায়।
গোপনতম, এস আধ ঘুমে,—এভরা যৌবন বিফলে যায়॥
আঁখি ভরে এস মোহন স্বপনে
রূপে রংএ গানে এস প্রাণে মনে
এস হে দয়িত এস প্রিয়তম
তনু মম তব পরশ চায়।
যদি ভুলে থাক থেক সুরে গীতে
আলো হ'য়ে থেক জোছনা নিশিথে
দক্ষিণ হাওয়াতে পিয়াল রেণুতে
পিক কুহুতানে হারানো হিয়ায়॥

(হোসেন আলি খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, ফরাকশিয়ার, চিনকালিচ খাঁ ও জুলফিকর খাঁর উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রবেশ)

(নর্ত্তকী প্রস্থান)

হোসেন। জুলফিকর খাঁ! এই কি সম্রাট জাহান্দার।

জুলফিকর। হাঁ।

জাহান্দার। (নিমীলিত চক্ষে) সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল কেন ? স্ফুর্ত্তি করো।

(চক্ষু উন্মীলিত করিয়া)

এ কি? সব ছায়া! হাওয়ার! এ স্বপ্ন খেলা দেখিয়ে আমায় ভয় দেখাবে মনে করেছ কুহকিনী?

হোসেন। জাহান্দার বাদশা এ তোমার স্বপ্ন নয়,—তোমায় বন্দী করতে এসেছি।

জাহান্দার। (দাঁড়াইয়া) কে তোমরা এই ভরা নিশীথে আমার স্বপ্নের নেশাটাকে ছুটিয়ে দিতে এসেছ?—বুঝেছি, ও কে—জুলফিকর?

জুলফিকর! তুমি ওখানে কেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? ভাবছ বুঝি আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি? একটুও না,—এসো, কে আসবে, বন্দী করো।

সিরাজ। যাও হোসেন।

জাহান্দার। না সিরাজ তুমিই এসো।

(সিরাজ জাহান্দারকে বন্দী করিল)

কত রঙের তুলির স্পর্শে জীবনটা আমাদের চিত্রিত হয়ে উঠ্ছে, জুলফিকর? এ রামধনুর মত মানব জীবন, নানা ভাবের বিচিত্রতায় রঙীন হয়ে উঠে নিমেষে প্রতিভাত হয়ে আবার নিমেষেই মিলিয়ে যায়! ঐ বালু-গড়-তোলা প্রাসাদের মত, সাগরের পাড়ের ঢেউগুলির মত মুহূর্ত্তে নিরাশার আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে কোথায় বিলীন হয়ে যায়। এ শুধু ভাঙ্গবার খেলা জুলফিকর! তুমি কেবল খোদার হাতের অস্ত্রটুকু,—তোমায় ত দোষ দিতে পারছি না।

(লালকুমারীর ব্যস্তত্রস্ত ভাবে প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। অকস্মাৎ গান থেমে গেল কেন? এ কি! তোমরা কে? জুলফিকর খাঁ! যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। উঃ কি ভুলই আমি করেছি। জুলফিকর খাঁ! আজ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, নয়? কিন্তু সব বুঝেছিলুম তবুও হারালুম বিশ্বাস-ঘাতক?

জুলফিকর। সংসারের এ বাজীতে যে জয়ী হয় বেগম সাহেব.........।

(জুলফিকর খাঁকে হোসেন আবদুল্লার ইঙ্গিতানুসারে বন্দী করিল)

চিনকালিচ। সংসারের জয় পরাজয় শেষের দিনটায় খতিয়ে দেখতে হয়, জুলফিকর।

জুলফিকর। তবে—মর.........শয়তান।

কুক্কুর, সাবধান; শিক্ষা তোমায় একদিন দেবই দেব।

হোসেন। জুলফিকর খাঁ! সে অবসর পাবার সৌভাগ্য বোধ করি তোমার হবে না; যখন ফাঁদ পেতেছিলে তখন এ ভাবনা হাওয়া তোমার উচিত ছিল যে ও-ফাঁদে তোমারই পা পড়া অসম্ভব ত নয়ই বরং খুব নিশ্চিত। এখন শেষ সময়ে একবার খোদার নাম স্মরণ করো জুলফিকর খাঁ।

নবম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রা শিবির সময় রাত্রি।

জাহান্দার সুরায় বিভোর হইয়া বসিয়াছিল—সম্মুখে—পানপাত্র।

(ইমতিয়াজের প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। এ কি সম্রাট! এখনও তুমি ফুর্ত্তি কচ্ছ?—ওদিকে যে তোমার সিংহাসন যাবার পথে বসেছে, কার হাতে বিশ্বাস করে সব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ?

জাহান্দার। ইমতিয়াজ! এ তুমি কোন সুরে গান ধরেছ? দুঃখ চিন্তা ভয় সব দূর করে দিয়েছি। দেখেছ? (পানপাত্র দেখাইয়া) এ কি জানো? আঙ্গুরের বুকের রক্ত, প্রাণ তাজা করা কেমন রক্তিম ঢল ঢল, চুমুকে চুমকে আমার প্রাণে রসের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে; হৃদয়ের বেদনাগুলি যেন এর স্পর্শে সুখের রূপ ধরে বসেছে—একটু খাবে, ইমতিয়াজ?

ইমতিয়াজ। না, সম্রাট!

জাহান্দার। ঢাল, পেয়ালা ভরতি করো। তুমি একটুও খাবে না ইমতিয়াজ? তোমার প্রাণে দুঃখ আছে, না? কিন্তু আমার শুধু আনন্দ শুধু ফুর্ত্তি। আনন্দে মসগুল হয়ে আছি। কাউকেও আমি চাই না। শুধু আমি আর বেহেস্তের মধু—সেখানে বোধ হয় এ সিরাজীর নদী কুলু কুলু রবে বয়ে যাচ্ছে—আমি ভাসব।

ইমতিয়াজ। দোষ আর কাকে দেব। আমিই যে তোমায় এ-পথে টেনে নিয়েছি সম্রাট, নাথ!

(জুলফিকার খাঁর—চমকিত হওয়া)

জুলফিকার। খোদার বিচার! (স্বগতঃ ভাবে)

ইমতিয়াজ। (জাহান্দারের নিকটে যাইয়া)

নাথ!

জাহান্দার। ইমতিয়াজ! যবনিকা ঐ নেমে এসেছে—আঁধারের যাত্রী আমরা আমি যাচ্ছি আজ, তুমিও যাবে দুদিন বাদে।

(ইমতিয়াজের ক্রন্দন)

কাঁদছ কেন, ইমতিয়াজ? একটা ছায়ার জন্য? জীবন একটা ছায়া একটা দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতির দর্পণে মুহূর্ত্তের জন্য একটা কুহেলি লেখা,—আজ আছে, কাল নেই। সুখদুঃখের খেয়ালের বাতাস এ জীবনে কম্পন তুলে আলোছায়ার বিচিত্রতায় একে মধুর ও পূর্ণ করে দেয়—তাই এ মোহ। ভালবেসেছ আশীর্ব্বাদ করছি ভুলে যেও যেন তোমার দেরী না হয় তবেই একটু শান্তি পাবে।

ইমতিয়াজ। নাথ! এ অভিশাপ তুমি আমায় কেন দিচ্ছ। আমি এ আশীর্ব্বাদ চাই যেন তোমার স্মৃতিই আমার বাকী জীবনের একমাত্র ধ্যান হয়।

জুলফিকার। (যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া)

শুধু—একটা ভুল, যদি সৈন্যদের প্রস্তুত করে রাখতুম ইঙ্গিতে তারা এসে পড়ত। তোমায় বেশী বিশ্বাস করেছিলুম, হোসেন। বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ছিলুম না—তা না হলে এ শৃঙ্খল আমায় না পরতে হবে, হোসেন! তোমাদের পরতে হোত। কিন্তু খোদার বিচার!

(প্রস্থান)

ইমতিয়াজ। সবই যেন স্বপ্ন—আমি জেগে আছি ত? আমার—এত সাধের খেলা এত লীলা শেষ হয়ে গেল।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।

ও

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মরণ আড়াল।

——:o:——

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ফিরিয়াছি আবার নিজ গ্রামে,—কত কাল পরে! কত পরিবর্ত্তন! সহরের উপকণ্ঠে আমাদের গ্রাম। গ্রামের অনেকাংশই এখন সহরের অন্তর্ভূত। নতুন নতুন বাড়ীঘর, নতুন সব বাসিন্দা, অপরিচিত মুখের অন্ত নাই; তথাপি আমাকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, পাছে পরিচিত কেহ চিনিয়া ফেলে।

জননী, জন্মভূমি! জননীকে হারাইয়াছি অতি শৈশবে; জন্মভূমি,—তাহাকে নিজের বলিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত! প্রাণ তবুও তাহার স্পর্শে কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে। এই ধূলা, এই মাটী আমার মধুর শৈশবের শত স্মৃতিতে ভরা। আমার নরহরিদা, একাধারে পিতামাতা আমার—আজও কি বাঁচিয়া আছে! কি অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাদের কে জানে! দ্বিপ্রহরে সহরে পৌঁছিয়া আশ্রয় লইয়াছি একটা হোটেলে। রাত্রের অন্ধকার ঘনাইয়া না আসিলে, এ অবস্থায় নিজ গৃহে ফিরিবার উপায় নাই। নিজ গৃহ! নিজের নামটি পর্য্যন্ত নয় যাহার নিজের, তাহার আবার নিজ গৃহ! নিজের নয় ত কি? প্রাণে যাহা এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, যাহার কথা স্মরণে আসিবামাত্র মন আনন্দরসে ভরিয়া উঠে, তাহাও যদি না হয় নিজের, সংসারে তাহা হইলে নিজের কি! নিভা,—প্রাণের বোনটি আমার, তুমি আজ কাহার,—বিবাহিত হইয়াছ নিশ্চয়, কোথায় বা কেমন আছ তুমি। আছ কি না আছ, তবুও চিরজীবন্ত তুমি এ প্রাণে! তোমার দেখা পাইব না কি! প্রতীক্ষা,—চোরের মত অন্ধকারের প্রতীক্ষা অসহ্য। অস্ত যাইতে জানে না এ দেশের সূর্য্য!

অবশেষে সন্ধ্যা মুখরিত করিয়া তুলিল, গোপীনাথ দেবের আরতির কাঁশর,—দামামার ধ্বনি। ছুটিতাম একদিন এই ধ্বনিতে, আরতির শেষে দেবতার চরণামৃতের আশায়, সঙ্গে থাকিত তখন নিভা, ছোট্ট বোনটি তখন সে! আজ অন্তরে অবস্থান করিয়া অন্তর ভরিয়া পূর্ণ প্রাণে পান করিতেছি দেব, তোমার চরণামৃত। তেমনি ভাবে আমার শৈশব-সঙ্গিনীটিকে

সঙ্গে দাও দেবতা! জীবনের কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হয় নাই,—এটিকেও বিফল কর যদি, জীবন বলি গ্রহণ করিয়া সকল আশার শেষ করিয়া দাও গোপীনাথ। চিরপরিচিত পথ, হৃদয়ের পরতে পরতে আঁকা, তবুও পা উঠে না। আশা আশঙ্কা আমাকে অচল অস্থির করিয়াছে। এখানেই ছিল না সেই পাঠশালা,—কে এখানে সৌধ নির্ম্মাণ করিল, চিহ্নটুকুও কি তার রাখিতে নাই! আমবাগানে ভূতের ভয়! আমরাই ছিলাম সেই ভূত, আজ নিরুপদ্রবে আঁধারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুকুরের বাঁধা-ঘাট নির্জ্জন নিস্তব্ধ,—ছেলেরা বুঝি এখন রাত দশটা পর্যন্ত জটলা করে না। ইহার পরেই আমার বাড়ী। বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম,—কণ্ঠ উঠে না কাহাকেও ডাকিবার জন্য! কে আছে? কে আছ? নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি,—ভাব ভাবনা আশঙ্কা রূপান্তরিত করিয়াছে আমাকে পাষাণে হৃতসর্ব্বস্ব নারী অহল্যা একদিন বুঝি এই অবস্থায় পড়িয়াই পরিণত হইয়াছিল পাষাণে!

ঐ সেই কণ্ঠস্বর—নরহরিদার সুর তানলয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—সেই প্রাণতম কণ্ঠস্বর—নরহরিদা তাহার চিরপ্রিয় রামায়ণ পাঠে রত। আশৈশব শুনিয়া আসিয়াছি বৃদ্ধের এই পাঠ,—অতৃপ্ত হৃদয়ে শুনিয়াছি,—আজও বৃদ্ধের প্রাণ সম্বন্ধে আমার হতাশ হৃদয়কে আশ্বস্ত করিল ঐ ধ্বনি! গৃহ প্রবেশের সাহস হইল না, কি করিয়া দাঁড়াইব গিয়া তাহার সম্মুখে! চিত্রার্পিতের ন্যায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। সহসা একটি পশ্চিম দেশীয় যুবক বহির্গত হইয়া আমার স্বপ্ন ভঙ্গ করিল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"নরহরি বাবু কি বাড়ীতে আছেন?"

যুবক উত্তর করিল "হাঁ, ডাকিয়া দেব কি?"

বলিলাম "না—দরকার নাই তাঁর একখানা চিঠি আছে।—"

পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম,—চিঠিতে লিখিয়াছিলাম "নরহরি দা, আমি আবার এসেছি,—আশ্চর্য্য হয়ো না,—গোলমাল করো না—অনেক সংবাদ—অনেক গোপনীয় কথা তোমায় বল্‌তে আছে—গোলমাল করো না—তোমায় দেখতেই এসেছি।"

চিঠিখানি যুবকের হস্তে দিলাম। নরহরি দা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। একবারে আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধ কাঁপিতেছে। অনেক চেষ্টায় ডাকিলাম "নরহরি দা!"

ব ষ্প কুল কম্পিত বদ্ধ কণ্ঠে নরহরি দা বলিল "ভাই—গোপীনাথ আবার এ দিন দেবেন ভাবতেও পারি নি।"

অগাধ স্নেহ-সমুদ্রে এমন অপার্থিব সুধা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ দেবতা! ইচ্ছা হয় না ও-বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হই কিন্তু সে ভাগ্য যে আমার নয়!

বৃদ্ধকে প্রণাম করিলাম,—চরণের ধূলি লইয়া ধন্য হইলাম। বৃদ্ধ ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া আমার হাত ধরিয়া উঠাইল। বলিল "তোর আশা যে ছেড়ে দিয়েছিলেম বিনোদ! কোন শত্রু রটায়েছিল তুই........."

বলিলাম "সেই কথা বলতেই এসেছি নরহরি দা! অত উতলা হয়ো না,—আমার বিপদ আজও কাটেনি, তুমি অত উতলা হলে কে আমায় রক্ষা করবে নরহরি দা!"

"অ্যাঁ,—বলিস্ কি বিনোদ! কিসের বিপদ আবার তোর—আমি তোকে আর ছাড়ব না ভাই!"

"ভিতরে চল,—তোমার ভাই সেই বিনোদ আমি নই, ও নাম আমি হারিয়েছি, ভয় পেও না, জেল-পলাতক আমি, বিনোদ মরেছে, আমার নাম এখন অন্য, সেই কথাই শুনবে চলো।"

বৃদ্ধের হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলাম। এই কি আমার সেই গৃহ!—সমস্তই শ্রীহীন! বৃদ্ধ যেন কোন মতে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছে। নিভৃত গৃহে বসিয়া বৃদ্ধকে একে একে আমার সমস্ত কাহিনী শুনাইলাম। বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। নয়ন তাহার শুষ্ক ছিল না, অতি কষ্টে তাহাকে সংযত করিয়া আমার এ কয় বৎসরের ঘটনা শুনাইলাম, তাহাকে বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইলাম—আমার কথা প্রকাশ হইলে কি মহা বিপদ!

বৃদ্ধ আতঙ্কিত হইয়া বলিল "এখন উপায়, তবে কেন তুই ফিরে এলি ভাই! সে সময়েও আমার যত চেষ্টা অত অর্থব্যয় তুই কোন কথা না বলে ব্যর্থ করেছিলি—আবার এখনো কেন তুই জেল হতে পালালি! এত দিন এত কষ্ট সয়েছিলি যখন,—আর ছটা মাসের জন্যে কেন এ বিপদে ঝাঁপ দিলি—আমি কোন কিনারা পাই না ভাই!"

"নরহরি দা তুমি না বল্‌তে অদৃষ্ট! এ আমার অদৃষ্ট! তুমিই না বল্‌তে পাপ না থাকলে দুর্ভাগ্য হয় না—এ আমার পাপের ভোগ—ঠিক বুঝেছ—নিজের কাজেই কেবল পাপ হয়, তা নয়, নরহরি দা—দশের পাপে, সমাজের পাপে সকলকেই কম বেশী ভুগতে হয়। আমিও যে ছিলাম সমাজেরই এক জন। কেউ বা ভোগে কম—কেউ বা সেই সমাজের পাপে উচ্ছন্ন যায়। আমার অদৃষ্টে আছে সমাজের বজ্র—কুচক্রীর চক্রে আজ আমার এই দশা! রাজচন্দ্র পাপের জাল ফেলেছে, ধরা পড়েছি আমি—জানি না ওকেও একদিন এই 'পাপ' জড়িয়ে তুলে পাপভারে কুপোকাৎ হতে হবে কি না!"

বৃদ্ধ, রাজচন্দ্রের নামে উত্তেজিত হইয়া উঠিল "বলিস্ না বিনোদ ওর কথা, এমন মানুষও সংসারে হয়,—মানুষ এমনও নরপিশাচ হয়—আমাদের এদশা ওরই জন্যে—খুনী—ডাকাত কুমির অধম—নচ্ছার—ওর নাম মুখে আন্‌লেও পাপ হয়—পরেশকে খুন করেছে ওই—আমি তার প্রমাণ পেয়েছি—এত বড় মিথ্যা সংসারে চলে—আদালত—বিচার সব মিথ্যা—অধর্ম—অধর্ম—অ শেষে নির্দ্দোষ তুই তোর আজ এই দশা, আর রাজচন্দ্র রয়েছে রাজার হালে—হায় গোপীনাথ—একি তোমার খেলা—কলিতে দানবেরই জয় দু'দিন পরে ভগবানের নাম বুঝি আর লোকে নেবে না!"

উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ করিল। অশ্রু গণ্ড প্লাবিত করিল—ধৈর্য্যের সীমা আছে,—আমি বৃদ্ধের অশ্রু উত্তরীয় অঞ্চলে মুছাইতে গিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না! নিঃসম্পর্কীর নিস্পর এ,—আমার জন্য ইহার ভাগ্যে কেন এত পরিতাপ!

স্নেহশীল বৃদ্ধ বলিল "কাঁদিস্ কেন ভাই! তোর চোখের জল দেখ্‌তে পারিনে—তোকে হারায়ে কি ভাবে আছি সেই অন্তর্যামীই জানেন! কি করব ভাই আমি যে ভাবতে পারিনে—দীনবন্ধুর দুর্ব্বলকে নিয়ে একি খেলা! বিশ্বাস হারাসনে ভাই, এত কষ্টের মধ্যেও আজ এদিন তিনিই দিলেন,—তাঁর দয়ায় আমাদের এ কষ্টের একদিন অবসান হবেই হবে নৈলে কি হারাধন ফিরে পাই, এ পরীক্ষার শেষ কর গোপীনাথ!

আমি আবার বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বলিলাম 'তোমার আশীর্ব্বাদ সার্থক হ'ক নরহরি দা!"

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না—করযোড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করিল। ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কিছু আহারীয় আনিয়া বলিল "খা বিনোদ! কে আছে তোকে যত্ন করে—তোর যা আছে ভোগ করে কে! তুই বেড়াচ্ছিস্ পরের কাজে! হায়! অদৃষ্ট!"

বলিলাম "দুঃখ করো না নরহরি দা—কর্ম্মভোগ ভুগতেই হবে, তবু তুমি ছিলে তাই এ সব আজও আছে!"

"আমি আর কয়দিন থাকব—সময় যে হয়ে এসেছে,—তোকে আবার ফিরে পাব কি করে!"

"ফিরে পাবে নিশ্চয়; সে আমি ঠিক করেছি,—এ অবস্থা অসহ্য,—এর পরিবর্ত্তন করতেই হবে—আমি মরবো না—এ ভোগ নৈলে ভুগবে কে—ভগবান আর ক'টা বৎসর যদি তোমায় রাখেন,—এ দিন থাকবে না!"

"আর ক'টা বৎসর! আর যে পারিনে বিনোদ!"

এতদিন পরে এমন ভাবে দেখা বাক্যের শেষ নাই—দুঃখ, হর্ষ আবেগের অন্ত নাই। রজনীতে নিদ্রা নাই,—যুবা আর বৃদ্ধের প্রাণ গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে! কি কষ্টেই বৃদ্ধ দিন কাটাইতেছে,—যোগীর মত আমার মঙ্গল সাধনায় তাহার সমস্তই উৎসর্গীকৃত,—এমন বন্ধু জগতে দুর্লভ। নিজেকে বঞ্চিত করিয়া বৃদ্ধ আমার সম্পত্তির আয়ে জমাইয়াছে ত্রিংশ সহস্রের অধিক! এত অর্থ! কিন্তু যাহাতে আমার অর্থের সার্থকতা সে এখন কোথায়, কি ভাবে!—বার বার সে প্রশ্ন মনে উত্থিত হইলেও প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছিল না,—কিবা শুনিতে হয়! বৃদ্ধ সে সম্বন্ধে নীরব,—আমার অবস্থা আমার বিষয়-সম্পত্তির প্রসঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত—সে কি করিয়া অনুভব করিবে আমার প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাহাকে চায় রক্ষা করিতে,—নিভা কি তবে জীবিত নাই!

নিরাশ হইয়া বলিলাম "এত কষ্ট কেন করেছ নরহরি দা,—নিজের প্রাণে কিছু দাও নি—এ বয়সে তোমায় কোথা সুখে রাখব আর তুমি শরীরের কষ্ট দিতে ছাড় না।"

"কিসের কষ্ট—তুই কাছে থাকলে এমন আরও শত কষ্টও তুচ্ছ করতেম—কোন প্রাণে খাব পরব ভাই!"

"না—নরহরিদা আর নিভকে কষ্ট দিও না—তোমার পায়ে পড়ি—আমার আশ্রিত যারা তাদের সেবায় আমার যা কিছু ব্যয় হলে আমার কত সুখ তা কি তুমি বুঝবে না—নিভাদের ব্যয়, তার বিয়ে তুমি ত দিয়ে দিয়েছ নরহরি দা !"

"ও কথা আর তুলিসনে ভাই ! আমি চেষ্টার কম করি নি কিন্তু ফল হ'ল কি তার ! নিভার মাই ছিলেন আমার অন্তরায় ! ঐ পাপ পিশাচটা কি মন্ত্রণাই না দিয়েছিল—তিনি সৎপাত্র পেয়েছিলেন রাজচন্দ্রকে,—খুনী বেটা—এই বিয়ের জন্যই দুধের ছেলে পরেশকে নিজ হাতে খুন করেছে—তোকে জেলে দিলে—তবুও নিভার মার চোখ ফুট্‌লো না, তিনি নিভকে ডুবালেন—বিয়ে দিলেন রাজচন্দ্রের সঙ্গে !"

আর শুনিবার শক্তি হারাইলাম। আঁা, নিভার বিবাহ রাজচন্দ্রের সহিত ! সেই মহাশত্রুকেই আবার রক্ষা করিতে আসিয়াছি আমি ! রক্তমাংসের দেহ নহে কি আমার। এত কাপুরুষ আমি—মুহূর্ত্ত জ্ঞান হারাইলাম ! বলিলাম বল কি তুমি ! নিভার বিয়ে হয়েছে রাজচন্দ্রের সঙ্গে ! তাও তুমি হতে দিলে, বৃথাই তবে বলে গিয়াছিলেম জেলে যাবার সময়—আমার সমস্ত দিয়েও নিভকে রক্ষা করো—বৃথা বৃথা—সব বৃথা—একটা সামান্য কাজ,—আমার বিদায়-অনুরোধ, তাও রক্ষা কর নি নরহরি দা !"

"কেন যে পারি নি, কি করে আর বুঝাব বল ! কোনটাই বা পারলেম—তুই যে বিনা দোষে জেলে গেলি তারই বা কি করতে পেরেছিলাম ! ওরা আমার কে যে ওদের কাজে আমি কর্ত্তৃত্ব করবো, করতে গিয়েও ত অপমানিতই হয়েছি—নিভার মা আমাকে শত্রুই ভেবেছেন—বন্ধু নয়। কি করব আর ! খুনী তুই, তোর চাকর আমি, আমার পরামর্শ তিনি শুনবেন কেন। হয়েছে বেশ ফল তার ভুগে গেছেন কম কষ্ট ভুগে মরেন নি—আমি তোর কথা মনে করেই শেষের দিনে সাহায্য করেছি—নৈলে আরও যত ভুগতে হ'ত ওকথা ছেড়ে দে বিনোদ, পরের কথায় কাজ কি বল ! পর কি আপন হয় !"

মনে মনে বলিলাম, আমি তবে তোমার কি ! আমার জন্যে এত মাথার ব্যথা কেন তোমার ! পর তুমি কাকে বলছ ! বলিলাম "নিভার মা তা হলে মরেছেন ! নিভা কোথায় ? কেমন আছে ?"

বৃদ্ধ যেন বিরক্ত হইয়া বলিল—"বল্লেমই ত সে রাজচন্দ্রের পরিবার, তার বাড়ীতেই ! পাষণ্ডের হাতে পড়লে যা হয়—হয়েছে তাই ! একটা ছেলে হয়েছে, কার ছেলে কে দেখে ! খুনীর কথা ছেড়েদে,—আমার ওদের কথা ভাল লাগে না ভাই ! আর কি অন্য কথা নেই ! আব্বাস ওকে যেদিন শেষ করতে বসেছিল—আমার কার নাই তাই চোখের সামনে খুন হতে দিলেম না। কাকে রাজচন্দ্র রেহাই দিয়েছে, আব্বাস ওর অত উপকার করেছে,—তাকেও কি দিয়েছে কম কষ্ট ! তা তার শেষ আছে, আব্বাসের হাতেই ওর মৃত্যু—হওয়াই উচিত—!"

আমি বলিলাম "আব্বাস, আব্বাস সর্দ্দার—তার ও আবার কি করেছিল,—কোথায় আছে সে ?"

"আমার যত মাথার ব্যথা,—তাকে তোরই জমীদারীতে কাজ দিয়েছি—ভাতে-কাপড়ে মারা যেতে বসেছিল—অথচ লোকটা কাজের—রাজচন্দ্রের পাল্লায় না পড়লে ওর এ দশা হতো না।"

কাজ ত দিয়াছ, তবে আবার কি দশা !"

"আমার মাথা, সকলেই আমার তোমার মত কিনা—অপমান, অত্যাচার মাথা পেতে সহ্য করবে, টাকার লোভ দেখিয়ে পরেশকে খুন করতে রাজচন্দ্র আব্বাসকে ফুঁসলায় ও তাতে রাজি হয় না—শেষে খুন করেছে নিজে—তোকে খুনী সাজিয়েছে। আব্বাস পাছে সে সব প্রকাশ করে সেই ভয়ে ওকে পাগল বলে পাগলা-গারদে পুরেছিল—জগতে এত মিথ্যাও চলে এত অত্যাচারও সহ্য হয় ! ও পাগলা গারদ হতে ফিরে প্রতিশোধ নিতে পাগলই হয়েছে। কোন মতে, তোর কথা মনে করেই আমি ওকে সরিয়ে রেখেছি—ইচ্ছা হয় না আর পাপের প্রশ্রয় দিতে।"

অন্তরে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া কে যেন বলিয়া উঠিল—"সত্যই রাজচন্দ্রের মরণই মঙ্গল, যাহা আব্বাস করে নাই—আমি তাহা নিজ হস্তে সম্পাদন করিব—এমনিও মরিয়াছি, না হয় মহাশত্রুকে নিপাত করিয়া ফাঁসী কাঠে ঝুলিব !"

বলিলাম "রাজচন্দ্রের এত অত্যাচার !"

"অত্যাচার বলে অত্যাচার—দেশটাকে ছারখারে দিল। আশ্চর্য্য এই সহরের বুকে বসে এত অপকর্ম্ম করছে তবু তাদের জোর—আজও ওর কেউ কিছু করতে পারলে না।"

মনে মনে বলিলাম "কেমন না পারে দেখে নেব—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

পরমুহূর্ত্তে মনে হইল—হা! একি প্রতিজ্ঞা—রাজতন্ত্র যে নিতান্ত বামী!

ক্রমশঃ—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:০:—

বর্ষণ বারির বিরাম নাই—কোচবিহারে বর্ষা এইরূপই। এমাসে সূর্য্যের মুখ কমই দেখা গিয়াছে। বৃষ্টি ৪২·১৬ ইঞ্চি। গত বারে এ সময় ছিল ১৩·৪১ ইঞ্চি। খাদ্যবস্তু পূর্ব্ববৎ দুর্মূল্য। দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে। মফঃস্বলের টাকায় পাকি ৮ সের। সহরে দুগ্ধের ব্যবসা পশ্চিম দেশীয়দের হাতে, তাহাদের সরল দুগ্ধ ছয় সের, খাঁটি চার সেরই মেলা দায়। তবু তাহাদেরই দুগ্ধ প্রায় সকলকেই লইতে হয়—কারণ দেশীয় লোকের দুগ্ধ নিয়মিত পাইবার আশা দুরাশা! প্রায়ই কামাই। পশ্চিমা কিন্তু যথা সময়ে হাজির হয়, প্রাতে রৌদ্রের পরশে গরম হইবার পূর্ব্বে চার চুমুকে গরম হইতে হইলে পশ্চিমা গোয়ালা ভরসা, এত সকালে দুগ্ধ যোগান এদেশীয় কর্ম্ম নয়।

দুগ্ধ কেন অন্য ব্যবসাও ক্রমেই উহাদের হাতে যাইতেছে। ভহবাজারে পশ্চিমার দোকান বেশী; দেশী লোক দিন-মজুরী খাটিয়া খায়। প্রায় সর্ব্বত্র; এই দশা,—বাঙ্গালা ব্যবসায় হটিয়াছে তথাপি ইহার প্রতিকার চেষ্টা নাই।

সুখের বিষয় সহরে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাতা বিনামা, ধুতী, বিস্কুট ইত্যাদির খুলিয়াছেন। ইহাতে দোকানীর স্থান উন্নত হইল কিন্তু ধনাগমের সহিত শিক্ষিতের

স্বদেশের প্রতি দৃষ্টির পরিচয় থাকিলে অনেক দুঃখের লাঘব হইত। যে ব্যবসাটা অল্প শিক্ষিতের আয়ত্তে আসিলে তাহাদের জীবনোপায় হয়, তাহাতে শিক্ষিতের স্থান নাই; কিন্তু ছোট কারবারে ক্ষুদ্র স্বার্থের লাভে চিন্তায় উন্নত মনেও বিরক্তি তুচ্ছ বস্তুর ছাপ পড়ে! কেবল অর্থকে কেন্দ্র না করিয়া দেশের কল্যাণে লক্ষ্য রাখিয়া এ নির্ধন দেশে নবাগমের পন্থায় শিক্ষিতগণ মন দিলে নিজেরও উপকার কাজের মত কাজও হয়! সেরূপ ব্যবসায় যথেষ্ট রহিয়াছে,—সহরে হোটেল নাই যে দুই একটি আছে তাহাতে আহারীয় ও অন্য বন্দোবস্ত স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। খুলুন না কেন শিক্ষিতগণ একটা আদর্শ অন্ন-ভাণ্ডার! যাঁহারা অধ্যাপক ভাবে ছাত্রগণ স্কুল কলেজে থাকিতে, বোর্ডিংএ রাখিবার কালে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া অস্থির তাঁহাদের সেই সকল ছাত্রই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইলে সামান্য বেতনে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া যখন এই সকল কদর্য্য হোটেলে অন্ন গ্রহণ করে তখন তাঁহাদেরও প্রাণ কাঁদে না! বস্ত্রের ব্যবসায় মালিক এখানে মারোয়াড়ী—বিলাতী বস্ত্রই তাহাদের প্রধান পণ্য। নানা কারণে স্বদেশী বস্ত্রের উপকারীতা ও আবশ্যকতা শিক্ষিত মাত্রেই অনুভব করেন কিন্তু তাহার আমদানীর চেষ্টা একেবারে নাই,—স্বদেশী দেশালাইয়ের নাম শোনা যায়, দেখিবার সৌভাগ্য কমই হয়, আমদানী করিলে যথেষ্ট কাটতি হয়। প্রমাণ তাহার ঢাকাই ফেরিওয়ালা, দেশে সমবায় ও যৌথকারবারের প্রচলনে শিক্ষিত চেষ্টা না করিলে আশা কোথা? সাধারণের মত শিক্ষিতও যদি দশকে লইয়া একত্র হইয়া কাজ করিতে ভয় পান তবে সে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যগুলিও করিবে কে? বহু যৌথকারবার অনবধানতায় নষ্ট হইয়াছে,—বুদ্ধিমান, সুবিবেচক, চিন্তাপরায়ণ শিক্ষিত মহাত্মাগণ সে সমস্ত নিরাকরণের চেষ্টা করিয়া ব্যবসায়ে নামিয়া পড়ুন।

* * * *

হতাশ হইতে হয়,—ইচ্ছা হয় না আর আমাদের মানসিক দৈন্যের পরিচয় বারবার দিতে। বাঙ্গালী মরিতে বসিয়াছে, বোধ হয় বিকারগ্রস্ত নতুবা এত দেখিয়া শুনিয়াও কোনই প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না কেন,—একবাক্যে সকলেই বলিতেছেন—

'বাঙ্গালী জাতি মরণোন্মুখ। দারিদ্র্যে, রোগে বাংলার প্রাণবায়ু নির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে অবস্থা ছিল আজ আর তাহার সে [illegible]

নাই, শতকরা নব্বুই জন লোক দারিদ্র্যে নিপেষিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; বাকী শতকরা দশজন লোকের মধ্যে কতক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, আর খুব অল্প সংখ্যকই একটু সমৃদ্ধিশালী। বাঙ্গালী রোগে জীর্ণ, দারিদ্র্যই ইহার প্রধান কারণ, আবশ্যক মত সে পথ্য বা ঔষধ পায় না, তারপর সুস্থ দেহেও তার যে অবস্থা ইহাপেক্ষা ভাল তাও নয় ; অনাহারে তাহার শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে ইহার উপর নিত্য ব্যাধি আজ ম্যালেরিয়া, কাল অজীর্ণ, পরশু আরও দুরারোগ্য অন্য কোন ব্যাধি, এইরূপে বাঙ্গালী আজ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া দিন দিন মৃত্যুর পথেই ছুটিয়াছে। তারপর বাও দু'চার জন সমৃদ্ধিশালী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছেন তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য যে অনাহার দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অপেক্ষা ভাল তাও নয়, ইহাদেরও নশ্বর দেহ অত্যাচার অনাচারের ফলে শীঘ্রই ব্যাধির মন্দিরে পরিণত হয়, সংসার চলার উপযোগী অর্থের অধিকারী হইয়াও কত বাঙ্গালী যে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উপর দেশের জলবায়ুর এবং সময়ের যে অনেকটা প্রভাব রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

* * * *

পৃথিবীর লোক সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রাত্যহিক জন্ম সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং মৃত্যু সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার, সুতরাং প্রতিদিন ৪০ হাজার এবং প্রতিবর্ষে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ লোক বাড়িতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোথাও এই হারে লোক বাড়িতেছে না, সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালার অবস্থাই শোচনীয়, বাঙ্গালার জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক, বিগত কয়েক বৎসরে জন্মাপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ লোক অধিক মরিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গেরই অবস্থা খারাপ, বঙ্গের যে সব জিলায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম বঙ্গে। এইগুলি ম্যালেরিয়ার আগার। পশ্চিম বঙ্গে যত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে পৃথিবীর কুত্রাপি শুধু ম্যালেরিয়ায় অত লোক মরে না, এমন কি ভারতবর্ষেও নয়। এই ম্যালেরিয়া ছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, কলেরা রোগে কত লোকই যে ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৯২১ সালে বাঙ্গালায় হাজার করা সাড়ে ত্রিশ জন মানুষ মরিয়াছে ; এত অধিক মৃত্যুর হার পৃথিবীর কোথাও নাই। বাঙ্গালা দেশই ...র সকল রোগের আকর !

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের অপেক্ষা বাঙ্গালীরই পরমায়ু কম। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, কানাডা, মার্কিন যুক্তপ্রদেশ, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রত্যেক ব্যক্তির গড় পরমায়ু ৪৫ বৎসর, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে ৪০ বৎসর, রুষিয়ায় ৩৪ বৎসর এবং ভারতবর্ষে ২৩ বৎসর। শুধু বাংলাদেশের হিসাব খতাইয়া দেখিলে ইহাপেক্ষা কম হইবে নিশ্চয়। দারিদ্র্যের অনুপাতেই আয়ুর তারতম্য দেখা যাইতেছে, শুধু ভারতবর্ষ ব্যতীত রুষিয়াই পৃথিবীর সব দেশ অপেক্ষা দারিদ্র্য সেখানকার আয়ুও ভারতবর্ষেরই ঠিক উপরে। শস্যশ্যামলা বাঙ্গলা আজ শুধু কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বাঙ্গলারই ফলে জলে পুষ্ট বাঙ্গালী আজ মৃত্যুর দ্বারে অতিথি, আর বাঙ্গলার অর্থে পুষ্ট পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কেমন আনন্দে, সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে করিতে জীবন কাটাইতেছে। যে হারে বাঙ্গালীর পরমায়ু কমিতেছে এবং যেরূপ দ্রুতগারে বাঙ্গলায় মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ। এখন হইতেই ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

* * * *

সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়। মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া হিন্দু-মুসলমানের একত্র মৃত্যুহার তত অধিক বোধ হইতেছে না, বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যুহার আলাহিদা দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৪॥০ লক্ষ বেশী ছিল, পঞ্চাশ বৎসর পরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৬৩॥০ লক্ষ বেশী দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই সংখ্যা বাংলায় বৃদ্ধি হইতেছে, শুধু হিন্দুর সংখ্যাই কমিতেছে। আরও বিচিত্র এই, বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যাই কমিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালে যে অদ্ভুত ছুৎমার্গ হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারই পরিণাম এখনও হিন্দুসমাজে সংক্রামক ব্যাধি রূপে রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতাও হিন্দু হ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ, সমাজ যে ভাবে অনুষ্ঠানবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে তাহার প্রসারের ত কোনই উপায় নাই, তদ্বিপরীতে সামান্য কারণেও হিন্দুকে সমাজচ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত করা হয়, এই কারণেও হিন্দুসমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে চলিয়াছে। এককালে হিন্দু যে কমঠ ব্রতের সাহায্যে আপনার বৈশিষ্ট্য এবং অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল, তখন তাহার সে আবশ্যকতা

পারিবেও আজ বাঙ্গালী হিন্দু যদি বাঁচিতে চায় তাহাকে সকল গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সহজ ও সরল পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।' —নবশক্তি।

* * * *

সমাজ পাষাণ,—যেমন স্নেহহীন নির্ম্মম তেমনি অচল গতিহীন।—গতি নাই নিম্ন দিকে। এত দুর্গতিতেও বিবাহ প্রভৃতি বিষয় সংস্কারের লক্ষণ দেখা গেল না। বরপণে বেশ উচ্চ হইতে বসিয়াছে। ধনী ক্রমেই বরের দর বৃদ্ধি করিতেছেন। মধ্যবিত্তের কন্যার বিবাহ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এ দেশে কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়! কেন? কন্যাকে স্বাবলম্বী হইবার মত শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজে নাই। সে চেষ্টা কি অন্যায় না অসম্ভব!

* * * *

অনুপায় হইয়া অপাত্রে কন্যাদান বঙ্গে নিত্য ব্যাপার। উহার ফলে গৃহ বাহিরে নারী-নিগ্রহের অন্ত নাই; সংসারের সুখ অন্তর্হিত হইতেছে,—পারিবারিক জীবন অশান্ত, দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িতেছে! অকল্যাণের অবধি নাই। কত প্রাণ অকালে বিসর্জ্জন দিতেছে! সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলেজের ছাত্র, বয়স মাত্র কুড়ি—সে দিন আত্মহত্যা করিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে লিখিয়া গিয়াছে—"গুণবতী ভগিনীকে ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করায় এই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং আত্মহত্যা করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।" নরক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থা বঙ্গে আর কত কাল চলিবে!

* * * *

নারীনিগ্রহের সংবাদ নিত্য—চারুবাইনাদের পাশবিক অত্যাচার,—রংপুর দিনাজপুরে নারীর ইজ্জতহানীর অমানুষিক কাণ্ড—দেশের প্রাণে কি সত্য আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপে মান ইজ্জৎ যেখানে বিপন্ন—সেখানে সভা ডাকিয়া চেঁচাইয়া লইয়া আর কি ফল! মা শক্তি কি বঙ্গের নরনারীর হৃদয় হইতে অন্তর্হিত?—যে শিক্ষায় আবার শরীর মনে শক্তির সঞ্চার হয় তাহাই এখন চিন্তার বিষয়!

ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা

শোক-সংবাদ।

আবার কালের কঠোর কুলিশাঘাতে, গভীর একটি শোক-স্মৃতি অনন্তভাবে জাগ্রত থাকিতেই কোচবিহারের রাজপরিবারের আর একটি সন্তান লোকান্তরিত হইলেন। বিগত ৭ই শ্রাবণ সোমবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় মহারাজকুমারী প্রতিভাসুন্দরী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর হইয়াছিল। মাতার প্রাণে আর কত সহ্য হয়! মা মহারাণী ধৈর্য্যে সাগরসদৃশা হইলেও এ শোক তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজমাতার ও মহারাজকুমার এবং রাজপরিবারের গভীর নব আত্মীয়বিয়োগজনিত শোকের ন্যায় প্রকৃতিবর্গের, কর্মচারীবৃন্দের হৃদয়ে আঘাত করিয়া এ রাজ্যে সকলকেই শোকাভিভূত করিয়াছে। অমঙ্গলে মঙ্গলবিধাতা যিনি, তিনিই এ সময়ে শান্তি বিধান করুন—এই আমাদের বাগত কাতর প্রাণের প্রার্থনা।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

আর্ট ও সাহিত্য,—সুপ্রসিদ্ধ 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি-এ, প্রণীত এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ১৮২—১৮/০ পৃষ্ঠা। ছাপা ও বাঁধা সুন্দর। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—৫৫ অপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়। কলিকাতা।

তত্ত্বনিধি মহাশয় ভক্ত,—তাঁহার সর্ব্বকার্য্যেই ভগবান লক্ষ্য, আর্ট ও সাহিত্যকেও তিনি সেই চক্ষেই দেখিয়াছেন। আর্টের কেন্দ্র ভগবান, তাঁহার লীলাভূমি, বহুত্বের প্রকাশ প্রকৃতিতে। জগতের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন উদ্দেশে মঙ্গল স্বরূপের প্রকাশ প্রকৃতিতে সুতরাং মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রকৃতির এই বিকাশ ভঙ্গী বা চেষ্টাই আর্ট,—আর্টের সিদ্ধি স্বাভাবিকতায় মঙ্গলভাবের অভিব্যক্তিতে;—সত্য সুন্দরকে প্রকট করিয়া, মনের আবিলতা, আবর্জ্জনা বিদূরিত করিয়া, বিমল আনন্দের সহিত মনুষ্যকে মঙ্গলময়ের প্রতি আকৃষ্ট, নিবিষ্ট করাই,—উচ্চ আদর্শ, ভগবৎ চিন্তায় অভিভূত করিবার শক্তি ও অনুরক্তি দান করাই আর্টের লক্ষ্য তাহার দায়িত্ব। মনের ময়লা, ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, ক্ষণিক সুখের আয়োজন, অশ্লীল ভাব যাহাতে মাথা তুলিবার আশঙ্কা আছে তাহা নহে আর্ট,—তাহা শিল্পীর শক্তির অপচয়, সমাজের বিষ—অস্বাভাবিক, অসুন্দর! চিরসুন্দরের রাজ্যে প্রকৃতি সুন্দর,—সৌন্দর্য্যে মনমুগ্ধকারী,—শিব; প্রকৃতির প্রকাশ যে আর্ট তাহার গঠনে চাই সৌন্দর্য,—অন্তরকেন্দ্রে শিবত্ব। তত্ত্বনিধি মহাশয় এই সকল গূঢ় তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে আর্টের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিণতি, কুশিল্পীর হাতে পড়িয়া আর্টের উদ্দেশ্য কিরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাহা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন,—তিনি বক্তব্য বিশ্লেষণে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের মতি গতি স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র চরিত্রের দোষগুণ নির্ভীক ও ধীরভাবে প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই অথচ বিনয়ের ও সীমা কুত্রাপি লঙ্ঘন করেন নাই। ইহাই তাঁহার আলোচনার বিশেষত্ব! বিষয় গুরুতর—তাঁহার সমস্ত মন্তব্য নতশিরে গ্রহণ করা সম্ভবপর না হইলেও গ্রন্থখানি যে সুন্দর ও সুলিখিত তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন ও এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক পাঠিকা উপকৃত হইবে নিঃসন্দেহ।"

"গৃহদাহ" ইত্যাদি উপন্যাসকে তিনি যে চক্ষে দেখিয়াছেন অনেকেই হয়ত সে ভাবে দেখিবেন না। আর্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি উপন্যাস বা অন্য শিল্পে—তাঁহার সহিত অনেকেই একমত--কিন্তু বাহ্যিক পরিচ্ছদে বর্ণ সমাবেশে চিত্র চিত্রণে যথেষ্ট মত ভেদ হইবে। শুধু সুন্দর অসুন্দর লইয়া সংসার--প্রকৃতির আকৃতি- মঙ্গল উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত থাকিয়া ভালমন্দের বিকাশ সর্ব্বত্র কু'য়ের সমাবেশই দোষের নহে, কু'র প্রতি সহানুভূতিই অতিশয় নিন্দনীয় –'গৃহদাহ'

শক্তিশালী লেখক শেষ রক্ষা করিয়া অর্ট অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিচার অল্প পরিসরে সম্ভাপর নয়। আমরা পাঠকপাঠিকার নিকট এই সুন্দর গ্রন্থখানির পরিচয় মাত্র প্রদান করিয়া শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়কে তাঁহার সুন্দর ও সময়োপযোগী আলোচনার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গলায় কথা—ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল, প্রণীত। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত। ঢাকা নয়া বাজার শ্রীনাথ প্রেসে সুচারুভাবে মুদ্রিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। উদ্দেশ্য বোধ হয়—প্রচার।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার এ আলোচনায় তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সন্দর্ভটিতে তিনি অল্প পরিসরের মধ্যে কথা ও কাব্যের উৎপত্তি, প্রকৃতি, গতি, অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু বিষদভাবে আলোচিত হইয়া বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। সম্মিলনের ঘণ্টাবাঁধা সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে প্রবন্ধ রচিত তাহাতে সেরূপ আলোচনার আশা করা অন্যায়। আশা করি সুপণ্ডিত ও বিচারশীল লেখক ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধকে ভিত্তি করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ও বিস্তৃত আলোচনা সমালোচনায় বঙ্গীয় পাঠককে উপকৃত করিবেন।

অজ্ঞেয়কে জ্ঞানের গণ্ডীতে বাঁধিতে, অতৃপ্ত-হৃদয়ের তৃপ্ত হইবার স্বাভাবিক অদম্য আকাঙ্ক্ষায়--প্রকৃতিকে, প্রাণকে, অজ্ঞাতকে জানিবার ইচ্ছায় হৃদয়ের যে আকুলি ব্যাকুলি, প্রাণের ভাব অন্য প্রাণে সম্প্রসারিত করিবার প্রবৃত্তিতে, অন্যের ভাবে পরিতৃপ্ত হইবার ক্ষুধায় 'কথা'র উৎপত্তি; কাব্যে তাহার পরিপুষ্টি—'রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বা বুদ্ধির অতৃপ্তি হইতে সংস্কারের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে কথা ও কাব্য।' কথাবার্ত্তা গল্পগুজবের সাফল্য, সার্থকতা যেমন সহানুভূতিতে, ভাবের আদান প্রদানের আনন্দে, 'কথা সাহিত্যেরও সফলতার মূল এই সহানুভূতি, লেখকের সঙ্গে পাঠকের এই আকাঙ্ক্ষার যোগ।' সুতরাং বক্তা ও শ্রোতার ভাব লইয়া প্রসঙ্গের

পরিবর্ত্তি, তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনার তারতম্যে কথক বিষয়ের রূপ ও গুণের পরিচয়,— সাহিত্যেও তাই। 'শিশু-হৃদয়ে' রূপকথার প্রসার, 'রূপকথার' বিশেষত্ব তার অসাধারণত্ব। শিশু তার অদ্ভুত কল্পনায় অদ্ভুতত্বের পক্ষপাতী। সেই শিশুই আবার যৌবনে স্বাভাবিক আকর্ষণে বাস্তবের উপাসক। দৈনিক জীবনের ঘটনাবলী, সংসারের বাস্তব চিত্র-বিচিত্র, সংসারের মানব-প্রকৃতির শতসহস্র দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যুবক ব্যগ্র। কাব্য তাহার দর্পণ। যে কবি, যে শিল্পী তাঁহার মায়া-মুকুর নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত, যাহার দেশের পট প্রদর্শনের ন্যায় জীবন্ত সত্য, প্রকৃত দৃশ্য-ছায়া যথাযথরূপে মুকুরে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ, তিনি কবি—সফলকাম। ডাক্তার নরেশচন্দ্র উপন্যাসাদির সাহায্যে এরূপ অনেক তথ্যই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচ্য সন্দর্ভটিকে হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আরও এরূপ আলোচনা করিয়া আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রকে উপকৃত পরিতৃপ্ত করিবেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন, তাহাতে আশা করিবার মত আমাদের অনেক আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ

৭ম বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'এক কথা।*

সুখের শৈশবে স্নেহকোমল পিতৃক্রোড়ে বসিয়া শিখিয়াছিলাম, "বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।" বীণা ও পুস্তকে যাঁর কোমলকর সুশোভিত, সেই সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করি। তার পর বয়োবৃদ্ধি সহকারে ব্রাহ্মণোচিত কুলবৃত্তির মহিমায় যখন বাগ্‌দেবী বীণাপাণির ধ্যানটি কণ্ঠস্থ করি, তখন শিখিয়াছিলাম, "নিজকর কমলোদ্যা—লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।" যে বাগ্‌দেবীর হস্তে লেখনী ও পুস্তক শোভিতেছে তিনি সকল বিভব সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকাংশে 'পুস্তক' শব্দে কেবল পড়ার কথাই পাই, কিন্তু পরোক্ত ধ্যানে "লেখনী পুস্তক"

* কুচবিহার সাহিত্য সভায় পঠিত।

শব্দে লেখাপড়া দুইই বুঝায়। অনন্তর আর একটু বড় হইলে অর্থাৎ প্রৌঢ় কৈশোরে হিতোপদেশে পড়িলাম, "বিদ্যাশস্ত্রঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ দ্বে বিদ্যে প্রতিপত্তয়ে।" শস্ত্র ও শাস্ত্র দ্বিবিধ বিদ্যাই মানবের প্রতিপত্তি লাভের মূল। এখন ক্রমশঃ উদ্ধৃত তিনটী পদাংশের সার দাঁড়াইল যে, শস্ত্রবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যায় সুশিক্ষিত মানব প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী। প্রথম উদ্ধৃত শ্লোকাংশটী কোন্ গ্রন্থের তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ওটী যে প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। বেদাদি শাস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্ব্বেদাদি শস্ত্রবিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত বিদ্যা ভারতে দীর্ঘকাল প্রচলিত। এই সনাতনীবিদ্যা স্রষ্টার মানসী সৃষ্টির অতি বর্ষীয়সী সহচরী। ভারতীয় আদি সংস্কৃত গ্রন্থ সামবেদের সায়নীয় ভাষ্যের অবতরণিকায় দেখিতে পাই, "সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ, অথ ক ইমে গীত্যুপায়া নাম? উচ্যতে—গীতিনাম ক্রিয়াহ্যাভ্যন্তর প্রযত্নজন্যা, স্বরবিশেষণামভিব্যঞ্জিকা; সামশব্দাভিলাপ্যা. সা নিয়তপ্রাণা ঋচি গীয়তে। তৎ সম্পাদনার্থেহয়মৃগক্ষরবিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষনাভ্যাসো বিরামঃ স্তোভঃ ইত্যেব মাদয়ঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে" ইতি। মীমাংসা-দর্শনের নবম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদে "অপৈকত্বাৎ বিকল্পঃস্যাৎ।" এই সূত্রের ব্যাখ্যাকালে শবরস্বামী স্পষ্ট বলিয়াছেন.—"সামবেদে বহুতর গীতি সাধন, সেগুলি কি? বলি, অভ্যন্তর প্রযত্ন জন্য ক্রিয়া বিশেষকে গীতি বলা যায়। তাহাই বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি বিবিধ স্বরের অভিব্যঞ্জক, উহাকেই সাম বলা যায়, তাহা পরিমিতাক্ষরাদি নিয়মে গ্রথিত ঋক্ (পদ্য) অবলম্বন করিয়া গীত হইয়া থাকে। কেবল স্বরই এই গীতির সম্পাদক নহে, প্রযুক্ত ঋক্‌গুলির কোন স্থানে অক্ষর বিকার, কোথায় বা বিশ্লেষ, কোথা বা বিপ্রকর্ষ, স্থান বিশেষে অভ্যাস, নিয়মানুসারে বিরাম এবং স্তোভযোগ প্রভৃতিও বহুতর সাধনা আছে, তৎ সমস্তই সামবেদে শ্রুত হওয়া যায়।" এই সন্দর্ভটীর বিবরণ করিলে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইবে বিবেচনায় সে প্রয়াস পরিত্যক্ত হইল। অভিজ্ঞ পাঠক উহার লিপিভঙ্গীতে ভারতীয় সঙ্গীত তত্ত্বের অনেকটা সন্ধান পাইবেন। বস্তুতঃ আমরা বুঝি আর নাই বুঝি; স্বীকার করি বা না করি, জননী জন্মভূমির সুখ-শীতল অঙ্কে স্থান লাভ করিবার শুভক্ষণ হইতে উহা ত্যাগ করিবার অশুভক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের বিশ্ববিমোহন করুণমধুর যে সঙ্গীত লহরী ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অহোরাত্র আমাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" প্রাণমন মাতাইয়া তুলিতেছে, ঐ অনশ্বর সঙ্গীতের সনাতনী সত্তার অপলাপ

করা আর জীবন্ত মানবের প্রেতত্বখ্যাপন করা তুল্য কথা। এই স্বতসিদ্ধ সত্যের প্রমাণের জন্য অন্য সাক্ষী হাজির করিবার প্রয়োজন নাই। আপন আপন জীবনের কথা ভালরূপে মনে করিয়া দেখিলে স্পষ্টই সপ্রমাণ হইবে যে, বিশ্বসঙ্গীতের চিরউন্মুক্ত মহান্ উৎস ভারতে এমন কোন অভাগা জন্মগ্রহণ করে নাই, যে কোনদিন সুখ দুঃখময় সঙ্গীতের আস্বাদ লাভে একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছে। জন্ম-বধির ব্যক্তি সঙ্গীতের শ্রবণ প্রত্যক্ষে অনধিকারী হইলেও, সুগায়কের গীতিভঙ্গীদর্শনে সে উহার মানস প্রত্যক্ষে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়া থাকে। মানবের স্বচিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির ন্যায় পরচিত্তরঞ্জিনী নামে একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে। স্বার্থমূঢ়তা বশতঃ মাদৃশ মানবের এই বৃত্তিটির (Faculty) যথাযথ অনুশীলন (Culture) হয় না বলিয়া সেটী যে একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে। আমরা, কেবল আমরা কেন, সমধর্ম্মী (Sociable) জীবমাত্রই নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনের ছন্দোহনুবর্ত্তন করিয়া উহাদের মনোরঞ্জন সাধনে সতত ব্যতিব্যস্ত। ভারতের অমর কবি কালিদাসের দিব্য কাব্য অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখিতে পাই, মধুকরী তৃষ্ণার্ত্তা হইয়াও স্বীয় প্রিয়তমের প্রতিক্ষায় মধুপান করিতেছে না, কৃষ্ণসার মৃগ শৃঙ্গের অগ্রভাগ দিয়া প্রিয় স্পর্শসুখে অর্দ্ধমুদ্রিতনয়না প্রিয়তমা হরিণীর গাত্রকণ্ডুয়ন করিতেছে। আবার ভাবের কবি ভারত-বিভূতি ভবভূতি করুণ রসের অফুরন্ত নির্ঝর (spring) উত্তর-চরিতে দেখাইতেছেন, জলবিহারীমত্তকরী শুণ্ডাগ্র দ্বারা জল তুলিয়া প্রিয়া করিণীর গাত্র প্রক্ষালিত করিয়া দিয়া একটি সনাল নলিনীপত্র আতপত্র রূপে উচ্চে ধারণ করিয়া প্রিয়ার গাত্রপতিত সূর্য্যাতপ নিবারণ করিতে ব্যগ্র রহিয়াছে। তির্য্যক্ জাতির (inferior animals) পরমনোরঞ্জিনী বৃত্তি যখন এত প্রবল, তখন সমাজবদ্ধ শিক্ষিত মানবের সে বৃত্তি অভ্যাসস্ফূর্ত্ত না হউক কতকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইহা নিশ্চয়। চতুঃষষ্ঠি কলা বিদ্যার শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতের ফল স্বচিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা আত্মবিনোদন ও পরচিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা পরমনোরঞ্জন। এজন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্যগণ সঙ্গীতরসে বঞ্চিত মানবগণকে শৃঙ্গপুচ্ছহীন দ্বিপদ পশু বলিয়া তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ পশু তৃণভোজী, আর এই শ্রেণীর পশুরা তৃণভোজী হইলে প্রকৃত পশুদের জীবিকার উচ্ছেদ হইবে বলিয়া ইহারা তৃণ ভোজনে বিরত, এইরূপ একটি বিবৃতি দিয়া স্বীয় উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। নিঃস্বগুণ্ঠনবাগ্মিপ্রিয় কাব্যরসিক সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই যে কেবল এই

রূপ অসঙ্গীতজ্ঞতার দোষবাদে মুক্তকণ্ঠ, তাহা নহে। পাশ্চাত্য কবিকেশরী সেক্সপিয়ার (Shakespear) তাঁহার "মার্চেণ্ট্‌ অফ্‌ ভিনিস্‌" নামক সুবিখ্যাত নাটকে লিখিয়াছেন,—

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils ;
The motions of his spirit are dull as night,
And his affection dark as Erebus ;
Let not such man be trusted"

Merchant of Venice, Act V. Scene I.

উদ্ধৃত সন্দর্ভের ভাবানুবাদ করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে মানবের হৃদয়ে সঙ্গীত বা সঙ্গীত অনুভূতির শক্তি নাই, যে মানবের মন সঙ্গীতের বিমোহন তানে বিগলিত হয় না, সে রাজদ্রোহী, দুরভিসন্ধিপরায়ণ অথবা দস্যু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাহার প্রবৃত্তি সকল অমানিশার ন্যায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন, তাহার প্রেম চিরতমসাবৃত রসাতলের ন্যায় একান্ত দুর্বিগাহ ; এরূপ মানব বিশ্বাসের অপাত্র। সুকবি নবীনচন্দ্র বর্ণিত করিয়াছেন,—

"হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে রসের প্রধান।"

আমরা দেখিতেছি স্বাধীন দেশের কবি স্বাধীন চিত্তের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়া স্বাধীন কণ্ঠে অসঙ্গীত-রসিকের প্রতি যেরূপ অসংযত অপভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার নিকট আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের দোষবাদ প্রশংসাবাদ তুল্য। এই সব দেখিয়া শুনিয়া স্বতঃই মনে ধারণা হয় যে এই রোগ, শোক, দুঃখদারিদ্র্যময় জগতে একমাত্র সঙ্গীতই অপার্থিব স্পর্শমণি। ইহার সংস্পর্শে মলাকীর্ণ লৌহ খণ্ডের সুবর্ণভাব প্রাপ্তির ন্যায় অনন্ত শক্তিশালী সঙ্গীতের পীযূষরসস্পর্শে দুঃখদাবদগ্ধ হৃদয়ও তৎকালে শান্তির অমৃত হ্রদে সুখে অবগাহন করিতে থাকে। এখন 'এই মহামহিমময় সঙ্গীতের স্বরূপ কি, কোন্ পদার্থকে প্রকৃত সঙ্গীত বলা যাইতে পারে'—তাহার একটু অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সত্য কথা বলিতে

কি, সঙ্গীত শব্দটি আবাল্য শ্রুত হইলেও সহাবস্থিত চিরশ্রুত দেহদেহীর ভেদজ্ঞানের ন্যায় উহা আমাদের একান্ত সন্নিহিত হইলেও অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট, এবং নিতান্ত পরিচিত হইয়াও চির অপরিচিতের ন্যায় অনুভব পথের বহুদূরে অবস্থিত। অবশ্য যাঁহারা সঙ্গীতবিজ্ঞানে বিজ্ঞ, বিচক্ষণ তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি কেবল আমার মত অবিজ্ঞের পক্ষেই সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ অতি দুর্বোধ ও সুদীর্ঘ কালের শিক্ষা, অভ্যাস এবং সাধনা ব্যতীত উহার উপলব্ধি হয় না বলিতেছি। অজ্ঞের পক্ষে বিজ্ঞোচিত আলোচনা অসঙ্গত ও অসমীচীন হইলেও দুরূহ বিষয় শিক্ষার চেষ্টা বা তৎ সম্বন্ধে যথামতি আলোচনা করিবার অধিকার সার্ব্বজনীন বলিয়া একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'সঙ্গীত কাহাকে বলে'—এ প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে বিবিধ বিদ্যাবিৎ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত।" দুরূহ সঙ্গীত পদার্থের এরূপ সংক্ষিপ্ত, সুসঙ্গত, নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষণ (Definition) অন্যত্র সুদুর্লভ বোধে আমি এইটিরই কিঞ্চিৎ বিবরণ করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টিত হইতেছি। উক্ত লক্ষণের সাহায্যে সঙ্গীত বুঝিতে হইলে উহার অন্তর্ভূত শব্দ ও সুর পদার্থ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ শব্দের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে সুরের মূর্ত্তিটি বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে বিবেচনায় শব্দের কথাই বলা যাইতেছে। অগণ্যবস্তুপ্রপঞ্চময় জগৎ মাত্র পাঁচটি উপায়ে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত হইয়া থাকে। সেই উপায়পঞ্চকের নাম চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের রাজা বা পরিচালক মন। কারণ মনঃ সংযোগ না হইলে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই ব্যাপার বা কার্য্য হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মে। এই শব্দ নিরাকার ও নিষ্ক্রিয়গুণ পদার্থ। দুইটি বস্তু পরস্পর আহত হইলে ঐ অভিঘাত হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের একত্র মিলনের নাম সংযোগ। ঐরূপ সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শব্দকে সংযোগজগুণ কহে। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে শব্দোৎপত্তির নিম্নোক্তরূপ প্রণালী বর্ণিত আছে। দৃঢ়সংহত বা জমাটবদ্ধ পরমাণুসংহতি বস্তুর ঘনত্বের উৎপাদক। ঐ ঘনসংহত পরমাণুময় বস্তুদ্বয় পরস্পর অভিহত হইলে উহাদের পরমাণু মধ্যে একটা কম্পন জন্মে। ঐ কম্পনের বেগজ আঘাতে আহত বস্তুদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু তরঙ্গ কম্পিত হইয়া থাকে। তখন বীচি তরঙ্গের ন্যায় অর্থাৎ লোষ্ট নিক্ষেপে ক্ষুব্ধ সলিল সরোবরের প্রথম উত্থিত তরঙ্গের বেগে যেমন

চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া সমগ্র সরোবরটী তরঙ্গায়িত করে, সেইরূপ আঘাত কম্পিত বায়ুর ধাবমান তরঙ্গ তরঙ্গ পরম্পরায় আমাদের কর্ণপটহে আহত হইলে উহার সহিত সংলগ্ন শব্দবাহিনী নাড়ীর সংস্রবে ঐ শব্দ অন্তঃকরণে প্রতিফলিত ও তদাকারে আকারিত হইয়া শব্দজ্ঞান উৎপাদন করে। মন যদি এ সময়ে নিদ্রিত বা অন্য কোন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শব্দের স্বরবাহিনী নাড়ীর সহিত সম্পর্ক সত্বেও শব্দ জ্ঞান জন্মে না। নিদ্রা ও কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার সময়ে ইহা আমাদের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে কদম্ব কেশরের ন্যায়ে অর্থাৎ কদম্ব পুষ্পের একটি কেশরের পর যেমন পর পর বহু কেশর সন্নিবিষ্ট, তদ্রূপ মূলশব্দোৎপত্তির সমকালে তাহার চতুর্দ্দিকে বহু শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শব্দোৎপত্তির কালের যৌগপদ্য ও কিঞ্চিৎ ব্যবধানই উভয় মতের পার্থক্য। এই শব্দোৎপাদক বায়ু প্রকম্পনই সুরের জনক। এই প্রকম্পনের মাত্রা-গুলিন সমকালিক হইলে সুর জন্মে। সুধীন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন,—"দুইটি প্রকম্পনের মধ্যে যে কাল গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ মাত্রার সমতা মাত্র, শব্দ প্রকম্পনের সেইরূপ থাকিলে সুর জন্মে। যে শব্দে সমতা নাই তাহা সুর রূপে পরিণত হয় না; সে শব্দ বেসুর অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।" এই বিবৃতির ফলিতার্থ, সুরতান সম্বলিত শব্দের মিল বা ঐক্যতান সঙ্গীত। কবিবর Shakespear পূর্ব্বোক্ত পদ্যে ইহাকেই "Concord of sweet sounds" বলিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে মহাদেবের নৃত্যবাচক তাণ্ডব এবং পার্ব্বতীর নৃত্যবোধক লাস্য এই উভয় শব্দের আদ্যবর্ণের "তা" ও "ল" এর সম্মিলনে 'তাল' শব্দের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিধানকার অমরসিংহ "তালঃ কাল ক্রিয়ামানম্" গান ও বাদ্য বিষয়ে কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণ বিশেষকে তাল বলিয়াছেন। সচরাচর একটি সুর যতটুকু সময় ধরিয়া গীত হইতে থাকে, ঐ সময়ের মধ্যে গের সুরটী কতটুকু বিলম্বিত (ঢিমে), কতটুকু দ্রুত (জলদ) কতটুকু মধ্য অর্থাৎ না বিলম্বিত না দ্রুত হইবে ইহা বুঝাইবার জন্য হস্তাঙ্গুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণ রূপ সঙ্কেত দ্বারা কাল ও ক্রিয়ার যে পরিমাণ করা হয়, উহাকেই তাল বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শব্দ সঙ্গীতের দেহ, সুর ও তাল ইহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্থানীয়। এ জন্যই সুরতালবিহীন শব্দ সমষ্টি গীত নামে অভিহিত হয় না। সঙ্গীতের

মূল শব্দ দুই ভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের দ্বিবিধ নামকরণ হইয়াছে। প্রথম কণ্ঠ-সঙ্গীত (Vocal music), দ্বিতীয় যন্ত্র-সঙ্গীত বা (Instrumental music) শব্দের সংজ্ঞা দ্বৈবিধ্যই সঙ্গীতের দ্বিবিধ নাম করণের কারণ। বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু এই অষ্ট স্থানে যখন শারীর বায়ুর আঘাত জন্মে, তখন ঐ আঘাতজ শব্দগুলিকে বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণ যখন সুর ও তালে সহিত সম্মিলিত হয়, তখন ইহার নাম কণ্ঠ-সঙ্গীত। একটি পূর্ণ সঙ্গীতে দন্ত্য আদি পৃথক পৃথক বর্ণের সমাহার থাকিলেও নাভিমূল হইতে উত্থিত নাদ বায়ু সর্ব্ব প্রথম কণ্ঠে আহত হইয়া বর্ণরাজ অকারকে উৎপন্ন করে এবং ঐ অকার সর্ব্ব বর্ণের মূল বলিয়া "প্রধানেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি" অর্থাৎ প্রধানের নামে গৌণের নামকরণ হয়, এই রীতি অনুসারে উহাকে কণ্ঠসঙ্গীত বলা হইয়া থাকে। অকার যে সর্ব্ববর্ণের প্রথম ও প্রধান তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি" এই শ্লোকাংশের তাৎপর্য্যের প্রতি সাভিনিবেশ মনোযোগ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ—মৃদঙ্গাদি বাদ্য যন্ত্র আঘাত করিলে যে সকল শব্দ জন্মে, উহাদের নাম ধ্বনি। এই ধ্বনি সুর ও তালের অনুগামী হইলে যন্ত্রসঙ্গীত নাম ধারণ করে। সুরতালবর্জ্জিত ধ্বনি অর্থাৎ বিশৃঙ্খল যন্ত্রশব্দ সঙ্গীত না হইয়া শ্রুতিকটু হইয়া থাকে। সঙ্গীতের অনুগত বলিয়াই বোধ হয় চলিত কথায় বাদ্যকে "সঙ্গৎ" বলা হয়। আমাদের দেশে বীণা, তানপুরা, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, একতারা প্রমুখ তন্ত্রীবদ্ধ; বেণু, মৃদঙ্গ, মুরজাদি অতন্ত্রীবদ্ধ যন্ত্র সমুখ দুই প্রকার যন্ত্র সঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়। কাল ও রুচিভেদে হারমোনিয়ম্, পিয়ানো প্রভৃতি বিবিধ বিদেশী যন্ত্র এখন স্বদেশীয় যন্ত্রগুলিকে একরূপ নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। দেশে বর্ণ সঙ্কর, শিক্ষা সঙ্কর, ভাষা সঙ্কর, ও সমাজ সঙ্করের ন্যায় সঙ্গীত সঙ্করও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে সঙ্গীত বিদ্যার উপযুক্ত চর্চ্চার বিলোপ ঘটায় উচ্চ অঙ্গের দেশীয় সঙ্গীত ধ্রুপদ,—খেয়াল প্রভৃতির প্রচলন নাই বলিলেই হয়। ফলে উহাদের নিত্য সঙ্গী তানপুরা, এস্রাজ প্রমুখ দেশীয় সঙ্গীত যন্ত্রগুলির অপঘাত মৃত্যু ঘটিতেছে। আমরা কৈশোর বয়সেও রঙ্গিল কঞ্চুকাবৃত তানপুরা হস্তে বহু কলাবৎকে দেশীয় রাজা মহারাজা ও ধনীর মজলিসে পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতের আলাপ করিয়া রীতিমত পুরস্কৃত হইতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। পূর্ব্বতন যাত্রার দলে তানপুরা ও বেহালার একাধিপত্য ছিল।

সময়ে সময়ে শ্রোতাগণ অভিনয় স্থগিত করিয়া "সূর্য্য" প্রভৃতি খ্যাতনামা স্বর্গীয় ওস্তাদের বেহালার গান, "রামকৃষ্ণ গদাই" প্রমুখ জুরীর অপূর্ব্ব রাগ রাগিণী সম্বলিত, মেঘমন্দ্র, তানপুরা-ধ্বনি মিশ্রিত উদাত্ত গম্ভীর সঙ্গীতের আলাপ শুনিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন। এখন সেরূপ গায়ক ও শ্রোতা উভয়ই বিরল। কালের গভীর কুটিলাবর্ত্তে লোকাভিরাম রাম, মর্ত্ত্যের অমরাবতী অযোধ্যা উভয়ই চির নিমগ্ন হইয়াছে। ভারতে আর আদি কবি ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ পবিত্র সামগানে মুখরিত হয় না, অনন্তবদন অনন্তদেব গীতপ্রিয় ভগবানের স্তুতি গীতি গানে উৎসাহহীন; দর্শন পুরাণের প্রথম ও প্রধান গায়ক ব্যাসদেবের পাঞ্চজন্যনিন্দী কণ্ঠস্বর নীরব নিস্তব্ধ। রামায়ণের ঋষি বাল্মীকির মধুময়ী বীণা ছিন্নতন্ত্রী, তাঁহার সাধের শিষ্য কুশীলবের কিন্নরকণ্ঠ চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা আর অযোধ্যার "প্রাসাদোপম পৌর ভবনের মুরজমন্দ্র মধুর সঙ্গীত লহরী ভারতের দিগ্‌দিগন্তপ্রান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে পাই না। বৃন্দাবনের বনে বনে গোচারণকারী গোলোকবিহারী যমুনাকাণ্ডারী শ্রীহরির ভুবনমোহন বেণুর কলতানে অর্দ্ধচর্ব্বিততৃণকবলমুখী ধেনু যূথকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতে, কলনাদিনী স্বচ্ছতোয়া যমুনা তটিনীকে দুকূল প্লাবিত করিয়া উজান বহিতে, পুণ্যজন্মা বৃক্ষশ্রেণীকে সুগন্ধি পুষ্প, সরস ফল ও স্নিগ্ধ মধুধারা বর্ষণ করিতে, মধুপানমত্ত মধুকর কুলকে মধুর গুঞ্জনে বিভোর থাকিতে, কলনাদী কোকিল আদি বিহগ কুলকে কাকলীতানে মুগ্ধ হইতে; আর সর্ব্বোপরি কৃষ্ণৈকপ্রাণা প্রেমমূর্ত্তি ব্রজাঙ্গনাগণকে অকালে গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র ও প্রিয় দর্শনের অন্তরায়ভূত পতি স্বজনকে ছাড়িয়া, আপনা পাসরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমানা হইতে দেখিতে বা শুনিতে পাই না। আর দেখিনা, কীর্ত্তনাবতার গৌরাঙ্গসুন্দরের স্থাবর জঙ্গম মাতান, হিংস্রশ্বাপদ ভুলান, আকাশ পাতালভেদী কীর্ত্তনের রোলে নদীয়া শান্তিপুর তোলপাড় হইত। জানি না কোন্ অজ্ঞাত অভিশাপের দুরন্ত প্রভাবে অমরবাঞ্ছিত ভারতে বিমল অনন্দধারাবাহিনী গীতি ভাগীরথী আজ এই ভয়াবহ কীর্ত্তিনাশার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এখন ঘরে ঘরে গ্রামোফোন যেমন কণ্ঠসঙ্গীতের স্থান অধিকার করিয়া ভারতীয় গায়ক গায়িকার পিকবিনিন্দি কণ্ঠস্বরকে কিম্ভুত-কিমাকার করিয়া তুলিয়াছে,—পক্ষান্তরে মজলিসে মজলিসে যন্ত্রসঙ্গীতের স্থানও তেমনি হারমোনিয়ম্ আদির দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় ক্রমশঃ ঐ সকল দেশীয় সুকুমার কলাবিদ্যার আত্যন্তিক ধ্বংস

ঘটিতেছে। দেশভেদে জলবায়ুর গুণবৈষম্যে মানবের কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ শক্তির বিষম বৈষম্য ঘটে,—ইহা আমরা সকলেই জানি। একজন খাঁটি ইউরোপীয়ান্ বা ইউরোপে ভূমিষ্ঠ, লালিত, পালিত, শিক্ষিত ব্যক্তি যেরূপ নির্দোষ ও সর্বাঙ্গসুন্দর ইংরেজীভাষা উচ্চারণ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন, অন্য দেশীয়ের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপরদিকে একজন খাঁটী ভারতীয় নিজ মাতৃভাষা যেরূপ সুন্দর ভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন, অপর দেশীয়ের পক্ষে উহা অসাধ্য ব্যাপার। অধিকদূর যাইতে হইবে না, ভারতবাসীদের মধ্যে কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যেরূপ বিশুদ্ধি ও শ্রুতিমাধুর্য্যের সহিত দেবভাষা উচ্চারণ করিতে পারেন, তথাকথিত বঙ্গবাসী পণ্ডিত আমরা তাহার যোগ্য অনুকরণেও অসমর্থ। তৎতৎ দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করিয়া অভ্যাস ও আলোচনার সাহায্যে কতকটা সাদৃশ্য লাভ হইলেও সাম্য সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। একজন খ্যাতনামা ভাষাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "ইউরোপে পনর যাইল অন্তর ভাষাভেদ বর্ত্তমান।" আমাদের দেশেও "দেশান্তর ভাকা, কেউ বলে চুণো কেউ বলে আকা" এইরূপ একটি প্রাচীন ভাষা প্রবাদ ঐ মতেরই সমর্থন করে। বিষয়টী মূল প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নহে। সুতরাং এখানেই বিরতি দিয়া প্রকৃতের অনুসরণ করিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের জাতীয় গীত যন্ত্রগুলি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ বিজ্ঞ সাধকতম কলাবৎদিগের দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি দেশীয় সুরে সুসংবদ্ধ গীত ও বাদিত হইয়া আসিতেছে। বিদেশীয় যন্ত্রগুলি আজ যদি সহসা ভারতবাসিসুলভ কোমল কণ্ঠস্বরের সহিত বাদিত হইতে থাকে, তাহা হইলে "ঢাকের পিঠে সানাইয়ের গান" হইবে। কালের গতি ও সমাজের রুচি ভেদে শিক্ষা, ধর্ম্ম, নীতি, গীতি সকলেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু পরিবর্ত্তন ও পরিণাম এক জিনিষ নহে। শিশু পরিবর্ত্তিত হইয়া যুবা এবং বৃদ্ধ হইতে পারে, হইয়াও থাকে, কিন্তু তাহার কখনও বানরে পরিণতি হয় না। আমাদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর যাহাতে বিকৃত না হয়, আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের উৎকর্ষ ও প্রকৃত মাধুর্য্য যাহাতে অক্ষত থাকে, এইরূপভাবে বিদেশীয় যন্ত্র প্রচলন বর্ত্তমান কালের সকলেরই ইষ্ট, কিন্তু 'ঘরকে পর করিয়া পরকে ঘর' করিবার চেষ্টা করিলে ইষ্টলাভ হইবে না বরং উত্তরোত্তর অনষ্টের দাবানল দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে। প্রয়োজনের তাড়নায় রাজভাষা এখন আমাদের নিত্যারাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা

সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ঐ ভাষা কেবল আমাদের কর্ম্মজীবনের উপযোগীরূপেই শিক্ষণীয়। হিন্দুর গার্হস্থ্য বা ধর্ম্মজীবনে উহা কখনও উপাস্য হইতে পারে না। মাতৃভাষা ইষ্টদেবতার ন্যায় উপাস্য। কিন্তু রাজভাষা মাত্র বহু পূজার পাত্র। বিদেশীয় ধাত্রীর ক্রোড়ে লালিতপালিত ধনীর সন্তান যদি আজন্ম বিদেশী বুলি শিখিয়া স্নেহময়ী জননীকে অনাদর করে ও স্বীয় মাতৃভাষার মাতৃ সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করে কিম্বা অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পবিত্র ভারতে উহার জন্মগ্রহণ প্রাক্তন মহাপাপের শাস্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সঙ্গীতের দেহ শব্দ, আর সেই শব্দের রক্তমাংস বর্ণমালা। ত্রয়োদশ স্বর ও পঞ্চত্রিংশৎ ব্যঞ্জন, এই বর্ণমালায় যে শব্দময় সঙ্গীতের জন্ম, ইংরেজী পঞ্চ স্বর ও একবিংশতি ব্যঞ্জন মিলিত মাত্র ষড়্‌বিংশতি বর্ণে গ্রথিত অপূর্ণ বর্ণমালার সাহায্যে আমাদের দেশের সপ্ত স্বর, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী অবিকলরূপে ধ্বনিত ও গীত হইতে পারে কি না তাহাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক বর্ণের এক একটি নিজস্ব আছে। বর্ণের ন্যূনাধিক্যে যদি ধ্বনির অল্পাধিক্য ঘটে, তাহা হইলে ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীতে বর্ণের অল্পতায় সুরের ন্যূনতা ঘটা স্বাভাবিক। ইংরেজী ভাষার কোন কোন খ্যাতনামা বৈয়াকরণিক তাঁহাদের ভাষার বর্ণমালার এইরূপ বিকলাঙ্গতার কথা স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল।

সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পররঞ্জন ও আত্মবিনোদনই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীব উদ্দেশ্যের ক্রীতদাস। স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনের অহরহ প্রচেষ্টাই জীবের জীবনকে সজীব রাখিয়াছে। নিরলস পিপীলিকার ন্যায় আমরা অনুক্ষণ স্ব উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর। সেই সাধনার পথ যতই সুগম, সহজ ও অনায়াসগম্য হয়, ততই শ্রী শুভকর হইয়া থাকে। এই হিসাবে সংসারে সুখের পথের পথিক জীবের নিকট সঙ্গীত যেমন পরম ও চরম সম্বল, তেমন আর কিছুই নহে। প্রাচীন আচার্য্যেরা বলিয়াছেন, "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" কিংবা "গানাৎ পরতরং নহি।" অর্থাৎ তাঁহাদের একদল জ্ঞানবাদী, অন্যদল গানবাদী।" জ্ঞান ও গান উভয়ই মুক্তির সাধন পথ। কিন্তু রেলপথে বিলাত যাত্রা করিতে পারিলে জলপথের যাত্রী যেমন আপনা আপনিই হ্রাস পায়, জলপথের নিন্দাবাদের দ্বারা আর বিলাত যাত্রীর প্রবৃত্তি রোধ করিতে হয় না, ঠিক তেমনি দীর্ঘকাল সাধ্য কঠোর শমদমাদিলভ্য তত্ত্বজ্ঞান ছাড়িয়া নিত্য সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত মানব গার্হস্থ্যধর্ম্মসুলভ গানেরই শরণ লইয়া

থাকেন। সঙ্গীতের স্বরূপ কীর্ত্তন অসাধ্য ব্যাপার। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, "তিনি তাঁহার নিত্যধাম গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন না; যথায় তাঁহার ভক্তগণ গান (সংকীর্ত্তন) করেন, তথায় তিনি নিত্য বিরাজিত।" যে গানে দেবাদিদেব মহাদেব পরম যোগী, মহর্ষি নারদ সংসার ত্যাগী চিরবৈরাগী, যে গান পৃথিবীর প্রতি রেণুকম্পনে, নদনদীর কুলুকুলু তানে, সৌরালোকের কণককিরণ কম্পনে, সুধাকরের মধুবর্ষী কৌমুদীচ্ছটাস্পন্দনে, মহাব্যোমের বিশ্ববিসারী প্রতিবিম্ব শিহরণে, সমীরণের অব্যক্ত মধুর নিরত নিঃস্বনে, প্রভাত-বায়ুর সুখশীতল স্পর্শে, বিহগকুলের ঊষাকীর্ত্তন কলরবে, ফুলরেণুচুম্বি অলিগুঞ্জরণে, পত্রপুঞ্জের মর্ম্মর নিক্বণে, অমানিশার নিশীথ নিস্তব্ধতায়, রাকাচন্দ্রের ভুবনমোহিনী ময়ূখমালায়, প্রভাতের শীত প্রশান্ত মধুস্নিগ্ধতায়, মধ্যাহ্নের রুদ্র গম্ভীর গাম্ভীর্য্যে, সান্ধ্য শান্তির অস্ফুট ছায়ায়, শিশুর অহেতুক হাস্য ক্রন্দনে, জননীর সোহাগ তাড়নে, পিতার লালনর্ভৎসনে, ভ্রাতার আদরআপ্যায়নে, ভগিনীর শুশ্রূষাযত্নে, বন্ধুর প্রীতিআলাপনে, প্রভুর নিগ্রহানুগ্রহ বিতরণে, রাজার প্রজারঞ্জনে, প্রজার—রাজভক্তি-উপঢৌকনে, প্রিয়তমার সপ্রেম-সম্বোধনে, শৈশব-দোলার মৃদুমন্দ হিন্দোলনে, বিবাহ বাসরের মহোল্লাস-কল্লোলে, মৃত্যুশয্যার অন্তিম-মর্ম্মোচ্ছ্বাসে, অবিরত আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতে, কখনও ব্যক্ত কখনও অব্যক্ত, কখনও মিলন কখনও বিরহ, কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও করুণ কখনও কঠোর সুরে ঝঙ্কৃত অনুঝঙ্কৃত হইতেছে, সেই বিরাট্ বিশ্বরূপী মহান্ সঙ্গীতের কথা বলিবার উপযুক্ত ভাষা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনায়ত্ত।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

পতিত জার্ম্মেণীর শিক্ষা সংস্কার।

(১) আদ্য ও মধ্যশিক্ষা।

আদর্শের পরিবর্ত্তন।—শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনায় জার্ম্মেণীর শিক্ষার নূতন পরিবর্ত্তনগুলি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত। এই দেশে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ না। এই সত্যটী জার্ম্মেণীর শত্রুরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে সমাজের সকল স্তরে এই শিক্ষার বাসনা চরিতার্থ করিবার সমান সুযোগ ছিল না। সেই কারণে সমাজের নিম্ন ও মধ্যস্তরে ভিতরে ভিতরে একটা অশান্তির ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। সমাজ-তান্ত্রিকদল (social democrats) জাতীয় মহাসভাতে এই অশান্তির সংবাদ ঘোষণা করিলেও, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যাপারে দেশের শাসকসম্প্রদায় এমন শৃঙ্খলার সহিত একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল যে দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সকলেই জীবনের সমস্ত কার্য্যে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের ফল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বিশেষ ভাবে অনুভূত হইত। জার্ম্মেণীর জ্ঞানপিপাসার কথা সাধারণ ভাবে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই পিপাসা নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত নিত্য নূতন সত্য আবিষ্কারে নিয়োজিত থাকিলেও সকল আবিষ্কারই সাম্রাজ্যবুদ্ধি, শক্তিলিপ্সা, কর্তৃত্বাভিমানে রঙীন হইয়া দাঁড়াইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সত্যের মর্য্যাদা অপেক্ষা শক্তির আরাধনা ও শাসক-সম্প্রদায়ের পূজার অধিকতর সুবন্দোবস্ত ছিল। য়ুরোপীয় মহা সমরের ২০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মেণীতে সম্প্রসারিত শিক্ষাশালা, শিল্প বিদ্যালয় ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বত্রই শ্রমিকদের শিক্ষার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের পরই এরূপ চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং নূতন শিক্ষা-আইনের সাহায্যে এরূপ শিক্ষার সুব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বেসরকারী ভাবে কোথাও কোথাও এরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলেও, অর্থাভাবপ্রযুক্ত এই উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। জার্ম্মেণীতে সমাজের সকল শ্রেণীর ভিতর এই শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা যুদ্ধের পূর্ব্বেই কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা বিংশ শতাব্দীর বিরাট কুরুক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টি,

বিষাক্তধূম, জেপেলীন, ইত্যাদি মরণের নানা অদ্ভুত উপকরণের দ্বারা বিশেষ ভাবেই জগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু জার্ম্মেণীতে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য; শিক্ষা এবং শ্রম শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকিলেও, দেশীয় শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের ও সামাজিক জীবনের দাবী সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত হয়। ব্যষ্টি সমষ্টির ঐশ্বর্য্য যন্ত্রের—সমিধ্‌রূপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ব্যক্তি, পরিবার, ও সমাজের স্বাধীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হৃষ্টান্তঃকরণে বিসর্জ্জন দেওয়ার অভ্যাস অর্জ্জনই জাতীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই চেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সার্থক হইলেও একটা প্রচ্ছন্ন অশান্তি ও অসামঞ্জস্যের অনুভূতি সর্ব্বত্রই বিরাজমান ছিল। রাষ্ট্রে সমাজের উচ্চতম স্তরের একটি মাত্র সম্প্রদায়ের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় সমাজ সংস্থানে দ্বন্দ্বের অভাব ছিল না। শিক্ষা বিষয়ে এই একাধিপত্য কিরূপ অশান্তির কারণ হইতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রের মরণ-যজ্ঞে সামাজিক ভেদাভেদের স্থান ছিল না, এখানে সামাজিক সাম্য প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া লোকচক্ষুর গোচর হইতে লাগিল, এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান পাণ্ডারাও শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজের সকল শ্রেণীর সমান অধিকারের দাবী অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে এই সাম্যের দাবীর স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন, যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মেণীতে যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফলে—সমগ্র দেশে স্বাধীনতার ভাব সমাজের সকল স্তরে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং শিক্ষাতেও এই স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক পরিচালনের ফলে শিক্ষায় আর সামাজিক বৈষম্যের স্থান নাই;—জীবনকে বৃহত্তর ও পূর্ণতর করিবার আকাঙ্ক্ষাই এখন দেশব্যাপী শিক্ষা প্রচেষ্টায় একমাত্র আদর্শ। জার্ম্মেণ্য কিরূপ সংস্কারের সহায়তায় শিক্ষার এই উদ্দেশ্য ও এই আদর্শ সার্থক করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছে, তাহা শুধু আমাদের দেশের নয়, জগতের সমস্ত সভ্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত।

শিক্ষার বর্ত্তমান আদর্শ।—জার্ম্মেণীর সমাজ-তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত অগ্রসর, শিক্ষা সম্বন্ধে উক্ত সম্প্রদায়ের এই বাম অংশের (Loft wing) দাবী হইতে

নব সংস্কারের আদর্শ বিশেষভাবে বোধগম্য হইতে পারে। এই দলের একজন মুখপাত্র ডক্টার ল্যোহ্বেনষ্টাইন্ (Dr Lowensetein) তাঁহার এক নবপ্রকাশিত পুস্তকে জার্ম্মেণীর সামাজিক সাম্যবাদীদের শিক্ষা সংস্কারের আদর্শ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সমস্ত দেশে আইন্‌হাইট্‌স্ স্কুলেন (Einheits schulen) অর্থাৎ বাধ্যতা মূলক শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সাম্যই হইবে এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থার মূল নীতি। এখানে এমন কি সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর প্রত্যেক বালকবালিকা যাহাতে জন্ম বা জন্মের পূর্ব্ব হইতেই নিজ নিজ জীবন যাপনের উৎকৃষ্টতম সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে হৃষ্টমনে ও চিত্তাকর্ষক আবেষ্টনের মধ্যে গর্ভিণীদের গর্ভকাল অতিবাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং আবশ্যক হইলে ছোট ছোট শিশুদিগকে কুমার কাননের অনুরূপ কুমার কুটীরে (Kinderhut) শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইবে কুমার কাননে। এখানে বালকবালিকারা আট বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া, গ্রুণ্ডস্কুলেন্ (Grund schulen) অর্থাৎ আদ্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। এই আদ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাল হইবে চোদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত। এ গুলিকে ইংলণ্ডের নিম্ন বিদ্যালয়ের সহিত তুলনা করা ভুল হইবে। এখানে লিখন, পঠন, ও গণনা, হস্ত বা কর্ম্ম শিক্ষা হইতে অধিকতর মূল্যবান বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সমবেত শিক্ষা এখানকার শিক্ষা প্রণালীর আদর্শ থাকিবে না। ছাত্র শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রীদিগকে ছোট ছোট গুচ্ছে বিভাগ করিয়া বিদ্যামন্দিরেই কর্ম্ম সংঘের (Working society) সৃষ্টি হইবে। এরূপ নানা উপায়ে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী গতানুগতিকতা বর্জ্জিত থাকিয়া যতটা অকৃত্রিম ও বাস্তব শিক্ষায় পরিণত হয়, তাহার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। এই গ্রুণ্ডস্কুলেনের শিক্ষা শেষ করিয়া বালকবালিকারা ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দেশের ওবের স্কুলেন্ (Ober schulen) অর্থাৎ উচ্চতর বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্টতর সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিবে। পরে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও বাণিজ্য শিক্ষার বিদ্যালয়ে মনোমত বৃত্তি ব শিল্প পারদর্শী হইবার, সুযোগ ও প্রবৃত্তি অনুসারে এখান হইতেই সকল বালকবালিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে। উপরের আলোচনা হইতে পণ্ডিত জার্ম্মেণীর শিক্ষার আদর্শের নিম্নলিখিত পাঁচটী

পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে :—প্রথম,—খুব শিশুকাল হইতে শিক্ষারম্ভ ; দ্বিতীয়,—সকল স্তরের শিক্ষায় সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষার সহিত কর্ম্ম বা ব্যবহারিক শিক্ষার সুব্যবস্থা ; তৃতীয়,—ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রচলন ; চতুর্থ,—শিক্ষায় সমাজের সকল স্তরের বালকবালিকার সমান অধিকার ও সমান সুবিধা, এবং পঞ্চম,—শৈশব, আদ্য, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পরস্পর সুসংযোগ।

আদ্যশিক্ষা।—কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা খুব সহজসাধ্য নয় ;—বিশেষতঃ এই জাগতিক অর্থাভাবের দিনে। জার্ম্মেণীতেও অর্থের অনাটন কোন দেশ অপেক্ষা কম নয়। সেই জন্য সেখানে শীঘ্রই যে এই আদর্শে শিক্ষা সংস্কৃত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু জার্ম্মেণীতে নানা প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত থাকিলেও, বাধ্যতা-মূলক আদ্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বত্রই শিক্ষা-সংস্কার বিধিবদ্ধভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এইরূপ বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। এখানে শিক্ষায় সকল শ্রেণীর বালক-বালিকার সমান অধিকার। দেশের সমাজ-তান্ত্রিকদিগের অপরাপর সাম্যভাবও এই বিদ্যালয়গুলিতে পরিগৃহীত হইয়াছে। শিক্ষায় রেখাঙ্কন (Drawing), চিত্রাঙ্কন (Painting), প্রতিমা গঠন (Modelling) প্রভৃতি কর্ম্ম শিক্ষার উপায়গুলিকে খুব উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। গার্হস্থ্য-জীবন ও দৈনন্দিন-জীবনই শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। একই জার্ম্মেণ ভাষা দেশের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত পৃথক বলিয়া, সকল বালকবালিকাই মাতৃভাষার প্রাদেশিক রূপটীই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করে, এবং কথোপকথন, মৌখিক রচনা ইত্যাদিও এই প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহার করিতে শিখে। শারীরিক শিক্ষার (Physical training), জল্য ক্রীড়া, ব্যায়াম ইত্যাদির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছে। যখনই সম্ভব হয়, খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে, এবং বালকবালিকারা পরিভ্রমণ ও পর্য্যটনের সাহায্যে খুব সাক্ষাৎ ভাবেই প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। দেশীয় শিক্ষা-সচিবের নির্দ্দেশ অনুসারে মাসে একদিন সকল বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকেই নিজ নিজ বর্গের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অপেক্ষাকৃত দূর দেশ পর্য্যটনে বাহির হইতে হয়।

সকল ছাত্রছাত্রীই এইরূপ আদ্যবিদ্যালয়ে আট হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ চার বৎসর শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় অব ভেদে কেহ এখানেই আরো দুই বৎসর থাকিয়া নিম্নশিক্ষা সমাপন করে; আবার কেহ চার বৎসর শিক্ষা শেষ করিয়া মধ্যবিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। ভবিষ্যতে হীন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পারদর্শী ছাত্রদের মধ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের আশা থাকিলেও, এখনও পিতামাতার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপরই এরূপ শিক্ষা নির্ভর করে। কিন্তু সকল শ্রেণীর এবং সকল অবস্থার পারদর্শী ও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ছাত্রছাত্রীদের জন্য জাতীয় শিক্ষা বিধানে শিক্ষার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখাই জার্ম্মেণীর সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিকদলের এবং জগতের সকল উন্নত দেশের শিক্ষার চরম আদর্শ।

মধ্যশিক্ষা।—মধ্যশিক্ষার বিদ্যালয়গুলির বাহ্য সংগঠনের তেমন কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও, ইহাদের আভ্যন্তরীণ অনেক সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। শারীরিক শিক্ষার উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁক দেওয়া হয়, এবং সপ্তাহে একদিন সকল বালকই বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বিভিন্ন ক্রীড়ায় যোগদান করিতে বাধ্য হয়। আদ্যবিদ্যালয়ে যেমন বালকবালিকাদের নিজ নিজ জন্মস্থান ও প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া মাতৃভাষা, ইতিহাস, ও ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এবং মাসে একবার সকল বালকবালিকাকেই শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে পর্য্যটনে বাহির হইতে হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ বন্দোবস্ত থাকে।—ইতিহাস শিক্ষার একটী উল্লেখ যোগ্য সংস্কার সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বকার ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকগুলি উঠিয়া গিয়াছে, এবং নূতন পুস্তকে যুদ্ধের মহিমা কীর্ত্তন ও রাজবংশের উত্থানপতনের বিবরণই একমাত্র আকর্ষণের বিষয় থাকিবে না। নূতন ইতিহাসের পুস্তক নূতন উদ্দেশ্যে ও নূতনভাবে লিখিত হইতেছে, এবং এইসকল পুস্তকে বিভিন্ন যুগের সভ্যতার উন্নতিই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর জার্ম্মেণীতে ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজকেরা প্রায়ই প্রাচীনমত, প্রাচীন পন্থা, এবং বিশেষভাবে জার্ম্মেণীর ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ঘোরতর পক্ষপাতি ছিলেন। তাই এখন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, এরূপ শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষার স্থান অধিকার করিলেও, এই

এই নীতি শিক্ষাও বাধ্যতামূলক নয়। অনেক বড় বড় সহরে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা এখন আর পাঠ্যতালিকা ভুক্ত থাকে না, এবং প্রচলিত বৈষয়িক (Secular) শিক্ষাই জার্ম্মেণীর শিক্ষার ভবিষ্যৎ আদর্শ।

বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষাসংস্কার গভীরভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মেণীতে একত্র শিক্ষার (co-education) ব্যবস্থা নাই; কিন্তু কোন কোন বিদ্যালয়ে সময় সময় বালিকারা বালকদের সহিত শিক্ষা লাভ করে। এখন পুংশিক্ষার অনুকরণেই স্ত্রীশিক্ষা গঠিত হইতেছে, এবং সেই জন্য বালিকা বিদ্যালয়েও নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা বর্জ্জিত, এবং বাধ্যতামূলক ক্রীড়া ব্যায়াম ও পর্য্যটন সম্বলিত ঐহিক শিক্ষাই স্ত্রীশিক্ষা সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শিক্ষকদিগের শিক্ষা।—শিক্ষক ও ছাত্রের এবং বিদ্যালয় ও গৃহের সংযোগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। জার্ম্মেণীতে শিক্ষকদিগকে পঠন ও পাঠনার পরিচালনে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করা হইতেছে। পূর্ব্বে নিম্নবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিম্নশিক্ষার পর শিক্ষণ বিদ্যালয়ে (Normal school) ছয় বৎসরের জন্য শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষাবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতেন। এখন আদ্যবিদ্যালয়ের চার বৎসরের শিক্ষা শেষ করিয়া, সকল শিক্ষককেই মধ্যবিদ্যালয়ে আরো পাঁচ বৎসরের জন্য সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ইহার পর তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এবং এখানে শিক্ষকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুচ্ছের শিক্ষা সমাপন করিয়া, নিম্নবিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হন। নিম্ন শিক্ষকদিগকে এইরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধারণ শিক্ষার অবসর দিয়া, শিক্ষকতার জন্য বিশেষ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার পর শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। বালিকাবিদ্যালয়গুলিতেও এরূপ সংস্কার বিশেষভাবেই আরম্ভ হইয়াছে।

ছাত্রদিগের স্বায়ত্তশাসন।—মধ্যবিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর বিশ্বাস ও হৃদ্যতার ভাব এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের নিয়মানুশাসনে ছাত্রদের ভিতর স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের মধ্যেও উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরা মিলিত হইয়া একটী সাধারণ ছাত্রসভা গঠন করে,

এবং এখানে বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত হয়।—কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা খুব সাধারণ না হইলেও, দেশীয় শিক্ষাসচিবের নির্দ্দেশমত প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছাত্রদের একটী প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্গ হইতে দুই একজন ছাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, এবং ইহারা বিদ্যালয়ের শাসন পরিচালনে ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর মধ্যস্থের স্থান অধিকার করে।—

অভিভাবক সভা।—গণতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মেণীতে বিদ্যালয় ও পরিবারের সংযোগ রক্ষার জন্য এমন একটী অনুষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে, যাহা অনেক দেশের অনুকরণীয়। পিতামাতাদিগের প্রতিনিধি সভা এখানে ছাত্রদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া জার্ম্মেণীর নবীন রাষ্ট্রে শিক্ষার ও স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের নীতি সুদৃঢ় করিতেছে। জার্ম্মেণীর অনুকরণে ইংলণ্ডেও এরূপ সভা গঠনের চেষ্টা হইলেও, ইংরেজ শিক্ষকগণ এরূপ সভার প্রয়োজন সম্বন্ধে এখনও বিশেষভাবেই সন্দিগ্ধ কিন্তু জার্ম্মেণীকে এ বিষয়ে এখনই বহুদূর অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। অনুষ্ঠানটী খুব নূতন কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। শিক্ষাব্যাপারে ইহার ফলাফল বিশেষভাবেই অনুসন্ধানযোগ্য। এই কারণে অনুষ্ঠানটির বিস্তৃত আলোচনা অনর্থক হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

সভার গঠন।—বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের পিতামাতার ও প্রত্যেক অভিভাবক অভিভাবিকার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে একটী মাত্র ভোটের অধিকার থাকে। একই পিতামাতার একাধিক সন্তান বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিলেও ভোটের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় না। অভিভাবক-সভার প্রতিনিধিদিগের নিম্নতম সংখ্যা পাঁচজন, এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ জন ছাত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত সভ্য দুই বৎসরের জন্য অভিভাবকসভার সভ্য থাকেন। কোন ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলে, এবং তাহার অভিভাবকসভার সভ্য, থাকিলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার দলের সভ্যপদপ্রার্থীদের তালিকায় যে অভিভাবক পূর্ব্বনির্ব্বাচনের ভোট গণনায় তাঁহার নিম্নবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই অভিভাবকই তাঁহার স্থানে সভ্যপদ গ্রহণ করেন। নির্ব্বাচনের আটদিন পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্ব্বাচিত অভিভাবকদের প্রথম সভা আহ্বান করেন, এবং এই সভার সভাপতি ও অপরাপর কর্ম্মচারী ভোটদ্বারা নির্ব্বাচিত হন। যখনই আবশ্যক হয়, সভাপতি অভিভাবক সভা

আহ্বান করেন, এবং প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর সভার অন্ততঃ একটী অধিবেশন আবশ্যক হয়। অভিভাবকসভার এক তৃতীয়াংশ সভ্যের ইচ্ছাক্রমে অথবা শিক্ষকদের অনুরোধে যে কোন সময় সভার অতিরিক্ত অধিবেশন হইতে পারে। কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োজন হইলে, সভ্যেতর অপর ব্যক্তির আমন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু ইঁহাদের ভোটের অধিকার থাকে না। বিদ্যালয়ের প্রধান ও অপরাপর শিক্ষকেরাও সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন। সর্ব্বত্রই শিক্ষকের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলেও ভোটের অধিকার থাকে না। আবশ্যক হইলে শিক্ষকদিগকে আমন্ত্রণ না করিয়াও সভার অধিবেশন হয়। ক্ষেত্রবিশেষ অভিভাবক সভা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সমস্ত অভিভাবককে একত্র করিয়া একটী সাধারণ সভায় অভিভাবকদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

সভ্যনির্ব্বাচন প্রণালী।—এই অভিভাবক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী দেশীয় শিক্ষা দপ্তর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সভ্য নির্ব্বাচনের তারিখ শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়। ভোটের অধিকার পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভোটদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সভ্য নির্ব্বাচনের অন্ততঃ চার সপ্তাহ পূর্ব্বে সাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য তালিকা কোন প্রকাশ্য স্থানে এক-পক্ষ-কাল লটকাইয়া রাখেন। ভোটদাতাগণ ইহার প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং নির্ব্বাচনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তালিকাসম্বন্ধে নিজ নিজ আপত্তি প্রধান শিক্ষকের নিকট জ্ঞাপন করিতে পারেন। এইরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া প্রধান শিক্ষক তালিকাটী সংশোধন না করিলে, নির্ব্বাচন-সমিতির নিকট প্রতিবাদের অধিকার থাকে। কিন্তু সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইলে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অন্য প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে নির্ব্বাচন শেষ হইলে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নির্ব্বাচনসমিতির নিষ্পত্তি সম্বন্ধে পুনর্বিচার প্রার্থনার অবকাশ থাকে।

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রধানশিক্ষকের আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য থাকে। অন্ততঃ চার সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহাকে অভিভাবকদের সাধারণ সভার একটী অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা অথবা ছাত্রদের সাহায্যে অভিভাবকদিগকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়। সাধারণ সভার এই অধিবেশনে তিনি অভিভাবক সভার নিয়মাবলী, ভাবী নির্ব্বাচনের

সভ্য সংখ্যা, নির্ব্বাচনের প্রয়োজন, ভোটদাতাগণের তালিকা, তালিকাসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনের শেষ তারিখ, প্রভৃতি বিষয় অভিভাবকদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। অভিভাবকদিগকে নিজ নিজ দলভুক্ত সভ্যপদপ্রার্থীদিগের তালিকা প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করা এবং এই সাধারণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের তারিখ জানাইয়া দেওয়া এই অধিবেশনের অন্যতম কার্য্য। নির্ব্বাচনের অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধিবেশন আবশ্যক হয়। প্রথম অধিবেশনের কার্য্যাবলীর পুনরালোচনাই এই সভার বিশেষ কার্য্য। নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রকাশ্য প্রস্তাব, উহাদের সমর্থন, অথবা ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচন সমিতির জন্য তিন জন সভ্য নির্দ্ধারণ এই অধিবেশনের অপর একটী কর্ত্তব্য।

নির্ব্বাচনের অন্ততঃ দশ দিন পূর্ব্বে সভ্যপদ প্রার্থীদিগের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা নির্ব্বাচন সমিতির নিকট পেশ হওয়া আবশ্যক। নবনির্ব্বাচনে যতগুলি সভ্যের প্রয়োজন হইবে, প্রত্যেক তালিকায় অন্ততঃ ততগুলি নাম থাকা উচিত, এবং প্রত্যেক তালিকায় সহরে অন্ততঃ কুড়ি জন এবং পল্লী অঞ্চলে অন্ততঃ দশজন অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন। এই নিয়মে কোন তালিকা প্রস্তুত না হইলে, নির্ব্বাচনসমিতি এরূপ তালিকা অগ্রাহ্য করিয়া, অপরাপর তালিকা কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া ইহাদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন তালিকা পরিত্যক্ত হইলে, নির্ব্বাচনের পর এরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের অধিকার থাকে। নির্ব্বাচনে প্রকাশিত তালিকাগুলির বিশেষ প্রয়োজন। প্রকাশ্য স্থানে খুব প্রকাশ্য ভাবে ভোট সংগৃহীত হয়। প্রত্যেক ভোটদাতা ভোটের কাগজে কোন একটী তালিকা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া ভোট প্রদান করেন। এই ভোটের কাগজে কোনরূপ পরিবর্ত্তন থাকিলে, অথবা একের অধিক তালিকায় ভোট দান করিলে, ভোট অগ্রাহ্য হয়। ভোট সংগ্রহ সমাপ্ত হইলে, নির্ব্বাচিত সমিতি একটী প্রকাশ্য অধিবেশন ভোটের কাগজগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত উপায় নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম প্রকাশ করেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট—তাঁহাদের নাম প্রেরিত হয়। তারপর নির্ব্বাচন সমিতির প্রত্যেক সভ্যের স্বাক্ষরযুক্ত সভ্য নির্ব্বাচনের একটী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ভোটের কাগজগুলির সহিত, শিক্ষাবিভাগের

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নিম্নবিদ্যালয়ের সম্পর্কে এরূপ বিবরণ ও কাগজপত্র জেলা শিক্ষাপরিদর্শক কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হয়।

সভ্যনির্ব্বাচন, সভ্যপদপ্রার্থীদের তালিকা, ভোটদাতাদিগের তালিকা প্রভৃতি অভিভাবক সভা সংগঠনের নানা বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রকার আপত্তি, নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার দুইসপ্তাহ কালমধ্যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। আপত্তি মাত্রেই নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে না। শেষ নিষ্পত্তি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তিনি যদি আপত্তির সত্যতা স্বীকার করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুনর্নির্ব্বাচনে ব্যবস্থা হয়।

সভার উদ্দেশ্য ও অধিকার।—বিদ্যালয়ের সহিত গৃহের সম্বন্ধ দৃঢ় ও উন্নত করা এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগীতা পরস্পরের প্রভাব সুব্যবস্থিত রাখাই বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। অভিভাবকসভা বিদ্যালয়ের পরিচালন ও নিয়মানুশাসন এবং ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদের ইচ্ছা ও মতামত প্রকাশ করেন। এই সকল বিষয়ে কোন প্রকার প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত আলোচনার অধিকার এই সভার নাই, এবং প্রকাশ্য আলোচনার বিষয়গুলি খুব সাধারণ ভাবেই বিবেচিত হয়। সকল প্রকার ব্যক্তিগত বিষয় সকল অবস্থাতেই গোপনীয় থাকে। এইরূপ গোপনীয় বিষয় ভিন্ন সভার সকল প্রকার কার্য্যের বিবরণ অভিভাবক ও শিক্ষকদের পরীক্ষা ও পরিদর্শন করার অধিকার থাকে। অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত আচরণের জন্য বিদ্যালয় হইতে সময় সময় কোন কোন ছাত্র বিতাড়িত হয়। আবার কখনও কখনও ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের অভিজ্ঞান পত্রে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে অপকৃষ্ট মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়। এরূপ মন্তব্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে, অথবা স্থলবিশেষে ইহাদ্বারা ছাত্র সমাজে তাহাদের সম্মানের লাঘব হয়। এইসকল ক্ষেত্রে ছাত্রদের অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে শিক্ষকেরা অভিভাবক সভার মতামত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে সকল বিষয়ে এরূপ পরামর্শ প্রদানই অভিভাবক সভার একমাত্র বিশিষ্ট অধিকার হইলেও, এরূপ ক্ষমতার ভিতর দিয়া, বিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধেও এই সভার প্রভূত প্রভাব পরোক্ষভাবে খুব সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে; এবং এইরূপে শিক্ষকদিগের

সহিত অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের সহিত পরিবারের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হইলে শিক্ষা একটি যথার্থ সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে থাকিবে।*

শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়।

রক্তাম্বরা

নাবিকগণের স্বীকারোক্তি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইভাবে কাটিল। কেবল একবার সেই আগেকার নাবিকদুইটী আমাকে খাবার দিয়া গেল। আমাকে মুক্তি দিবার জন্য অনেক মিনতি করিলাম কিন্তু তাহারা বলিল "কাপ্তান বড় কড়া লোক। ওর সঙ্গে চালাকি নয়। ও বোলেছে তোমাকে যে খুলে দেবে তাকে গরম লোহা ছেঁকা দিয়ে মারবে।"

আমি হাঙ্গওয়েদের কি করিয়াছে ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রভাতে আবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমার স্ত্রীর সুন্দর মুখখানি যেন কাতরস্বরে তার অকাল-মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আমায় টানিতেছিল কিন্তু ছাড়া পাইবার উপায় নাই; সেদিন শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইল। বিষের নেশা ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতেছিল। আরও একদিন গেল, দুদিন গেল, রোজ নিয়ম মত নাবিকদের অপরিস্কৃত, আধসিদ্ধ, খাদ্য খাইতাম সেদিন হঠাৎ সূর্য্যাস্তের একটু আগে কলের শব্দ থামিয়া গেল আমার কাঁচের ফুকরটিতে বাহির হইতে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। লোকজনের হুড়াহুড়িতে বুঝিলাম জাহাজ তীরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই পলায়নের সুযোগ। অনুমানেই বুঝিলাম জাহাজ তীরে লাগিল। একজন নাবিক যথা সময়ে আহারীয় দিতে উপস্থিত

*Changes in German Education—the times Educational Supplement February. 4, 1922,

হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদের জাহাজ কোন বন্দরে আসিয়াছে। সে উত্তর করিল,—সিংহল। বলিলাম একটি বার আমাকে ডেকে যাইতে দাও, ডেকে থাকিয়াই দেখিব বন্দরটি কেমন। এতদিন এমন ভাবে বদ্ধ থাকিয়া প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই কথা—কাপ্তেনের হুকুম নাই। অনেক কাঁদাকাটির পর কাপ্তেনের নিকট আমার কথা জানাইবার স্বীকার হইল। জানি না কেন কাপ্তেন অনুমতি দিলেন। বুঝিলাম নাবিক আমায় পাহারা দিতেছে। অনেক মাল উঠাইবার নামাইবার ছিল ২টা দিন তাহাতে কাটিয়া গেল। আমাকে একবার মাত্র বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত, তৃতীয় দিন বাহিরে আসিলাম সে দিন বড় ভিড়—পাহারার কড়াকড়ি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল—দেখিলাম আমাকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে না, কুলীদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম; এদিক ওদিক ঘুরিয়া সুযোগ মত তীরে নামিয়া আসিলাম। কেহ লক্ষ্য করিল না। রাস্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিস্তর কষ্টে কনসালের আফিসে গিয়া কনসালকে আমার পত্নীর মৃত্যু, আমার প্রাণহানির চেষ্টা ও বন্দী করার সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। তিনি যেন বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন "আমি এ কাপ্তানকে ত খুব ভাল করে জানি। সে খুব ভাললোক; বেশ, ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি যদি এসব সত্যি হয় বড়ই অদ্ভুত বোলতে হবে।"

আমি আমার পকেট হইতে পত্নীর গহনাটি ও সেই কাগজখানি দেখাইলে তিনি বলিলেন "আপনার কাহিনী বড়ই অদ্ভুত।" বলিয়া তিনি কাপ্তান ব্যনকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ইতি মধ্যে আমি আমার বিবাহ, পত্নীর মৃত্যু, আমার প্রাণনাশের ভয় ও আমার বন্দী হওয়ার বিষয় সমস্ত আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। এইবার যেন তিনি একটু উৎসাহিত হইয়া, বলিলেন "আপনি একজন অত বড় ডাক্তার, আপনার কথা বিশ্বাস না করবার মত কিছু নেই। আপনার এ রকম করে প্রবাসে পাঠাবার নিশ্চই কোন কারণ আছে। ভেতরের কথা জানতে হবে।" কিছুক্ষণ পরে কাপ্তান ব্যন আসিয়া বলিল "আমায় ডেকেছেন?"

"হাঁ, বোস। তুমি নাকি এলোকটিকে বন্দী করে রেখেছিলে।"

"হাঁ মশায়।"

"উনি অভিযোগ এনেছেন তুমি ওঁকে অজ্ঞান অবস্থায় দেশ থেকে নিয়ে এসেছ, আর বন্দী করে রেখেছিলে।"

"আমি কর্ত্তাদের আদেশ মত একাজ কোরেছি, তাঁরা সব দায়িত্ব নেবেন।"

"না দায়িত্ব তোমার। তোমাকেই ব্যবসার সনন্দ দেওয়া হয়েছে।"

"তা ত। কিন্তু কর্ত্তাদের হুকুম শুনতে আমি ত বাধ্য।"

"এখন ঠিক বল এ ভদ্রলোক কি ক'রে তোমার জাহাজে এলেন ?"

"আমি ঠিক জানি না। আমি বাড়ীতে দেখা কোরতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ছেলের অসুখ কাজেই ফিরতে একটু দেরী হ'য়ে যায়। আসতে মাত্রই একজন লোক কর্ত্তাদের হুকুমনামা নিয়ে এল। শুনলাম, "একজন যাত্রী যাবেন, তিনি ঘুমোতে গিয়েছেন। এই দেখুন না হুকুমনামা।"

বান পকেট হইতে হুকুমনামাখানি বাহির করিয়া কনসালকে দিল। চিঠিতে লেখা ছিল আমি পাগল, খুন করবার ইচ্ছা আমার প্রবল, সমুদ্রযাত্রায় আমার বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। আর আমার পাগলামীর একটা লক্ষণ এই যে আমার বিশ্বাস আমি কাহাকেও খুন হইতে দেখিয়াছি। এইবার রহস্য আরও জটিল হইয়া পড়িল। কনসাল বলিলেন "হান্সওয়েদের নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কি রকম ভাবে ইনি এসেছিলেন কিছু জান ?"

"আমি ত ছিলাম না। তবে শুনেছি ঘোড়া গাড়ী ক'রে, দু'জন লোক এঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পুলিশ বাধা দিয়েছিল কিন্তু তাঁরা বোলেছিলেন, "মদ খেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

তুমি চিঠি পেয়ে কি কোরলে ?"

"আমি ওঁকে কামরায় পাঠায়ে দিলাম। তারপর উনিও অজ্ঞান ছিলেন; আমিও ওঁকে বিরক্ত করিনি। কর্ত্তাদের আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে পালন কোরেছি।"

"কতদিনের জন্য এবার বেরিয়েছ ?"

"দেড় মাস।"

"তাহলে দেড়মাসের জন্য তোমার কর্ত্তারা এঁকে দেশ ছাড়া কোরে রাখতে চান ? ডাক্তার আমায় অতি ভয়ানক কথা বোলেছেন, আমি এর খোঁজ করা দরকার মনে করি।"

"আমার কোন দোষ নেই, জাহাজ ছাড়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডাক্তারের কোন অস্তিত্ব আমার জানা ছিল না। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা ত চাচ্ছ। অজ্ঞান লোককে জাহাজে নিয়ে তুমি নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ কোরেছ।"

"কর্ত্তাদের হুকুম অনুসারে কাজ কোরতে ত আমি বাধ্য।"

এ চিঠি কে দিল ?"

"যাঁরা ওঁকে পৌঁছে গেলেন সেই ভদ্রলোক দুটি।"

"তাঁদের আকৃতি কি রকম ?"

"শুনেছি তাঁরা প্রৌঢ়বয়সী আর পরিচ্ছদ তাঁদের খুব মূল্যবান ছিল।"

পাঠক বুঝিলেন কি ? ইহারাই সেই মেজর ও আদিত্য। কি ভীষণ চক্রী। কল্যাণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তারা চিঠি দিয়ে কি কোরলে ?"

"আমি যখন এলাম তখন তারা চলে গেছে।" কল্যাণ তখন আমায় বলিলেন "এই চিঠি নিয়ে হান্সওয়েদের কাছে গিয়ে তাদের মতলব জিজ্ঞাসা করুন। আজকে একটা জাহাজ ছাড়বে। তাহাতে ফিরে যান।" কাপ্তান ক্ষুন্নস্বরে বলিল "ও চিঠি আমি দেব না হুজুর।"

"এখন চিঠি আমার জিম্মায়। তোমার ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। আমি পুলিশ লাগিয়ে এসব বিষয়ের খোঁজ নেব। ভাল চাও ত ভদ্রলোককে সাহায্য কর।"

"চিঠি দিতে চাই না।"

"বেশ তোমার কর্ত্তাদের লিখে দিচ্ছি যে তোমার কাছে জোর ক'রে এ চিঠি আমি নিয়েছি। ডাক্তার এ চিঠি না নিয়ে গেলে কি ক'রে খোঁজ করবেন ?"

আমি বলিলাম। "ভারী আশ্চর্য্য। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে বেলার মৃত্যুর সংবাদ লুকিয়ে রাখায় হান্সওয়েদের কি লাভ !"

"ডিটেকটিভ লাগান ; তারা সে বাড়ীটির উপর নজর রাখুক।"

"বাড়ীটি কোথায় তা ত আমি জানি না।"

"চাকরাণী আপনায় ঠিকানা বলে নি !"

"না গাড়োয়ানকে বলেছিল। আমি তখন শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।"

তবে বিয়ের ত রেজেষ্ট্রি হোয়েছিল, রেজেষ্ট্রী আফিস ঠিকানা পাব বোধহয়।"

"হ্যাঁ ঠিক বোলেছেন। সেখানে খোঁজ পাবেন নিশ্চয়।"

নব পরিচিতা।

শুক্রবার সকালে চান্সওয়েদের আফিসে প্রবেশ করিয়া ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দেশান্তরিত করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে পাগল ঠাওরাইয়া বলিলেন,—"বোলছেন কি কাপ্তান বানের জাহাজে আপনি বন্দী ছিলেন?"

আমি তখন কন্সালের জিজ্ঞাসাবাদ ও অন্যান্য ঘটনার কথা বলিয়া হুকুমনামাখানি বাহির করিয়া তাহাতে তাঁহার নিজের সই দেখাইলাম। তিনি কাগজটী দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "কাগজ আমাদের। নাম সই আমার নয়। এ জাল সই।"

"আপনার সই নয়?"

তিনি তৎক্ষণাৎ এক টুকরা কাগজে নাম সই করিয়া দেখাইলেন। তাই ত, লেখা এক রকম বটে কিন্তু এঁর লেখায় কয়েকটী বিশেষত্ব আছে। তা ছাড়া ম্যানেজার বলিলেন যে কতকগুলি চিঠির কাগজের ধার কাটা অনুমান হওয়ায় ফেরত দেওয়া হয় এ তারই একটি। "আপিসে বারলকের টাইপরাইটার ব্যবহার করা হয় কিন্তু চিঠিটি রেমিঙ্গটনের টাইপরাইটার দিয়ে ছাপা।" তার পর তাঁর প্রধান কেরাণীকে ডাকাইয়া চিঠিখানি দেখিতে দিলেন। সেও জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। আমি তাঁদের জাহাজে কিরূপে গিয়াছিলাম এবং কাপ্তেন বান কিরূপ হুকুম পালনে মনোযোগী সে বিষয় তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন "তুমি কোন ষড়যন্ত্রে পড়িয়াছ। খুব বড় চক্রী না হ'লে এরূপ করিতে কেহ সাহস করে না।"

আমি সেখান হইতে রেজেষ্টরী আপিসে গেলাম। সেখানে জানিলাম যে বেলা নিজে নোটিশ দিতে আপিসে আসিয়াছিল। আমি বিনোদের বাড়ী যাবার পরই এ নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। নোটিশে কনের ঠিকানা দেখিলাম "বেলাবাসিনী আদিত্য, ৪ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। এতক্ষণে বাড়ীটির খবর পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই মেয়েটি যখন নোটিশ দিতে আসে তখন আপনি ছিলেন?"

"হাঁ আমি দেখেছিলাম।" "কি রকম দেখ্তে?" "খুব সুন্দরী!" "চুলের রং?" "তাঁর চুলগুলি রেশমের মত হাল্কা, কালো কোঁকড়া।" বর্ণনা ত মিলিল। বেলা নিজেই তা'হলে নোটিশের আবেদন কোরতে গিয়েছিলেন। রহস্য ক্রমে আরও ঘনাইয়া আসিল।

"তিনি কি একলা এসেছিলেন?"

"তাঁর বাবা সঙ্গে ছিলেন।"

"সে ভদ্রলোকটি তাঁর বাবা কেমন ক'রে জানলেন?"

"ভদ্রলোকটিই বোল্লেন। তাঁর নাম আদিত্য, তিনি মেজর।"

"মেজর! আদিত্যমশায় ত মেজর নন। লোকটি দেখ্তে কেমন?"

"সচরাচর সৈনিক বিভাগে কাজ কোরলে যে রকম হয়। খুব রসিক।" "বৃদ্ধ?" "না পঞ্চাশও হবে না। চশমা ব্যবহার করেন।"

আমার প্রলোভনকারীর সহিত ইহার আকৃতিতে মিলিল না। কিন্তু মেজরের সহিত মিলিল। তখন সত্য কথা বুঝিলাম। মেজর পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার সম্মতি দিয়াছেন। রেজিষ্ট্রারকে ধন্যবাদ দিয়া আমি সেই বাড়ীটির খোঁজ করিতে গেলাম। কিন্তু এ সে বাড়ী নয়। এ বাড়ীতে আমার বিবাহ হয় নাই। বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকাডাকি করায় দাসী আসিয়া আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, সে পাঁচ বৎসর সে বাড়ীতে কাজ করিতেছে। আদিত্য মশায়ের নামও কখনো শোনে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এ বাড়ী আর কাহাকেও ভাড়া দেওয়া হয় নাই কখনো?" "না। আদিত্য নাম ত সচরাচর দেখা যায় না, আপনি সহজেই খুঁজে পাবেন।" মিছামিছি কষ্ট দেওয়ার জন্য গৃহস্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার রহস্যময়ী পত্নী ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুল ঠিকানা দিয়াছেন ভাবিয়া মন বড় ব্যথিত হইল। তারপর পুরোহিতের নিকট গেলাম। তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তারপর সন্দেহ হইল আদিত্য পদবীও হয়ত মিথ্যা। ক্লান্ত শ্রান্ত মর্ম্মাহত হইয়া আমি আবার বিনোদের বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। রামীর মা বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, বলিল "বাবু কোথায় ছিলে এতদিন? যা হক এসেছ নিশ্চিন্ত হোলুম। আমি আর রামী কত কি গড়ছিনু গো, কি ভয়টাই পেয়েছিনু।"

"বড় খিদে পেয়েছে। একপেয়ালা চা আর কিছু।"

"বলুন সমস্ত ঠিক কর্‌ছি—আমি আমার বাবুকে কাল চিঠি লেখাবো রামীকে দিয়ে।"

রামীর মা তাহলে বিনোদকে জানাইয়াছে। বিনোদ শীঘ্রই আসিবে। আমি নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে খুবই আশ্চর্য্য ও ব্যস্ত হইয়াছে। আমি তার করিয়া তাহাকে আমার ফেরার সংবাদ দিলাম। রামীর মা চা আনিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন নতুন রোগী-টোগী আসে নি?" "হাঁ দুদিন পরেই এসেছিল, জিজ্ঞাসা কোরলে তুমি ফিরবে কবে, আমি কিছু বোল্‌তে পারলুম না। আবার এসেছিল। নিজের নাম লিখে গেছে।"

"কেমন দেখ্‌তে? কি রোগ?

"রোগ বুঝলুম না বাপু, অল্প বয়সী মেয়েমানুষ তা দেখ্‌তে সুন্দর বই কি। এই নাও তার নাম।"

নাম দেখিলাম "রাণী নীরজা দেবী।"

রামীর মা বলিল "একখান চিঠি লিখে দিয়ে গেছে, আমি হারিয়ে ফেলব তাই রামীর কাছে আছে। নিয়ে আসি গে।"

চিঠি পাইলাম। তাহাতে লেখা "ডাক্তার কর যত শীঘ্র সম্ভব ৩৮ নং——রোডে আসিয়া দেখা করিলে সুখী হইব" ঠিকানা হইতে বুঝিলাম ইনি রাজা হরনাথ দত্তের পত্নী। চা পান করিয়া, আমি পরদিন দেখা করিব লিখিয়া পাঠাইলাম পরদিন যখন যাত্রা করিলাম তখন বড় মানুষ রোগীর বড়মানুষী রোগ সারাইবার ইচ্ছা একটুও ছিল না আমার। যাহা হউক আমি বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। তারপর ভৃত্য আমায় ছোট একটি বসিবার ঘরে লইয়া গেল। খানিক পরে এক কৃশাঙ্গী তরুণী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরণে ময়ূরকণ্ঠী রংএর রেশমের সাড়ী। তিনি যে খুব সুন্দরী তা নয়, কিন্তু তাঁর চেহারাটা আকর্ষণীয়। দেখিয়া মনে হইল দৌর্ব্বল্যই তাঁর রোগ।

"সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবু কালই চিঠি পেয়েছিলাম। ক'বার আমি গিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছি।"

"আমাকে কাজে বাইরে যেতে হয় শীঘ্র ফিরতে পারি নি।"

"এরকম প্রায়ই হয়। আপনার স্ত্রীর ত ভারি মুস্কিল। রামীর মা ভেবেই অস্থির।"

"আমি অবিবাহিত আমার জন্য ভাবিবার কেউ নেই।"

সেই সময়ে রাণীর বৃহৎ আয়ত কৃষ্ণতার নয়নের সহিত আমার চক্ষের মিলন হইল। তাঁহার নয়নে কি যেন একটা ভাব ছিল।

"আপনি এসেছেন ভাল হোয়েছে। আমার আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করবার আছে।"

"আপনার কি অসুখ? আমি সাধ্যমত যত্ন নিতে ত্রুটী কোরব না।"

"বর্ণনা করাই ত মুস্কিল। কেমন বড় দুর্ব্বল বোধ হয়, মনে হয় টনিক খেলে ভাল হয়, কি টনিক খাই, বলুন ত।"

"আপনি কখনো বেশ ভাল থাকেন আবার হঠাৎ কখন বড় দুর্ব্বল বোধ হয়, না?"

"ঠিক ধরেছেন। এর কারণ বলুন ত।"

"ওটা বিশেষ রোগ নয়। মেয়েদেরই এ রোগ বেশী হয়। বেশী ভাবেন বুঝি।"

"বড় বিশ্রী রোগ,—নয়?"

"বিশ্রী আর কি? অনেকেরই আজকাল হচ্ছে।"

"সারাতে পারবেন তা হলে?"

"নিশ্চয়। সহজে পারব বোধ হয়।"

"ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি এ রোগ সারাতে পারেন? এ রোগ মেয়েদের প্রায়ই হয় ঘরে ঘরে! এ রোগ আপনি ভাল কোরেছেন তা হলে?" "কি রোগ দুর্ব্বলতা ত?

রাণী হতাশভাবে বলিল "না না প্রণয় রোগ।"

হারানিধি।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "প্রেমকে রোগ মনে করেন?"

তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "অনেক জায়গায় ত বটে। আমিত আর দশের ছাড়া নই?"

তাঁর কথায় বুঝিলাম তিনি কাহাকেও ভালবাসেন তাই আমি বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার মত ক্ষমতা রহিল না। তিনি সুন্দরী নিশ্চয়। তবে হয় ত স্বামী স্ত্রীতে বনে না বোধহয় ধনের মোহে তাঁহাদের বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, এখন

তাঁহাকে পছন্দ হয় না। এরকম ত নিত্যই দেখা যায়। আমি কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা হলে আপনি বড় অসুখী?"

"সত্যি বোলতে গেলে আমার মত অসুখী কমই আছে। তবে আপনি স্নায়ুরোগের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার,—এ রোগের চিকিৎসা খুব ভাল করেন শুনেছি, তাই পরামর্শ নেব বলে স্বামীর অজ্ঞাতে আপনাকে ডেকেছি।"

"আমার নাম জান্‌লেন কি ক'রে?"

আমার মত ডাক্তারের আবার নাম!

তিনি বলিলেন—"আপনি বাঁকিপুরে থাক্‌তে আমার এক বন্ধুর চিকিৎসা কোরেছিলেন তাঁরই কাছে আপনার নাম শুনি। ঔষধে আমার দরকার নেই,—চাই পরামর্শ।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি রোগের ওষুধ চান তাই ডেকেছেন? প্রেসক্রিপসন দেব না তা হলে?"

"প্রেসক্রিপসনের দরকার নেই। মনে শান্তি নেই—তারই অভাবে শুকিয়ে উঠ্‌ছি।"

"আমার আন্দাজ হচ্ছে যে আপনার ও আপনার স্বামীর মাঝখানে আর কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সত্য কি?"

"না না ডাক্তার বাবু তা নয়। আমার স্বামী কেমন নির্ব্বিকার লোক আমার এত ভালবাসার প্রতিদান দিতে জানে না।"

রাণীর এই সরল উক্তিতে আমি বড় বিচলিত হইলাম, তাঁর ন্যায় উচ্চবংশসম্ভূতার পক্ষে এতখানি স্বীকার করা যে কতখানি অপমানের তা আমার জানা ছিল তাই বড় ব্যথা অনুভব করিলাম।

"আমাদের দেশে আপনার মত দুঃখী রমণী অনেক আছেন। আমি ডাক্তার বটে স্বামী-বশ করা মন্ত্র ত জানি না। জান্‌লে ঘরে ঘরে মন্ত্র নিত, কিন্তু মানুষের মনের গতি নিরূপণ কোরতে ত আমরা জানি না।"

"আমার এরকম নির্লজ্জের মত আপনাকে এসব কথা বলায় বিরক্ত হচ্ছেন বোধ হয়, কিন্তু"—

"না না আপনার দুঃখে বিরক্ত হব কেন ?"

"আপনার কি আমার মত অভাগিনীর প্রতি দয়া হয় না ?"

"হয় বই কি। কিন্তু এসব ভেবে শরীর খারাপ কোরচেন কেন ? শরীর ত খুবই কাহিল। সে প্রবাদটি মনে রেখে বুক বেঁধে সব সহ্য করুন সেই সে প্রবাদটি জানেন নি ত,—লোকে বল্‌তেই বলে 'প্রেম শুধু পাওয়া যায় প্রেম না চাহিলে।' সেই ভেবেই সহ্য করুন।"

"আমার অবস্থায় ও-প্রবাদের কোন মূল্য নেই।"

"আপনার স্বামী কি তবে আর কাকেও ভালবাসেন ?"

"তা জানি না তবে তিনি আমার বিষয় উদাসীন।"

"আপনারা কি খুব বেশি ছোট বড় ?"

"আমি কুড়ি বছরের তাঁর এই পঞ্চাশ হোল।"

"রাজা ত নিজে পছন্দ করেই আপনাকে বিয়ে করেছিলেন, তবে এরকম কেন হোল ?"

"হাঁ তখন ত উদাসীন ছিলেন না।"

"কতদিন বিয়ের হয়েছে ?"

"ছয় বছর।"

আমি ডাইরেক্টরীতে দেখিয়াছিলাম তাঁদের বিবাহের আট বৎসর হইয়াছে। তবু সামান্য এ মিথ্যাটুকু মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক ভেবে চুপ করে রইলাম। দেখিলাম তিনি আরও কি বলিতে চান অথচ বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, বলিলাম "আপনার কথা শুনে বড় দুঃখ হোল।"

"আজ অবধি কেউ আমার দুঃখে সহানুভূতি করে নি। আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু হলেন তাহলে।"

"আপনার বন্ধুত্বে আমি সম্মানিত বোধ কোরছি। কিন্তু আমি আপনার অসুখেরও চিকিৎসা করতে চাই।"

"মনের অসুখ সারলেই ও অসুখ সারবে।"

"সৎপথে থেকে স্বামীকে ভালবাসলে একদিন না একদিন তিনি আপনার মূল্য বুঝবেন।"

"তা ত কোরছিই। যথাসম্ভব তাঁর সেবা করে তাঁকে সুখী করতে চেষ্টা করি।"

"আশা ছাড়বেন না। সৎস্বভাবা নারীর উপর পুরুষের কিছু না থাক্ একটা সম্মান বরাবরই থাকে।"

আপনি সহায় কোরবেন আমায় ?"

"কোনরকম সাহায্য দরকার হলে চাইলেই পাবেন।"

"কিন্তু আমার স্বামী যেন জানতে না পারেন, মনে রাখ্বেন তাঁকে না জানিয়ে পরামর্শ নিচ্ছি।"

"আপনার ইচ্ছামতই কাজ হবে।"

"ভবিষ্যতে ডাক্তার-খানাতেই দেখা পাব ?"

"আমি ডাক্তার রায়ের জায়গায় কাজ কোরছি। তিনি এলে অন্য কোথাও যাব।"

"তবে আমার কি হবে ?"

"আমি আমার ঠিকানা আপনায় জানাব।"

রাণীর কথাবার্ত্তায় তাঁর সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার বন্ধুত্ব সাদরে গ্রহণ করিলাম, অদ্ভুত আমি একজন স্ত্রীলোকের স্বামীবশ কারবার পরামর্শদাতা হইলাম। রাণী সুন্দরী রমণী তাই এপদে আমার ভয়ও ছিল। যাহা হউক প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া রাণীকে দেওয়ার পরও তাঁহার আমাকে বিদায় দেবার কোন লক্ষণই দেখিলাম না। রাণী হাসিয়া বলিলেন "আপনার বন্ধুত্বে বড় গৌরব বোধ কোরছি।" সহসা তাঁহার মুখে এক জয়শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম। "শরীরের যত্ন নিতে ভুলবেন না।"

"আমি আপনার প্রেস্‌ক্রিপসনের সদ্ব্যবহার কোরতে রাজি নই কিন্তু"

"কেন ?"

"আমি ওসব মিথ্যা বল ছিলাম। জীবনে কখনো আমি দুর্ব্বল বোধ করি নি।"

"আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে এ রকম পরিহাস আপনার শোভা পায় না।"

"শোভা পায় না ঠিক কিন্তু উদ্দেশ্য আছে, এক দিন জানতে পারবেন।"

"আমার সময় বৃথা নষ্ট ক'রে কি ফল হোল ?"

রাণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা হয়েছিল।"

আমি বিরক্তির সহিত বলিলাম "আলাপের চমৎকার রীতি !"

"রীতি চমৎকার বটে, কিন্তু নূতন নয়।"

"আমার সঙ্গে আলাপ করে কি লাভ আপনার ?"

তিনি দ্রুত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, তার পর, আমার দিকে চাহিয়া ব্যগ্র স্বরে বলিলেন "বিরক্ত হলেন ? কিন্তু কেমন অভিনয় কোরতে পারি দেখলেন ত ? বড় ডাক্তার হ'য়েও প্রতারিত হোলেন। কেমন কি না ?"

আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম "আমার উপর অন্যায় করা গেল।"

রাণী তখন অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "ক্ষমা কোরবেন না আমায় ?"

"নিশ্চয়ই কোরব। প্রকৃত উদ্দেশ্য অবিশ্যি জানাতে হবে।"

"কোনই উদ্দেশ্য নাই। আমি আপনাকে দূর থেকে দেখে আলাপ কোরতে ইচ্ছুক হই।"

"কেন ?"

"কিছু না বন্ধুত্ব ক'রব বলে।"

রাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

আমি তখন বলিলাম "স্বামীসংক্রান্ত সব কথা তা হলে মিথ্যা ?"

আমি কি করিয়া এই রমণীকে বিশ্বাস করিয়া ছিলা'ম ভাবিয়া পাইলাম না।

"না না সব মিথ্যা নয় ! একদিন তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেব আপনার।"

"তাঁর সঙ্গে পরিচয়ে আনন্দিত হব সন্দেহ নেই, কিন্তু এত মিথ্যার পর আর বিশ্বাস কোরতেও প্রবৃত্তি নেই।"

"তা এক রকম ভাল। শত্রুতা হ'য়ে বন্ধুত্ব হলে খুব স্থায়ী হবে।"

"আপনি তা'হলে আমার বন্ধুত্ব চান ?"

"তাই ত ভেবেছি।"

"কোথায় দেখেছিলেন আমাকে ?"

অনেক জায়গায় ত দেখেছি।"

রাণীর ইচ্ছাটা কি ? তিনি কি আমাকে তাঁর প্রণয়ী নির্ব্বাচন কোরলেন নাকি ? অদ্ভুদ এ রমণী।

তবু কোথায় ?"

"তিন হপ্তা আগে হোটেলে বন্ধুর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন।"

"সেখানে আপনি ছিলেন ?"

"আমার কথা মিথ্যা ? দেখিনি বোলতে চান ?"

"কি করে জান্‌বো, আমাকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন বোধ কোরেছিলেন।"

আমার কথা মুখেই রহিল। বীণার ন্যায় মধুর স্বরে কে বলিয়া উঠিল "নীরলা ও নীরলা কোথায় গেলে ? দেরী হ'য়ে গেল যে !"

তৎক্ষণাৎ দ্রুতপাদক্ষেপে এক তরুণী ঘর আলো করিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই রাণী একেলা নহেন বুঝিয়া দাঁড়াইয়া প'ড়লেন। একি স্বপ্ন একি মায়া ? হায় একি ছায়া—না ছায়া নয়। এই আমার মৃত পত্নী সশরীরে লজ্জারক্ত মুখে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

সুরভি আশ্রম।

—:o:—

ফিরে পেলাম রাজ্য আমার
সোণার সিংহাসন,
সুরভি আশ্রমের লাগি
মন যে উচাটন।
স্তন্য তোমার পিয়ে
ছিলাম আমি জিয়ে
মায়ের কোলের মতন তোমার
স্নেহের নিকেতন।

(২)

দিত তোমার পুণ্য ধারায়
শূন্য হৃদে বল,
তোমার স্নেহ তাপিত দেহ
করলে সুশীতল।
শনিগ্রস্ত আমি,
চিন্তা দিবা যামি,
তোমার দয়া নূতন করে
গড়লে এ জীবন।

(৩)

ঘুমায়ে হায় তোমার ছায়ে
ছোট ছেলের প্রায়,
ভবিষ্যতের সুখের স্বপন
দেখেছিলাম হায়।
দুঃখ আমার দেখি
ভিজতো তোমার আঁখি,
ভগবানের কাছে কতই
করতে নিবেদন।

(৪)

দুখের নহে সুখের সেদিন
আজ ভেঙ্গেছে ভ্রম,
ভক্তিপ্রীতির অলকা মোর
সুরভি আশ্রম।

আশীষ অহর্নিশ
ধুয়ে দুখের বিষ
করতো জীবন কালিদাসের
কাব্যেরি মতন।
সুরভি আশ্রমের লাগি
মন যে উচাটন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ধর্ম্মভাব।

—:o:—

ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ান হইতে যে পত্রখানির অনুবাদ চৈত্র সংখ্যার পরিচারিকায় "ভারতীয় ধর্ম্মভাব" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার শেষ ভাগে বলিয়াছিলাম যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব কি সেই বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। এখন ভয়ে ভয়ে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ভয়ের কারণ এই যে ধর্ম্মবিষয়ে কোন কথা বলিলে তাহার পরিণামে প্রায়ই বিবাদ হয়। ধর্ম্মবিষয়ে কথা বলিয়াই খ্রীষ্ট ক্রুশে নিহত হইয়াছিলেন, মহম্মদকে ও দয়ানন্দকে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং রামমোহনকেও প্রহার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পত্রখানির একটু সমালোচনা করা ভাল বলিয়া মনে করি।

পত্রখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত লেখকের বিনীতভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি নিজের গোচরীভূত এবং অন্য হইতে শ্রুত বিষয় হইতে যে কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বিনা আড়ম্বরে ভদ্রভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদিগকে আক্রমণ করেন নাই, অথবা তাঁহাদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। যুক্তি বা তর্কের বিচারে

এইরূপ ভাবই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। আমাদের যেন যুক্তিতর্ক স্থলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে বিদ্রূপ করা ও গালাগালি দেওয়া চাই ই। ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা শাক্ত তাঁহারা চৈতন্যের সময় হইতে এ পর্যান্ত বৈষ্ণবদিগকে কিরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন তাহা সকলেই জানেন। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি শাক্তেরা যদি কোন বৈষ্ণব ভিক্ষুকের ঝোলার মধ্যে এক টুকরা পাঁঠার মাংস বা হাড় ফেলিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের মহা আনন্দ হইত। শাক্তদের মধ্যে যাঁহারা মদ্য মাংস ব্যবহার করেন তাঁহারা মদ্য মাংস পরাঙমুখ ব্যক্তিদিগকে পশু বলিয়া থাকেন। আর্য্য সমাজের যে সম্প্রদায় মাংসভোজী তাঁহারা নিরামিষ সম্প্রদায়ের 'ঘাসী' আর্য্য বলেন। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের মনে ব্যথা দিবার জন ই তাহাদের সমক্ষে গো হত্যা করিতে ভালবাসেন। ছাগমাংসভুক্ হিন্দুরা কাউন্সিলের সভ্য হইয়া গোমাংস বিক্রয় বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে কাউন্সিলের সভ্যেরা সকলেই যদি বৈষ্ণব হইতেন এবং ছাগবধ নিবারণ করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ হইত। পাঞ্জাবে প্রায়ই শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে প্রথমে তর্ক, পরে গালাগালি, তাহার পর হাতাহাতি এবং অবশেষে খুনাখুনি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের একজন বিশিষ্ট স্পিরিচুয়ালিষ্ট্ পুনর্জ্জন্মবাদীদিগকে কত বিদ্রূপই না করিতেন। কোন একখানা সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের সমর্থন থাকিলে, অন্য সংবাদ পত্রে সেই সমর্থনকারীকে কত গালাগালি দেওয়া হয়। সেই সমর্থনের কোন যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকিলে বিরুদ্ধবাদীগণ সেই যুক্তির খণ্ডন করা মোটেই আবশ্যক বোধ করেন না। তাঁহারা যেন ভাবেন যে গালাগালি দেওয়াটাই সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। আমরা যদি ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের পত্র লেখকের ভাবকে আদর্শ করিয়া পরস্পরের মতের প্রতি সম্মান করি তাহা হইলে সংসার হইতে কত অশান্তির তিরোধান হয়।

এখন দেখা যাউক লেখক কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং সেই গুলি কি পরিমাণে বিচারসহ।

লেখকের প্রথম সিদ্ধান্ত যাহা একজন সুশিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহাকে বলিয়াছেন তাহা এই যে ভারতের লোক অপেক্ষা ইয়োরোপের লোক অধিকতর আধ্যাত্মিক। এই সিদ্ধান্তটা ঠিক্ বলিয়াই বোধ হয়। ভারতের লোক ২২।২৩ বৎসর বয়সেই দুই তিনটী সন্তানের পিতা

হয়, নারীদেরও ষোল সতের বৎসর বয়সেই দুই তিনটী সন্তান হয়। তাহারা দিবারাত্র সেই সন্তানদের অন্নবস্ত্রসংগ্রহ করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে সুতরাং তাহাদের মনোমধ্যে মনের বা আত্মার উন্নতি চেষ্টার কথা কখন উদিত হইবে। সংসারের অভাব মোচনের চেষ্টা ভিন্ন তাহাদের মনে কোন উচ্চতর ভাব জন্মিতেই পারে না। অন্য পক্ষে ইয়োরোপীয়েরা অনেক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকায় তাহারা সংসারের চিন্তায় তেমন বিব্রত হয় না তাহাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখিতে পারে।

লেখকের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে ভারতীয় যুবকদের মনে স্বদেশের প্রতি এবং স্বজাতির প্রতি একটা প্রীতির ভাব জন্মিয়াছে এবং সেই জন্যই তাহারা দলে দলে আত্মোৎসর্গ করিয়া কারাগারে যাইতেছে। যে ভাব প্রণোদিত হইয়া যুবকেরা আত্মোৎসর্গ করিতেছে আমি সে ভাব বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব না। দেশের প্রতি প্রীতি হয় ত একটু জন্মিয়াছে কিন্তু সে জন্য যুবকেরা যে উপায় অবলম্বন করিতেছে তাহা ত আমার দেশের প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করিবার উপায় বলিয়াই বোধ হয়। দেশপ্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্য কতজন যুবক জাতি ভেদ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

লেখকের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে ধ্যান করাকেই ভারতের লোক ধর্ম্ম মনে করে এবং ভাবে যে সেইরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিলেই তাহাদের সাংসারিক সকল দুঃখ কষ্টের লাঘব হইবে। লেখকের এই সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু ইহা কেবল ভারতের বিশেষত্ব নহে। প্রায় সকল ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাই এই যে ঈশ্বরের সেবা কর তাহা হইলেই তিনি তোমার দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। এইরূপ বিশ্বাস করা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। আমি যদি ঈশ্বরকে সেবা করি এবং তিনি যদি সুবিচারক হন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমার সর্ব্ববিধ মঙ্গল করিবেন। এই বিশ্বাসের ফলেই ব্রাহ্মসমাজেও ধ্যানের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় কেন না ধ্যান করাই ব্রাহ্মেরা সর্ব্বপ্রধান সেবা কার্য্য মনে করেন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ হইলে গৃহস্থের পুণ্য হয়। ছেলের অসুখ হইয়াছে,

পড়াও পুরোহিতকে দিয়া একরূপ চণ্ডী* সেই পুণ্যের ফলেই ছেলে ভাল হইবে।' মাড়য়ারিদের বিশ্বাস যে ধ্যান অপেক্ষা দানই বড় ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বহু অর্থ বিতরণ করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষা এই যে যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে তাহারা নিজের ক্রুশ বহন করিবে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অত্যাচার, পীড়ন ও কষ্টের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। গীতার শিক্ষাও প্রায় এইরূপ। "কর্ম্ম (যাহাকে ইংরেজীতে duty বলে তাহা) করিয়া যাও, কর্ম্মে ফল লাভের জন্য যেন তোমার ইচ্ছা না হয়।"

লেখক এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন যে "গ্রামে ধর্ম্মের অর্থ পুরস্কার ও দণ্ড—কখন কখন ইহা যেন একটা চুক্তি। শিক্ষিত বৃদ্ধগণ বিবেচনা করেন যে ধর্ম্মের অর্থ philosophic resignation এবং prevention of warry. জাতীয়তাবাদী যুবকদের বিবেচনায় ধর্ম্মভাবের অর্থ,—দেশের জন্য আত্মত্যাগ। দেশের মঙ্গলটা যে কি এবং কি উপায়ে সেই মঙ্গল সংসাধিত হইবে তাহা তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া বিশেষ সাবধানে গবেষণা করা প্রয়োজন মনে করেন না।"

বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই লেখকের এই মতের অনুমোদন করিবেন। আত্মত্যাগোন্মুখ যুবকেরাও এই শেষকথাটা একটু মনদিয়া ভাবিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব কাহাকে বলে। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব। কিন্তু ঈশ্বরকে ত কেহ দেখে নাই সুতরাং কেমন করিয়া জানিব যে তাঁহার ইচ্ছা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আপ্তবাক্য অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া কার্য্য করাই ধর্ম্ম। কিন্তু অপ্তবাক্য কিরূপ? ইহার উত্তরে কেহ বলিবেন যে নরবলি দিলে ধর্ম্ম হয়, কেহ বলিলেবেন গোবলি দেওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই রূপ একদেশের লোক যে মতকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে অন্যদেশের লোক তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে

---

* এখনকার যুবকদিগের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে চণ্ডীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একবার পাঠ করাকে "একরূপ" চণ্ডী বলিত। এখন বলে কি না জানি না।

করে। অথচ আমি নিজে স্বকর্ণেও ঈশ্বরের কোন বাণী শুনি নাই। এমন স্থানে কোন্ মতকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইব ?

যাঁহাকে স্বচক্ষে দেখি নাই এবং যাঁহার কথা স্বকর্ণে শুনি নাই তাঁহার ইচ্ছা কিরূপ ইহা জানিতে হইলে তুলনা এবং উপমা (analogy) ভিন্ন অন্য কোনরূপ যুক্তি প্রণালী থাকিতেই পারে না। এই যুক্তি প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হই তাহা দেখা যাউক।

ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সংসারপালন ও শাসন করেন সুতরাং তিনি আমাদের পিতা বা মাতা এবং তিনি আমাদের রাজা। এবিষয়ে কোনরূপ মতভেদ হইতেই পারে না। কিন্তু আমি এই প্রবন্ধে পুনঃ পুন "পিতা বা মাতা" অথবা "পিতা এবং মাতা" না বলিয়া কেবল "পিতা" শব্দই ব্যবহার করিব।

এখন আমাদের স্মরণ করা উচিত যে আমাদের পার্থিব পিতা এবং আমাদের পার্থিব রাজা আমরা কিরূপ কার্য্য বা আচরণ করিব বলিয়া ইচ্ছা করেন।

পার্থিব পিতার ইচ্ছা এই যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তান সুখে থাকে প্রত্যেকে সুবেশ ধারণ করিয়া সুশ্রী হয়. প্রত্যেকে নিজের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্ হয় প্রত্যেকে আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কার্য্য নিরত হইয়া শারীরিক বলসঞ্চয় করে এবং অধ্যয়ন করিয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়, প্রত্যেকে তাঁহার রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তানগুলির প্রতি স্নেহ মমতা দেখায় ও নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহাদিগকে শুশ্রূষা করে, সকল সন্তান তাঁহার সহিত বা সমক্ষে একত্র হইয়া আমোদআহ্লাদ করে প্রত্যেকে তাঁহার বাড়ীঘর ক্ষেত্র ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। জ্ঞানবান্ পার্থিব পিতা কখনই এরূপ ইচ্ছা করেন না যে সন্তানেরা কেবল তাঁহার কাছে বসিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাঁহাকে পিতা পিতা বলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিয়া উত্যক্ত করে, বা কেবল তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ করে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কেবল তাঁহার ছবিখানির দিকে তাকাইয়া থাকিলেই তাঁহার প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করে। পার্থিব পিতা তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের জন্য সন্তানদিগের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা করেন, পার্থিব রাজা ব্যাপকভাবে নিখিল সংসারের জন্য সেইরূপ আচরণই ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ আমরা

নিজের শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিব এবং নিজে অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও লোক সেবা করিবার চেষ্টা করিব এইরূপ ইচ্ছাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব। "পুণ্যাং পরোপকারে চ পাপং চ পর পীড়নে" এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটী কথার মধ্যে ধর্ম্ম ও পাপ কাহাকে বলে তাহা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহাতে কাহারও উপকার না হয় তাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে এবং যাহাতে কাহারও অপকার না হয় তাহাও পাপ নহে। যথা ঔষধদান প্রভৃতি কার্যদ্বারা রোগশোক মোচনে যে ধর্ম্ম হয় এবং প্রহার, অপহরণ প্রভৃতি যে পাপ ইহা বুঝিতে কাহারও আয়াস পাইতে হয় না কিন্তু মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া বা গালাগালি দিয়া কাহারও মর্ম্মপীড়া দিলে যে পাপ হয় অথবা ভাল কথা এমন কি আমোদের কথা বলিয়া হাসাইয়া আনন্দবর্দ্ধন করিলেও যে পরোপকার অর্থাৎ ধর্ম্ম হয় তাহা অনেকে বুঝেন না।

সুতরাং লোকহিতার্থে যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গীতায় ইহা একবার কৃষ্ণের উক্তিতে "কার্য্য কর্ম্ম"* বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য সর্ব্বস্থলে ইহাকে কেবল "কর্ম্ম" এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলায় আমরা বলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইংরেজীতে বলে duty.

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কর্ম্ম শব্দের এই স্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করিয়া আমাদের দেশের টীকাকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন যাগযজ্ঞ। Monier Williams তাঁহার শকুন্তলার টীকায় একস্থলে বলিয়াছেন In India every thing begins with a flash of light but ends in darkness. কর্ম্ম শব্দের টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা Monier Williams এর বাক্যের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। "কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম" এই কথা কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইবার সময়ে গীতাকার ঋষি পদ্মনাভের মন কি স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আর টীকাকারগণের তমসাচ্ছন্ন মন সেই কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিল কিনা যাগযজ্ঞ। আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় যে ধর্ম্মজীবন নামক পুস্তকের অন্তত একস্থলে শিবনাথ শাস্ত্রী ও কর্ম্মের অর্থ যাগযজ্ঞ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কর্ম্মের অর্থ যদি যাগযজ্ঞই হইবে তাহা হইলে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সমুপস্থিত হইলে যুদ্ধ করাই অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ইহা বুঝাইয়া

* কার্য্যংকর্ম্ম সমাচর

দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না করাইয়া যথযস্ত করিতে বলিলেই ত পারিতেন। তিনি যখন তাহা করেন নাই তখন মানিতেই হইবে যে কর্ম্মশব্দ কর্ত্তব্যকর্ম্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পিতা মাতার প্রতি, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি আত্মীয়-কুটুম্ব প্রতিবেশীর প্রতি, গ্রামের প্রতি, দেশের প্রতি, নিখিল সংসারের প্রতি বিশেষতঃ অসহায় দরিদ্র রুগ্ন ক্ষুধাতুরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের অন্ত নাই। আমরা প্রত্যেকেই সংসারের সকল কার্য্য করিতে পারি না। অনেক স্থলে প্রকৃতিই আমাদের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যেমন জননীর শিশুপালন। অনেক স্থলে আমরা নিজে পৃথক্ ভাবে অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া লই—যেমন সৈনিকদিগের দেশরক্ষা ও বৈজ্ঞানিকদিগের প্রকৃতির গুপ্তরহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা এবং গৃহীদের কেহ উপার্জ্জন করে, কেহ রন্ধন করে, কেহ শিশুপালন করে এবং কেহ শস্যোৎপাদন করে। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। যিনি যে কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তিনি তাহা ছাড়িয়া অন্যের করণীয় কর্ম্ম করিতে গেলে কোন কোন স্থলে ঘোর অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা। প্রবল ঝড়ের সময়ে যদি জাহাজের অভিজ্ঞ কর্ণধার কর্ণত্যাগ করিয়া খালাসীর কার্য্য করিতে যায় এবং একজন অনভিজ্ঞ খালাসী যদি কর্ণ ধারণ করে তাহা হইলে সমস্ত লোক সমেত সেই জাহাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য কৃষ্ণের মুখ দিয়া গীতাকার বলাইয়াছেন যে পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। এই বাক্যের এরূপ অর্থ কখনই হইতে পারে না যে এক দেশের লোক আর এক দেশের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। নাগারা নরহত্যাকেই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহারা যদি প্রতিবেশী খাস্তি অথবা সিক্কোর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে কি বড় ভয়ানক হয়? আট্‌লান্টিক মহাসাগরের কয়েকটা দ্বীপের অধিবাসীরা নরহত্যাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। এখন তাহারা ইয়োরোপের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নরহত্যা ত্যাগ করিয়া কি বড় গর্হিত কাজ করিয়াছে? ভাবিতে দুঃখ হয় যে বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ লোকও গীতায় এই বচনের এই অর্থ করিয়াছেন যে একদেশের লোক অন্য দেশের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়।

একটু উপরে বলিয়াছি যে গীতার মতে কর্ম্মই ধর্ম্ম। গীতার বচনটী এই—যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্ অথবা যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্। এই প্রকার পাঠের একই অর্থ এবং সেই অর্থ এই যে ভাল করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই যোগ অর্থাৎ ধর্ম্ম। অনেকে বলেন এবং ভাবেন যে ধ্যানকেই যোগ বলে। এই মতটী যে ভ্রান্ত তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ একাধিক বস্তুর মিলন বা একত্র হওয়া। এই যোগে যে সর্ব্বপ্রকার বলবৃদ্ধি হয় তাহা সকলেই জানে। একটা ভারীবস্তু আমি একাকী তুলিতে পারি না, তুমিও একাকী তুলিতে পার না; কিন্তু তুমি আমি এক যোগে যখন টানি তখন সেটাকে উঠাইতে পারি। এই টানাতে উভয়কেই কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু কার্য্য না করিয়া কেবল আমি তোমার ধ্যান করিতাম এবং তুমি আমার ধ্যান করিতে তাহা হইলে কি সেই বস্তুটা উত্তোলন করা হইত? কখনই নহে। আমি ঘণ্টায় দেড় ক্রোশ চলিতে পারি; রেল গাড়ী যায় ঘণ্টায় ১৫ ক্রোশ। কিন্তু আমি যদি রেল গাড়ীতে চড়ি অর্থাৎ রেল গাড়ীর সহিত নিজকে যোগ করিয়া দিই, তাহা হইলে আমিও ঘণ্টায় পোনর ক্রোশ যাইতে পারি। রেল গাড়ীর সহিত নিজকে যুক্ত না করিয়া আমি যদি রেল গাড়ীর ধ্যানই করিতাম তাহা হইলে কি আমি মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতাম? কখনই না। আমি যদি আরিস্টটল, নিউটন; গৌতমের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের মনের সহিত আমার মনের যোগ স্থাপন না করিয়া কেবল তাঁহাদের মূর্ত্তির বা গুণের ধ্যান করিতাম তাহা হইলে কি আমার একটুও জ্ঞান বৃদ্ধি হইত? কখনই না। সেইরূপ ঈশ্বরকে ধ্যান করিলেও কোনরূপ উপকার হইতে পারে না। তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া ভাবিলে ত কোন প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা নাইই। তাঁহার দয়াবত্তা, তাঁহার শক্তি, তাঁহার চৈতন্য অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় চিন্তা করিয়া যদি কার্য্য দ্বারা সেই সেই গুণ লাভ করিবার চেষ্টা না করি তাহা হইলে সে চিন্তাও নিষ্ফল। আমরা যদি "তাঁহার বরেণ্য জ্যোতি আমাদিগের বুদ্ধিকে পরিচালন করুক" এই কয়েকটী কথার মূল সংস্কৃত দিবারাত্র উচ্চারণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করি কিন্তু সেই জ্যোতিতে পথ দেখিয়া নিজে নিজের বুদ্ধিকে পরিচালিত না করি অর্থাৎ কার্য্য না করি তাহা হইলেও কোনরূপ ফল লাভ হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার বা আত্মার অথবা মনের যোগ স্থাপন করাই সর্ব্ব প্রধান যোগ এবং

সেরূপ যোগ হইলেই কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্ম বিনা যোগ হইতেই পারে না। যোগের খ্রীষ্টীয় নাম প্রেম। অনেক লোকে একবার খ্রীষ্টকে বলিল "শাস্ত্রে ত অনেক কথা আছে, তাহার মধ্যে প্রধান কথাটা কি?" তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপরায়ণ হও, মনুষ্যের প্রতি প্রেমপরায়ণ হও।" তাহারা বলিল "এও ত দুই প্রকার হইল; ইহার প্রধান কোন্‌টা?" খ্রীষ্ট বলিলেন "ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপরায়ণ হও।" বাস্তবিক তাঁহার প্রতি প্রেম হইলেই তাঁহার সহিত যোগ হইলেই—জগতের প্রতি প্রেম আপনা হইতেই উদ্ভূত হইবে এবং এই শেষোক্ত প্রেম জন্মিলেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও জন্মিবে।

সুতরাং কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম করিবার ইচ্ছাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে এই শিক্ষা থাকিলে তাহাই নিঃসন্দেহে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে বারান্তরে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

গোপন না প্রকাশ?

—:০:—

লুকায়ে আর কি ফল আছে বুকের বেদন
মুখের ভাবে?
মন্‌রাখা ওই ম্লান হাসিটুক মরমতলের
সায় কি পাবে?
আধ্‌শুকানো ওষ্ঠ অধর,
অন্দরে ওই করছে সদর,
ইন্দ্রধনুর অন্তরালে বজ্র কি হায় মুখ লুকাবে?

আঁখির আড়াল কাচের আগল
মনের ছবি যায় যে দেখা,
ঢাক্‌তে যাওয়ার "নয় কিছু"তেই
আঁকতে তারে যায় যে শেখা।
গুপ্ত করে রাখতে গিয়ে,
যেভাব উঠে দীপ্ত হয়ে,
তারে কি হায় ঢাকতে পারে—
মলিন হাসির ক্ষুদ্র রেখা ?
ওই যে সখি ভিজল আঁখি,—
পরখ্ বেশী চাও কিছু আর ?
দর্পণে এই ফিরাও আঁখি,
প্রমাণ পাবে আমার কথার।
সিক্ত-উদাস নয়ন তুলি'
ভাবছ কি আর আপন ভুলি,'
মন লুকিয়ে হাস্‌তে হ'লে
এই পরিণাম গোপন কথার।

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে মদ্যপান *

স্মৃতিশাস্ত্রে সুরাপান দ্বিজগণের পক্ষে অতিশয় গর্হিত কর্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর্যধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা অর্থাৎ জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণবধই সকল পাপের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত পাপকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে; সুরাপানও ঠিক ব্রহ্মহত্যার মতই মহাপাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান আশী রতির অধিক (ব্রাহ্মণের ?) স্বর্ণচুরি এবং গুরুপত্নীর সহিত ব্যভিচার এই চারটী "মহাপাপ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এবং উক্তরূপ পাপে পাপী মনুষ্যের সহিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ অথবা বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপনকারীকেও মহাপাপী বলিয়া ধরা হইয়াছে (১)। এই চারি মহাপাপের শাস্ত্র-সম্মত শাস্তি প্রাণদণ্ড ছিল এবং উক্ত দণ্ড (অথবা উহার অনুকল্প কঠোর দণ্ড) গ্রহণ না করিলে পাপীকে সমাজচ্যুত হইতে হইত।

---

* বিগত আষাঢ় সংখ্যা পরিচারিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত "মদ্যপান সম্পূর্ণ অবৈধ" শীর্ষক প্রতিবাদ-প্রবন্ধের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ, 'প্রতিভা'য় প্রকাশিত 'প্রাচীন ভারতে মদ্যপান' নামক মূল প্রস্তাবের লেখক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও প্রতিবাদের প্রতিবাদের প্রতিবাদ আমাদিগকে প্রদান করিতে প্রস্তুত তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতীভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধে একাধিক বার লিখিয়াছেন যে "প্রাচীন ভারতে মদ্যপান শীর্ষক প্রবন্ধটি যদি পরিচারিকায় 'প্রতিভা' হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রেরিত এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃত কটুমটু শব্দের অর্থ লইয়া এত আলোচনা অনেকেরই রুচিকর নহে এবং বাদপ্রতিবাদ অনর্থক শুষ্ক কলহে পর্য্যবসিত হইতে পারে। বলিয়া রাখা ভাল যে অতঃপর আমি এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি।" আমরা শ্রীযুক্ত ভারতীভূষণ মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে ও অনর্থক শুষ্ক কলহে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিতে বাদপ্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশে নিরস্ত হইয়া

---

(১) মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়; ৫৫ শ্লোক।

সুরাপান সম্বন্ধে স্মৃতি-শিরোমণি মনুসংহিতা বলিতেছেন,—"কোন দ্বিজ মোহবশতঃ সুরাপান করিলে তাহাকে অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সুরাপান করাইবে, এইরূপ উত্তপ্ত সুরা দ্বারা পাপীর দেহ পুড়িয়া গেলে তবে সে ঐ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। অথবা, (সুরার অভাবে) গোমূত্র, জল, দুগ্ধ ঘৃত অথবা গোবরের রস অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া যে পর্য্যন্ত পাপীর মৃত্যু না হয়, তাহাকে পান করাইবে। অথবা মাথায় জটা রাখিয়া, কম্বলমাত্র পরিধান করিয়া সুরাপানের পরিচায়ক চিহ্ন (পান পাত্র ইত্যাদি) সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া, চাউলের খুদ অথবা তিলের খইল মাত্র ভোজন করিয়া একবৎসর কাল কাটাইবে। সুরা অন্নের মল, পাপকেই মল বলে ; সেই হেতু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সুরাপান করিবে

প্রতিভায় প্রকাশিত মূল প্রস্তাব উদ্ধৃত করিলাম। আলোচনা মাত্রই কলহ নহে। সংস্কৃত শব্দের বিচার আমাদের ন্যায় লোকের নিকট নীরস হইলেও সাধারণ পাঠকের রুচিঅরুচির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সত্যের সন্ধানে তাহা সুধীজনের অবশ্য আলোচ্য। বিশেষতঃ যে স্থলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ উদ্দেশ্য, সেস্থানে প্রকৃত তথ্যটি নিরূপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণের জন্য তাহার বিস্তারিত আলোচনা না হইলে ব্যক্তিগত ভ্রমের জন্য সমগ্র সিদ্ধান্ত পণ্ড হওয়া বিচিত্র নহে। সত্য উদ্ধার হউক, বাদ-প্রতিবাদ অনর্থক নহে—কলহ নহে—উদ্দেশ্যকে সার্থক করিবার একমাত্র উপায়।

ভারতীভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন "প্রাচীন ভারতে মদ্যপান" শীর্ষক প্রস্তাবটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের প্রয়াসে লিখিত, মদ্যপানের বৈধতা অথবা বর্ত্তমান সমাজে উক্ত পানপ্রথার পুনঃ প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনের জন্য লিখিত নহে। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত ভারতীভূষণ মহাশয়ের এ উক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রাচীন ভাষায় লিখিত তথ্যগুলিকে প্রাচীন ভাষা আলোচনায়, পণ্ডিতগণের সহিত ভাষার বিচার বিশ্লেষণে, তাঁহাদের উপদেশে পুষ্ট হইয়া প্রকৃত তথ্যের সন্ধান-প্রয়াসী হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। লেখক, মহিলা-সম্পাদিত পরিচারিকায় এরূপ আলোচনা প্রকাশিত হওয়া শোভন নহে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার এ উক্তির যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম না। তিনি যে লিখিয়াছেন,—"ডাক্তারী পত্রিকায় নরনারীর শরীরসংস্থান সম্বন্ধে প্রস্তাবই প্রকাশিত হয়, কিন্তু

না। গৌড়ী (গুড় হইতে) পৈষ্টী (চাউল অথবা পিঠা হইতে) এবং মাধ্বী (মধুক অথবা মৌআ ফুল বা ফল হইতে) এই তিন রকম সুরা আছে ;—উহারা সকলেই সমান, উৎকৃষ্ট দ্বিজগণের উহাদের মধ্যে কোনওটিই পান করা কর্ত্তব্য নহে। মদ্য, মাংস এবং সুরাসব (অথবা সুরা ও আসব) যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচগণের খাদ্য ; দেবগণের প্রসাদভোজী ব্রাহ্মণের উপযুক্ত নহে। সুরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তি অপবিত্র স্থানে পড়িয়া যাইতে, (অথবা) বৈদিক মন্ত্র প্রকাশ করিতে পারে, অথবা মদের মত্ততার ফলে অন্যান্য কুকার্য্য করিতে পারে। যাঁহার দেহগত ব্রহ্ম (বৈদিক জ্ঞান) একবার মদ্যের দ্বারা প্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।" (২)

সাধারণ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ্য নহে, তাঁহার সে উক্তির সার্থকতা স্বীকার করি, কিন্তু প্রাচীন তথ্য ডাক্তারীকথা নহে—সাহিত্য, তাহা পরিচারিকায় প্রকাশে বাধা কি ? সেরূপ প্রস্তাব পরিচারিকায় অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। সুলেখক লিখিবেন সংযত ভাষায়—ভদ্র-আচ্ছাদনে। যাহা পাঠ্য তাহা সমগ্র নরনারীরই পাঠ্য হওয়া উচিত। নর-সম্পাদিত সাহিত্য-পত্রিকায় এমন প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়া উচিত নয় যাহা নারীর অপাঠ্য বা নারীসম্পাদিত পত্রিকায় অনুপযুক্ত। প্রত্যেক পত্র পত্রিকাই পাঠক ও পাঠিকা উভয়ের জন্য। 'প্রাচীনের' আলোচনাও এরূপ ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত নহে যাহা প্রাচীন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য কুতূহলী পাঠক বা পাঠিকার নিকট ভাষার জন্য অপাঠ্য। জ্ঞান পিপাসা মনুষ্যের স্বাভাবিক, তাহা নর বা নারীতে সীমাবদ্ধ নহে। জ্ঞানদা একের উপাস্য, অন্যের নহে—ইহা কখনই হইতে পারে না। নর বা নারী বিষয়টা জানিবার অধিকারী হয় যদি সে শক্তি তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সাহিত্য মন্দিরে—নর নারীর অধিকারে, জ্ঞানার্জ্জনে ভেদাভেদ, বাধা নাই। তবে এমন যদি বিশেষ কিছু গুহ্য বা গুপ্ত বিষয় আলোচ্য হয় যাহা সাম্প্রদায়িক,—তদ্রূপ প্রস্তাব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত। প্রাচীন প্রসঙ্গ আলোচনা সে পর্য্যায় ভুক্ত নহে নিশ্চয়ই।

সঃ সঃ।

---

(২) মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায় ; ৯০—৯৭ শ্লোক।

মনুসংহিতার মতই অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থ অনুসৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ "সুরা"র সম্বন্ধেই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে দেখা যায় এবং পরে "মদ্য" ও "সুরাসব" যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচদিগের যোগ্য এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। "সুরা" অর্থে পরিশ্রুত (Distilled Spirit—Brandy, Rum, Whisky Etc.) এবং "মদ্য" ও "আসব" অর্থে কেবলমাত্র অভিষুত (অথচ পরিশ্রুত নহে Fermented *but not distilled*—or wine,—Sherry, Claret, Beer Etc) মদজনক পানীয় বলিয়াই বোধ হয়। বিষ্ণুস্মৃতি গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ "সুরা"ই দ্বিজাতির পক্ষে অপেয় বলিয়া পরে (১) মাধুক (মধু অথবা মৌআ ফুল বা ফল হইতে), (২) ঐক্ষব (ইক্ষু রস হইতে), (৩) টাঙ্ক (?) (৪) কৌল (বদরী বা কুলের রস হইতে), (৫) খার্জ্জুর (খেজুর রস হইতে), (৬) পানস (কাঁটাল ফলের রস হইতে), (৭) মৃদ্বীকা (আঙ্গুর রস হইতে), (৮) মাধ্বীক (মৌআ ফুল অথবা ফল হইতে প্রকারান্তরে উৎপাদিত), (৯) মৈরেয় (শীধু—জাল দেওয়া ইক্ষুরস হইতে) এবং (১০) নারিকেলজ (নারিকেল বৃক্ষের রস হইতে—দক্ষিণাপথে এখনও হইয়া থাকে) এই দশবিধ "মদ্য"ই ব্রাহ্মণের পক্ষে অপবিত্র (কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে স্পর্শ দোষাবহ নহে) বলিয়াছেন (৩)। ফলতঃ স্মৃতিশাস্ত্র "সুরা"পান দ্বিজমাত্রেরই পক্ষে মহাপাপ এবং মদ্যপান অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ পাপ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের এই

---

(৩) গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৮১ ॥
মাধুকমৈক্ষবং টাঙ্কং কৌলং খার্জ্জুর-পানসে।
মৃদ্বীকারসমাধ্বীকে মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥ ৮২ ॥
অমেধ্যানি দশৈতানি মদ্যানি ব্রাহ্মণস্য চ।
রাজন্যশ্চৈব বৈশ্যশ্চ স্পৃষ্ট্বৈতানি ন দুষ্যতঃ ॥ ৮৩ ॥"

বিষ্ণুসংহিতা, ২২শ অধ্যায় ॥

ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ মানিয়া লইয়াছেন। তন্ত্র-শাস্ত্র তান্ত্রিক সাধকগণের সাধনার অঙ্গস্বরূপে যে মদ্য অথবা সুরাপানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রকার আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয় নহে, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিব না।

"মৃদ্বীকা" শব্দের অর্থ দ্রাক্ষা অথবা আঙ্গুর; দ্রাক্ষা রস হইতে মদ্য প্রস্তুতের প্রচলন যে প্রাচীন ভারতে ছিল, এই প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

মনুসংহিতার গৌরব এবং প্রাচীনত্ব সর্ববাদি সম্মত। মনুসংহিতার এই অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্বে আর্য্যসমাজে সুরা অথবা মদ্যপান যে পাপ অথবা পাতিত্যজনক বলিয়া ঘৃণিত ছিল না;—প্রত্যুত সভ্যসমাজে উহা প্রচলিত ছিল তাহাই বোধ হয়। বেদশাস্ত্রে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ, সুতরাং বৈদিক সোমযাগ এবং সৌত্রামণি যজ্ঞের কথা তুলিয়া আমাদের উক্তি সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব না; সে কার্য্যের ভার উপযুক্ত বৈদিক পণ্ডিতের উপরই ন্যস্ত রাখা উচিত। প্রাচীন লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে এ সম্বন্ধে আমরা কতদূর জানিতে পারি, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়বিশেষের দেব দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পিত সুরা অথবা আসব প্রয়োগের উদাহরণ যে আমরা গ্রহণ করিব না, তাহা এইমাত্র বলিয়াছি। "ধার্ম্মিক-আচার" বলিয়া পরিচিত কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

মনুশাসিত আর্য্যসমাজে দ্বিজসাধারণের পক্ষে সুরাপান অতিশয় ঘৃণিত পাপ বলিয়া প্রচারিত হওয়ার পরেও সমাজ হইতে এই প্রথা উঠিয়া যায় নাই। সুরাপান সর্ব্বদেশের সভ্যাসভ্য সমাজেই সুপ্রাচীন কাল হইতে সুপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে; উহার মূলে মনুষ্যের সুখেচ্ছা অথবা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে সন্দেহ নাই। মনুসংহিতায়ও এই ভাবের প্রকাশক একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—"মাংস ভক্ষণে, মদ্যপানে মৈথুনে দোষ নাই; জীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই তাহাদিগকে এতদ্বিষয়ে পরিচালিত করিয়া থাকে,—তবে উহাদের পরিত্যাগ নিশ্চয়ই মহাফল প্রদান করে" (৪)। সুরা

(৪) ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥ ৫৬ ॥ মনুসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়ে

অথবা মদ্যপান সাধারণতঃ সমাজে প্রচলিত না থাকিলে উক্ত শ্লোক শাস্ত্রমধ্যে স্থান পাইত না। আরও, মনু মহারাজ বেদাধ্যায়ী ছাত্রমণ্ডলীর জন্য মদ্যপান বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন দেখিয়া (৫) আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ গৃহস্থ লোকের মধ্যে মদ্যপান সুপ্রচলিত ছিল বলিয়াই, ছাত্রদিগকে, পাঠ্যাবস্থায় অন্যান্য ভোগ-বিলাসের উপকরণ সামগ্রী বর্জ্জনের উপদেশের সহিত মদ্যপান করিতেও নিষেধ করা হইয়াছে।

বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ মহাকাব্য যে লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যের অতিশয় পুরাতন গ্রন্থ, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এই মহাকাব্যে সুরার উৎপত্তির বর্ণনা আছে। সমুদ্রমন্থনে সুরার উৎপত্তি হওয়ার পরে, দেবগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু দৈত্যগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। "সুরা"কে দেবগণ গ্রহণ করায় তাঁহাদের নাম "সুর" এবং দৈত্যেরা তাঁহাকে গ্রহণ না করায় তাঁহাদের নাম "অসুর" হইয়াছিল। এই অতি প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সুরা প্রথমে দেবগণের "অন্ন"ই ছিল, মনুকথিত "যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচের অন্ন" (৬) ছিল না। কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যের রাজা ও রাণীরা যে অতিশয় মদ্যপান করিতেন, তাহা রামায়ণকার পুনঃ পুনঃ লিখিয়া গিয়াছেন (৭), রাক্ষস

---

(৫) বর্জ্জয়েন্ মধুমাংসং চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্॥ ১৭৭॥ ঐ দ্বিতীয়াধ্যায়ে।
ইত্যাদি—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীর কর্ত্তব্য বর্ণনায়—১৭৭—১৮০ শ্লোক।

(৬) যক্ষরক্ষঃ পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥ ॥ ৯৫॥ ঐ একাদশ অধ্যায়।
রামায়ণ আদিকাণ্ডে সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গে—
"দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতাবীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্॥ ৩৮॥
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ॥" ৪৫ সর্গ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)।

(৭) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩৩ সর্গ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)।

রাজধানী সুসভ্যা লঙ্কা ত সুরা স্রোতে প্লাবমানা ছিল বলিলেও চলে (৮)। রাক্ষস এবং বানরেরা আর্য্য-সমাজভুক্ত ছিল না বলিয়া মনে করিলে অবশ্য তাহাদের আচার ব্যবহার লইয়া আর্য্যাচার সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না। কিন্তু রামায়ণ উত্তর কাণ্ডে রামচন্দ্রের অশোকবনে পান-গোষ্ঠীর বর্ণনা আছে। অযোধ্যা রাজধানীস্থিত অতি শোভাকর অশোকবনের বর্ণনার পরে কবি বলিতেছেন,—"কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সীতার হস্তধারণ করিয়া, ইন্দ্র শচীকে যেরূপ করেন, সেইরূপে তাঁহাকে স্বচ্ছ মৈরেয় মন্ত (শীধু—জ্বাল দেওয়া ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত) পান করাইলেন। কিংকরগণ রামের ব্যবহার জন্য সত্বর সুমিষ্ট মাংস এবং বিবিধ ফল আনিল। নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরোগণ কিন্নরীগণে পরিবৃত হইয়া রামের নিকট নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যগীতপটু উদার প্রকৃতি রূপবতী নারীগণ পান-বশীভূত হইয়া কাকুৎস্থের নিকট নৃত্য করিতে লাগিল। রমস্থিতৃগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সতত সুভূষিতা মনোহভিরামা সেই সকল সুন্দরীগণের মনোরঞ্জন করিলেন" (৯)।

---

(৮) সুন্দরকাণ্ড, দশম, একাদশ সর্গ ইত্যাদি—(বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

(৯) সীতমাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি ॥১৮॥
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ ॥১৯॥
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।
উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥২০॥
অপ্সরোগণসংঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।
দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশংগতাঃ ॥২১॥
উপানৃত্যন্ত কাকুৎস্থং নৃত্যগীত বিশারদাঃ।
মনোভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ ॥২২॥
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরম ভূষিতাঃ।—৪২ সর্গ। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড মহর্ষি বাল্মীকির রচনা নহে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। তথাচ, উহা অল্পদিনের রচনা নহে। সীতা-নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত এই উত্তরকাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত বৃত্তান্ত নানা পৌরাণিক পুস্তকে এবং লৌকিক কাব্যাদিতে অনেক দিন হইতেই স্থান পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। কবি কালিদাস কৃত "রঘুবংশ" কাব্যে ও কবি ভবভূতি রচিত "উত্তরচরিত" নাটকে উত্তরকাণ্ডের সীতানির্ব্বাসন বৃত্তান্তই গৃহীত হইয়াছে। যাহাহউক, রামায়ণে মদ্যপান সম্বন্ধে আমরা আর কোন সামাজিক প্রবাদ প্রাপ্ত হই নাই।

পৌরাণিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ-সমাজে সুরাপান এবং তৎপ্রতিষেধের এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। দেবাসুর যুদ্ধের সময় (দেবগণের অমৃত ভক্ষণ ও তজ্জন্য অমরত্ব লাভের পূর্ব্বে) যুদ্ধে মৃত অসুরদিগকে তাহাদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে বাঁচাইতেন, কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতির ঐরূপ বিদ্যা না থাকায় মৃত দেবগণ পুনরায় জীবন-লাভ করিতে পারিতেন না এবং তজ্জন্য দেবপক্ষের অত্যন্ত হানি ঘটিত। এই ত্রুটি পরিহারের উদ্দেশ্যে দেবগণ বৃহস্পতিপুত্র কচকে ঐ বিদ্যায় বিদ্বান্ হইবার জন্য শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ ঈর্ষ্যা বশতঃ কচকে মারিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভর্জিত করেন এবং গুরু শুক্রাচার্য্য সুরাপানে মোহিত হইলে তাঁহাকে ঐ মাংসখণ্ড অথবা চূর্ণ খাওয়াইয়া দেন। শুক্রাচার্য্য সুরার মোহে মোহিত হইয়া কচের মাংস খাওয়ায় বুঝিতে পারেন যে কোনও ব্রাহ্মণেরই সুরাপান করা উচিত নহে; এবং তিনি এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া দেন (১০)। তিনিই অভিসম্পাত দেন যে অতঃপর যে ব্রাহ্মণ

---

(১০) সুরাপানাদ্ বঞ্চনাং প্রাপ্য বিদ্বান্ সংজ্ঞানাশং চৈব মহাতিঘোরম্।
দৃষ্ট্বা কচং চাপি তথাভিরূপং পীতং তদা সুরয়া মোহিতেন ॥৬৫॥
স মন্যুমুত্থায় মহানুভাবস্তদোশনা বিপ্রহিতং চিকীর্ষুঃ।
সুরাপানং প্রতিসংক্রুদ্ধঃ কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদং জগাদ ॥৬৬॥
যো ব্রাহ্মণোঽদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিন মোহাৎসুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিঁল্লোকে গর্হিতঃ স্যাৎপরে চ ॥৬৭॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব, ৭৬ অধ্যায় (বোম্বাই সংস্করণ) এবং মৎস্যপুরাণ, ২৫ অধ্যায় (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)। অন্যান্য পুরাণেও এই আখ্যান আছে। মৎস্যপুরাণের আখ্যায়িকা ও মহাভারতের আখ্যায়িকা অবিকল একরূপ, একটি অপরের প্রতিলিপি বলিয়াই বোধ হয়।

সুরাপান করিবেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে এবং তিনি ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দিত হইবেন।

মহাভারতে নানাস্থানে মদ্যপানের উদাহরণ পাওয়া যায়। এই উদাহরণ ব্রাহ্মণ সমাজের আচার হইতে নহে, পরন্তু ক্ষত্রিয় সমাজের,—বিশেষতঃ রাজা মহারাজের অন্তঃপুরের—আচার হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদিপর্ব্বে, খাণ্ডবদাহ পর্ব্বাধ্যায়ে বনবিহার রত কৃষ্ণার্জ্জুনের সহযাত্রী স্ত্রী পুরুষে মদ্যপান, বিরাটপর্ব্বে, রাজা বিরাটের মহিষী সুদেষ্ণার জন্য কীচকগৃহ হইতে সৈরিন্ধ্রীবেশিনী দ্রৌপদীর মদ্য আনয়ন, যুদ্ধের অগ্রে যুদ্ধার্থী বীরগণের মদ্যপান (বীরপান)—ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আছে (১১)। অপর পক্ষে, শান্তিপর্ব্বে, রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে ধার্ম্মিক লোকের উপদেশ বশতঃই হউক, প্রাণান্তিক বিপদেই হউক অথবা অজ্ঞানবশতঃই হউক, মদ্যপান করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুনরায় সংস্কার (উপনয়ন গ্রহণ) গ্রহণ করিতে হয় (১২)। মহাভারতের মৌষলপর্ব্বের বর্ণিত প্রভাসক্ষেত্রে যাদব বীরগণের মদ্যপান বশতঃ পরস্পর বিবাদে সকলেরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশ গ্রন্থে যাদবগণের পান-গোষ্টির অতিশয় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বলরাম যে অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন, তাহা মদ্যের একটী নামেই (হলিপ্রিয়া) প্রকাশ পায়। তাঁহার কাদম্বরী নামক মদ্যপানের বিষয় ত পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে (১৩); কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম তাঁহাদের মহিষীগণ, কুমারবৃন্দ ও অর্জ্জুনাদি সখাসখী

---

(১১) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২২ অধ্যায়।
ঐ বিরাটপর্ব্ব, ১৫ অধ্যায়, ১৬ অধ্যায়, ৭২ অধ্যায়।
ঐ দ্রোণপর্ব্ব ১২৭ অধ্যায়, ইত্যাদি।

(১২) প্রাণাত্যয়ে তথা হজ্ঞানাদাচরন্ মদিরামপি।
আদেশিতো ধর্ম্মপরৈঃ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥২০॥ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪ অধ্যায়।

(১৩) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪১শ অধ্যায়।

সহিত নানাবিধ পানাহার গীতবাদ্য নৃত্যলীলা বিলাস-সমন্বিত পানগোষ্ঠীর আনন্দে কিরূপ নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহার অতি বিস্তৃত এবং সুন্দর বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে (১৪) স্থানাভাববশতঃ আমরা উহার সম্যক্ পরিচয় দিতে অথবা উদ্ধার করিতে অক্ষম, সুতরাং কৌতূহলী পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন স্বয়ং ঐ স্থলগুলি পড়িয়া দেখেন। শ্রদ্ধের ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ "কৃষ্ণচরিত্র" পুস্তকে এই বিষয়ের আদৌ উল্লেখ করেন নাই। প্রাচীন ভারতের রাজন্য-সমাজে সম্ভ্রান্ত নর-নারীর পানগোষ্ঠীতে এবং নৃত্যগোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া যে আদৌ নিন্দার বিষয় ছিল না, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যালোচনা হইতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাৎস্যায়ন প্রণীত "কাম সূত্র" এবং অন্যান্য নানাগ্রন্থে পানগোষ্ঠী ও নটগোষ্ঠীর সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৬৯ অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ উত্তানপাদ রাজের পুত্র উত্তমরাজের (ধ্রুবের বৈমাত্রেয়) পানগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। দেবীমাহাত্ম্যে শ্রীশ্রীদেবীর মধু-প্রিয়তার কথা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না। অন্যান্য পুরাণেও নানাস্থানে রাজা এবং রাণীর মদ্যপানের উৎসবের বর্ণনা আছে, তাহার উল্লেখও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

কালিদাস প্রণীত কাব্যাবলীতে রাজমহিষী হইতে সমুদয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মদ্য অথবা আসবপানের অভ্যাসের বার্ত্তা পাওয়া যায়। ঋতু সংহার, মেঘদূত, রঘুবংশ এবং কুমারসম্ভব

---

(১৪) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৮।৮৯ অধ্যায়। এই দুই অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের রাসলীলা বর্ণন অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং অন্যান্য যাদব-গণের পানাহার ও (এখানকার রুচি অনুসারে) নিতান্ত অশ্লীল ভাবের নৃত্যগীতাদি লীলা বিলাসের বর্ণনা আছে। সম্প্রতি মথুরায় আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতেরা উহাদিগকে গ্রীক শিল্পের Bacchante মূর্ত্তি এবং ঐগুলি শিথীয় যুগের শিল্প বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। উহারা কি হিন্দুযুগের শিল্পের নিদর্শন হইতে পারে না?

কাব্যে নারীগণের এই পরিচয় সাধারণভাবে পাওয়া যায় (১৫)। তাঁহার রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সম্রাট অগ্নিমিত্রের রাণী ইরাবতীকে কবি মদযুক্তা

---

(১৫) (১) ঋতুসংহারে,—গ্রীষ্ম বর্ণনায় ৩য় শ্লোকে—"প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিতং মধু", শরদ্ বর্ণনায় ৩য় শ্লোকে "মন্দ প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য", হেমন্ত বর্ণনায় ১২শ শ্লোকে "পুষ্পাসবামোদি সুগন্ধি বক্ত্রো নিঃশ্বাসবাতৈঃ সুরভি কৃতাঙ্গঃ", শিশির বর্ণনায়, ৫ম শ্লোকে "মুখ সবামোদিত বক্ত্রপঙ্কজাঃ", ১৩ শ্লোকে 'সুগন্ধি নিঃশ্বাস বিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কামরতি প্রবোধকম্। নিশাসু হৃষ্টাঃ সহকামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ পিবন্তি মদ্যং মদনীয়মুত্তমম্॥", বসন্ত বর্ণনায় ১১শ, ১২শ, ৩১শ, ৩২, এবং ৩৪শ শ্লোকে মদ্যপানের উল্লেখ দেখা যায়। ৩০শ শ্লোকে "মত্তালিযুথবিরুতং নিশি শীধুপানং সর্বং রসায়নমিদং কুসুমায়ুধস্য" আছে।

(২) রঘুবংশের সপ্তমসর্গে অজ মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহের পর বিদর্ভ নগর বাসিনী ভদ্রমহিলাগণের বধূ বর দর্শনার্থ ঔৎসুক্য বর্ণনায়, রাজমার্গের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদ সমূহের বাতায়নগুলি নারীমুখ সমাচ্ছন্ন হওয়ায় কবি বলিতেছেন "তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্। বিলোল নেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষা সহস্র পত্রাভরণা ইবাসন্॥১১॥

(৩) কুমার সম্ভবের সপ্তমসর্গে হরগৌরীর বিবাহের অগ্রে হিমালয়-নগরে (ওষধি প্রস্থে) নারীগণের বর দর্শনে কৌতূহল বর্ণনায় ঠিক ঐ শ্লোকটিই (৬৫ তম শ্লোকে) প্রদত্ত হইয়াছে। ৪র্থ সর্গের শ্লোকে "অসতিত্বয়িবারুণীমদঃ ইত্যাদিতে মদের প্রচলন উক্ত হইয়াছে।

(৪) মেঘদূতে উত্তরমেঘের ৫ম, ১৩শ, ১৭শ এবং ৩৪শ শ্লোকে এই ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩০শ শ্লোকের শেষে যক্ষের উদ্যানস্থ বকুলবৃক্ষকে তাঁহার পত্নীর মুখ-মদিরার অংশী স্বরূপ বর্ণনা আছে। সে কালে সুন্দরীগণ স্বামীর সহিত একত্র মদ্যপান করিতেন বলিয়া যক্ষ তাঁহার প্রিয়ার মুখস্পৃষ্ট মদিরার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু নারীগণের মধ্যে উদ্যানবৃক্ষের কুসুমোদগমের নিমিত্ত প্রচলিত সকল তুক্ তাকের মধ্যে বকুলের মদ্য-গণ্ডূষ সেক বিহিত ছিল বলিয়াই বকুল বৃক্ষকেও তাঁহার সেই সৌভাগ্যের অংশী বলিয়া সঙ্কেত করা হইয়াছে। ঐ তুক্ তাককে দোহদ বলিত যথা "স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গু-বিকসিত বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ পাদাঘাতাদশোক স্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্। মন্দারোনর্মবাক্যাৎ পটু মৃদু হসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতাচ্চূতো গীতান্ নমেরুর্বিকসতি চ পুরোনর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ॥"

(অর্থাৎ নেশার বশীভূত) অবস্থায়ই রঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার কথাবার্ত্তা, হাবভাব এবং ব্যবহার সমস্তই মত্তের ন্যায়; এমন কি মদের মত্ততার জন্য তিনি চলিতেও পারিতেছেন না। তিনি সখীকে বলিতেছেন,—'সখি, আমার পা ত আর চলিতে চাহিতেছে না; নেশায় আমাকে বিহ্বল করিতেছে' (১৬)। আমাদের মনে হয়, এই রাণী মদের অতিশয় বশবর্ত্তিনী বলিয়াই কবি তাঁহার নাম 'ইরাবতী' ('ইরা' শব্দে মদ্য) অর্থাৎ মদ্যময়ী করিয়াছেন। কবি ভবভূতির নাটকে কিন্তু মদ্যপানের এরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত চরকসংহিতায় সুরা মদ্য এবং আসবের বর্ণনা ও তাহাদের পরিমিত পানের বহু প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। সূরি মল্লিনাথের মেঘদূতের টীকায় (উত্তরমেঘ, ৫ শ্লোক) 'মদিরার্ণব' নামক গ্রন্থের নামোল্লেখ এবং তাহা হইতে "রতিফল" নামক মদ্য ও শীতল আসববিশেষের উপাদানের বর্ণনাত্মক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে ঐ গ্রন্থে সহস্রাধিক বিভিন্ন প্রকার সুরা, মদ্য এবং আসব প্রস্তুতের উপায় কথিত আছে। সম্প্রতি উক্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় কিনা জানি না আমরা অন্বেষণ করিয়া উহার কোন সন্ধান পাই নাই। কবিরাজ মহাশয়দিগের আধুনিক সংগ্রহ পুস্তকেও শতাধিক প্রকার মদ্যের বর্ণনা আছে?

পৌরাণিক কচ-শুক্রাচার্য্য সংবাদে শুক্রকর্ত্তৃক সুরার প্রতি যে অভিসম্পাত প্রযুক্ত হইয়াছিল, উহাতে সুস্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণগণের জন্যই উহার উপযোগ নিষিদ্ধ হইয়াছিল দেখা যায়; পরন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের প্রতি উক্ত নিষেধ প্রযুক্ত হইবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক যুগের তান্ত্রিক সাধকগণ শুক্রশাপ-মোচন এবং শ্রীকৃষ্ণশাপ-মোচন জন্য দুইটি মন্ত্র পাঠ করিয়া সুরাশোধন করিয়া থাকেন। মহাভারতে এবং মৎস্যপুরাণ প্রমুখ মহাপুরাণে শুক্রশাপের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহার উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করিয়াছি; কিন্তু মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে যদুবংশধ্বংস প্রসঙ্গে

(১৬) "ইরাবতী। হঞ্জে মে চলনা অণণগবো ণ পবট্ঠন্তি। মদো মং বিআরেদি।"
(সখি, মম চরণাবগ্রতো ন প্রবর্ত্তেতে। মদো মাং বিকারয়তি।)

শ্রীকৃষ্ণপ্রণত কোনরূপ পাপের বিবরণ খুঁজিয়া না পাওয়ায় উহার সম্বন্ধে কোনই সংবাদ দিতে পারিলাম না।

রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের কাব্যাবলী পর্য্যন্ত আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে রাজান্তঃপুরে এবং বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত ধনি-পরিবারে বিলাসোপকরণ মধ্যে নানাবিধ সুরা, মদ্য অথবা আসবের প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ শুচিতার প্রভাবে সভ্যসমাজে, বিশেষতঃ মহিলা-মণ্ডলীতে আংসাহারের সঙ্গে মদ্যপান রহিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; আমরা কিন্তু তাহার পোষকপ্রমাণ পাই নাই। তান্ত্রিক প্রভাবকে যাঁহারা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত মদ্যপানের ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা জানি না। রামায়ণে গঙ্গা এবং যমুনা পূজার সুরা পূজোপকরণ স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১৭)। তথাকথিত "প্রক্ষিপ্তবাদের" মস্তকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাহারা এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের পরিশ্রম হইতে বিরত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্র এবং দেশাচার উভয়েই ভদ্রসমাজে মদ্যপানের প্রতিকূল। সমাজের এই সাধু অবস্থার কারণ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গের নিকট সানুনয় অনুরোধ করিয়া আমরা অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

(১৭) অযোধ্যাকাণ্ডে, রামসীতার গঙ্গাপার হইবার সময় সীতা গঙ্গার নিকট মানত করিতেছেন,—

"সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রযতা দেবী পুরীং পুনরুপাগতা ॥৮৯॥৫২॥ সর্গ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)
পুনশ্চ যমুনার প্রতি,—"স্বস্তি দেবী তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্।
যক্ষ্যে ত্বাং গো সহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ ॥২০॥৫৫ সর্গ (ঐ সংস্করণ)

জন্মাষ্টমী।

—:০:—

ঘনঘোর মেঘজালে ঘেরিয়া আকাশ;
মত্ত বায়ু ফেলে যেন প্রলয়ের শ্বাস।
স্তব্ধ নিশি দ্বিপ্রহরে মৌন প্রিয়জন—
বিশ্রামিছে নিজ গেহে ব্রজবাসীগণ
দিবসের কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত দেহখানি
নিদ্রার মোহন স্পর্শে শান্তি মাঝে আনি।
মেদিনী কম্পিত করি হুঙ্কারে গভীর
বিকট জলদ দল কৃষ্ণাকাশ পারে
যেন কোন্ দানবের তীব্র অত্যাচারে
ক্ষেপিয়াছে সংহারিতে শক্র দেববীর।
কৃষ্ণ যমুনার বক্ষ ফেনিল উত্তাল
গর্জ্জে উঠে রুদ্র ঊর্ম্মি প্রচণ্ড ভয়াল,
বুঝি কোন মহাপাপে দেবতার রোষে
পড়িবে ধরণী আজ কক্ষ হ'তে খ'সে।
সৃষ্টি তার ধ্বংস মাঝে হইবে বিলীন;
বুঝি আজ যুগ-শেষী প্রলয়ের দিন।
আকাশের প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ছুটে যায়
বিকট গর্জ্জন মহা ভৈরব লীলায়।
হেনকালে বসুদেব যমুনার তীরে
আসিলেন সিক্ত গাত্রে কম্পিত শরীরে;
ক্রোড়ে এক সদ্যজাত ফুল্লশিশু ধরি;
দেহে তা'র কি মোহন রূপ মরি মরি!
যেন এক দীপ্তি ঘন—নবীন উজ্জ্বল
পড়িতেছে বিচ্ছুরিয়া নাশি তমদল—
ভাদরের কৃষ্ণপক্ষে বাদল রাতের
গগনের বক্ষ চেরা বিজলীর সম

কিবা তা'র বর্ণ শ্যাম সুমধুর কম !
পথিকের আলো প্রায় আঁধার পথের
দেখাইয়া পথ বুঝি আনিয়াছে সেই
বসুদেব গৃহ হ'তে নদী পুলিনেই ।

** ** **

মথুরার অধিপতি কংশ ধ্বংস হেতু,
রচিবারে মর্ত্তমাঝে পুণ্যে গড়া সেতু
স্বরগে গমন তরে পাপ মানবের
ভগবান নামিলেন মর্ত্ত্যে; দানবের
অত্যাচার নিবারিতে দানবের সাজে
বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভ মাঝে
প্রস্তর বেষ্টিত দৃঢ় কংস-কারাগার
দ্বিপ্রহর রজনীতে; স্তব্ধ চারিধার !
সহসা দম্পতী যেন হারাইল জ্ঞান
ক্ষণতরে; বসুদেব ভূমিতে শয়ান
শুনিলেন কর্ণ মাঝে কেবা যেন বলে—
"শীঘ্র তব নবজাত পুত্র লও কোলে;
যাও চলি বৃন্দাবনে গোপ নন্দালয়ে
আইস রখিয়া সেথা শিশু পুত্র তব;
আর সেথা আছে এক কন্যাজাত নব,—
"আন তারে রাত্রিমাঝে তোমার আলয়ে।"
নিদ্রাভঙ্গে বসুদেব সমুখে চাহিয়া,
ক্রীড়ারত ক্ষুদ্র শিশু মুখ নিরখিয়া
স্মরিলেন স্বপ্ন তাঁর; তখনই উঠিয়া
লইলেন শিশুপুত্র ক্রোড়েতে তুলিয়া
ত্বরা ক'রি বাহিরিয়া অন্ধকার পথে
চলিলেন নদীপথে তীব্র মনোরথে
করিবারে পূর্ণ ত্বরা; নাহি লক্ষ্য তাঁর
অজস্র প্রবাহে পড়ে বৃষ্টি ধারাধার।

চমকে চপলা আকাশের বক্ষ চিরি ;
ক্ষণেকেও বসু.দব না চাহেন ফিরি।

**

নদীতীরে পঁহুছিয়া হতবুদ্ধি প্রায়
ভাি:ছেন কেমনে এ রুদ্র যমুনায়
উত্তরিয়া পরপারে যাইবেন তিনি ;
নাহি ত' পারের তরে খানেক তরণী।
দাঁড়াইয়া চারিধারে চাহি অনিমেষ ;
সহসা সমুখে তা'র ক্ষুদ্র শিবা এক
থল থল শব্দ ক'রি গেল সন্তরিয়া
পরপারে ; দেখি তাই পুলকিত হিয়া
বসুদেব নামিলেন যমুনার জলে
শিশু পুত্র বহু যত্নে ধরি নিজ কোলে।
শিশুর মস্তক হেরি আচ্ছাদনহীন
বিকট ফণিনী এক,—এবে হিংসাহীন—
বিস্তারিয়া ফণা তার মূর্ত্তিমান কাল
ধরিল শিশুর মাথে বিস্তৃত ভয়াল।
নিরাপদে অতি সুখে গেলা বসুদেব
যমুনার পরপারে সেই বৃন্দাবনে
গোপরাজ নন্দালয়ে খুঁজি সেইক্ষণে
দানিবারে শিশুপুত্র ; যেমতি সে দেব
স্বপ্নমাঝে করিয়াছে আদেশ তাঁহারে
ল'য়ে যেতে গোপকন্যা কংস কারাগারে
দেখে গিয়া সেথা সবে নিদ্রা নিমগন ;
ধীরে ধীরে বিনাশব্দে শিশুকে তখন
রাখিয়া নন্দের প্রিয়া যশোদার বুকে
কন্যা ল'য়ে বসুদেব পূর্ণ মহাসুখে
কম্পিত ত্বরিত পদে গৃহপানে ধায়।
বুঝিল না কা'রে ব্রজে রেখে এল হায়!

কাহারে বা নরকন্যা ভাবি মনে মনে
চলে পথে বসুদেব ত্বরা প্রাণপণে!
ভাদ্রভূ রচিল জন্ম ইষ্টদেবতার।
চরণে শরণ চায়, কিবা আশা আর॥

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভরা ভাদরেও এবার ছিল না এবার একেবারে বৃষ্টি। শস্যের দশা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সপ্তাহাধিক কাল হইতে অবিরত বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। নদীতেও বান ডাকিয়াছে। রৌদ্র দগ্ধ ওষধিরাজি আবার শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। কৃষক উচ্চ ভূমিতে দিন রাত কর্ষণ ও রোপণে ব্যস্ত। ভাদ্রে এইরূপ চলিলে বারো আনা শস্যের আশা করা যায়। তরি-তরকারী এবারে অন্য বৎসর অপেক্ষা কিছু শস্তা। কিন্তু মৎস্য প্রভৃতি দুর্মূল্য। সহরের স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে। মফঃস্বলে স্থানে স্থানে বসন্ত ও কলেরা দেখা দিয়াছে। গো মড়ক মফঃস্বলে লাগিয়াই আছে। ব্যাধির প্রকোপ নিবারণে সরকার হইতে বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। নানা কারণে কোচবিহারে গো-জাতির ক্রমশঃই অবনতি ব্যতীত উন্নতি নাই, তাহার উপর প্রতি সপ্তাহে গোরুর দালালগণ গবাদি অন্যত্র চালান দেওয়ায় তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। অভাবই ইহার মূল হইলেও দালালগণের প্ররোচনাও গো বিক্রয়ের অন্যতম কারণ। সময়ে ইহার প্রতীকার না হইলে একদিন এজন্য হাহাকার উঠিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

** ** **

বৃষ্টি উপস্থিত হইলে স্থানীয় চাউলের আমদানী বাজারে একেবারে হয় না। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীগণ ধান্য হইতে দিনকার দিন চাউল প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন টাট্‌কা চাউল ব্যবহার করে, তাহারা ঘরে মজুত চাউল রাখে না। বর্ষণকালে রৌদ্রের অভাবে চাউল প্রস্তুত হইতে পারে না সুতরাং গৃহে ধান্য থাকিলেও বৃষ্টির দিনে চাউলের অভাব উপস্থিত হয়। এই সুযোগে বাজারের মহাজনেরা চাউলের দর মোটা হাতে বাড়াইয়া থাকে। যে চাউল বৃষ্টির পূর্ব্বে ছয় টাকা মণ ছিল, এখন তাহার মূল্য পোনে সাত টাকা, ইহার প্রতীকারের কি উপায় নাই?

** ** **

বঙ্গের অন্যতম দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার অধীশ্বর মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বিগত ২৮শে শ্রাবণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর হইয়াছিল। মহারাজ নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন ও তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিপুরায় বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুবরাজের বয়স ৬ বৎসর সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যেও কার্য্য সরাবরাহকারী মহামান্য রাজসভা দ্বারা বর্ত্তমান মহারাজের নাবালককালে সাধিত হইবে। কোচবিহারের রাজপরিবার ও অধিবাসীবর্গ ত্রিপুরার আকস্মিক বিপদপাতে ব্যথিত হইয়াছেন। মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ কোচবিহারের আফিস আদালত কলেজ স্কুল প্রভৃতি এক দিবসের জন্য বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজের মুক্তাত্মার অশেষ কল্যাণের জন্য ও শোক সন্তপ্ত রাজপরিবারের শান্তির জন্য আমরা সর্ব্বনিয়ন্তার নিকটে প্রার্থনা করি।

** ** **

ত্রিপুরা আর একটী রত্ন হারাইয়াছেন। পরিচারিকাও এই সঙ্গে তাঁহার একজন সহৃদয় বন্ধু ও লেখক হইতে বঞ্চিত হইল। কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মণ বিগত ৩ শে জুলাই শেষ রাত্রে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সময়ের বহুতথ্য অবগত ছিলেন এবং তাৎকালিক অবস্থার একটা ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী ছিলেন,—ইহার ফলে তাঁহার সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া তিনি পরিচারিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার শক্তি ও সুবিবেচনার পরিচয় পাঠকপাঠিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের ন্যায় উৎসাহশীল ছিলেন, সাহিত্য সেবায় তাঁহার অতুল আনন্দ হইত। কিন্তু বৎসরাধিক কাল হইতে শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি তাঁহার মনন কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে ত্রিপুরার তৎকালের ইতিহাসের বহু তথ্য সঙ্কলিত হইত। জানি না তিনি এই জন্য কোন উপকরণের চুম্বক সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা, আমরা আশা করি তাহার সুযোগ্য বংশধর শ্রীমান সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ এ বিষয়ে পিতার দপ্তরে অনুসন্ধান করিবেন।

কর্ম্মী মহাপ্রস্থান করিলেন। পরম পিতার করুণাশ্রয়ে নিশ্চয় তিনি কর্ম্মান্তে সুখী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে লোকান্তরিতের সে সুখশান্তি স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে অনুরোধ করি। ভগবান তাঁহাদিগকে শান্তি দান করুন।

বিপদের অন্ত নাই। মৃত্যুর আঘাত কঠোরতর কুলীশাঘাত হইতেও কঠোরতর। নিয়তির গতি কে রোধ করিতে পারে! আমাদের শ্রীশ্রীমহারাণী আজ সহোদরের শোক-জর্জ্জরিত। বরোদার মহারাজকুমার জয়সিংহ রাওয়ের মহাপ্রস্থান আকস্মিক! তিনি কিয়ৎকাল হইতে জার্ম্মেণীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি যখন জার্ম্মণী হইতে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডম উদ্দেশে রেলওয়ে যোগে যাত্রা করেন, গাড়ী আমষ্টর্ডমে উপস্থিত হইলে দেখা গেল মহারাজকুমারের দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে! মহারাজকুমারের এরূপ মৃত্যুতে আত্মীয়স্বজন বিশেষ ভাবে ব্যথিত ও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিয়ন্তার কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। আমরা কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি মৃতাত্মার মঙ্গলবিধান করুন—শোককাতরগণের অন্তরের সান্ত্বনা দিন। মহারাজ কুমারের মহাপ্রস্থানে শোক প্রকাশার্থ কোচবিহারের আফিস, আদালত, কলেজ, স্কুল দুই দিনের জন্য বন্ধ ছিল।

• • • • • •

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এবারে কয়েকটী ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ পত্রিকাস্থ করিতে পারিলাম না, আশা করি সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ভ্রম সংশোধন।

গত শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচারিকা'র ১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বরলিপিতে, দুঃখের বিষয়, আমি একটু ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। স্বরলিপির পঞ্চম ও ষষ্ঠ সারিকাদ্বয়ে যাহা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে এই রকম হওয়া উচিত ছিল :—

| র্রা মা -া -া জ্ঞা রা সা রা | -া -া । মা ধণা ধা -া ধা I
দো ষে ০ ০ অ কা র ণে ০ ০ ০ এ ০ এ ০ এ

I (-া -া মা ণা ধা -া -া ধা) } | -া ধা -া ণা -ধণা পধণর্সা -ণা ধা |
০ ০ 'ত বু সে ০ ০ তো' ০ এ ০ এ ০ ০ এ০০০ ০ এ

অর্থাৎ স্বরাক্ষরগুলি যাহা ছাপা হইয়া গিয়াছে তাহাই ঠিক, কেবল পুনরুক্তি সম্বন্ধে এখন ভাষাঙ্কের সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইল। 'পরিচারিকা'র সঙ্গীতপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উল্লিখিত শুদ্ধ সারিকা দুইটি, যদি ইতঃপূর্ব্ব প্রকাশিত সারিকাদ্বয়ের পরিবর্ত্তে লিখিয়া রাখেন, তাহা হইলে গানটির স্বরলিপি সংরক্ষণের পক্ষে সাহায্য করা হয়।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ

৭ম বর্ষ। } আশ্বিন, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

বিরাটপুরে।

—:০:—

চির নিষ্প্রভ-চন্দ্র-সূর্য্য তারা,
গ্রহ-ধূমকেতু আলোক পুচ্ছ হারা,
অস্ফুট ফুলের পৃথক একটা পাড়া
আছে তার বুক জুড়ে,
বিরাটের সেই পুরে।

(২)

উড়িতে না পারি ভ্রমর গুমরি মরে,
ডাকিতে না পারি পিকের নয়ন ঝরে,
চলিতে না পারি লুকায় সরম ভরে,
মণি দীপ গৃহ যুড়ে
বিরাটের সেই পুরে।

(৩)

সিংহ ব্যাঘ্র থাকে শৃগালের মত,
শাল তাল তরু মাথা করে রয় নত,
মণি মাণিক্য হয়ে রয় জ্যোতি হত,
আলোকণা নাহি স্ফুরে
বিরাটের সেই পুরে।

(৪)

ফকিরের বেশে বেড়ায় রাজার ছেলে
সিংহাসনের সংবাদ নাহি পেলে
বাসুকী সেখানে হয়ে থাকে যেন ছেলে,
মরে যায় মাথা খুঁড়ে
বিরাটের সেই পুরে।

(৫)

ঝঙ্কার হেতা উঠে না বীণার তারে
পাখোয়াজী শুধু বৃথা হাত তার নাড়ে
গাঁথা মালা হায় ছিঁড়ে যায় বারে বারে,
শেষে ফেলে দেয় দূরে
বিরাটের এই পুরে।

(৬)

ভগবান হেতা কীট হয়ে কাটে শিলা
পার্থ ধনুকে পরাতে পারে না ছিলা,
এ সব হরির বিরাট পুরের লীলা
দেখে দুটী আঁখি ঝুরে
বিরাটের এই পুরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মোগল-সন্ধ্যা।

---:*:---

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রা, সময় রাত্রি,—দ্বিতীয় প্রহর তাজমহলের সম্মুখস্থ বনবীথি প্রান্তে মর্ম্মরগঠিত অবতরণিকার উপর ফরাকসিয়ার ও জুলেখা দণ্ডায়মান; সম্মুখে যমুনার শান্ত প্রবাহ।

সিয়ার। জুলি! ঐ যে মর্ম্মরস্বপ্ন তাজমহল। উন্নতশির মিনারগুলি ওর ঐ দেখো সুনীল আকাশকে চুম্বন করবার আশায় কত উর্দ্ধে উঠে গেছে। বসন্তের মদির নিশ্বাসে

আকুলিত যমুনার অশ্রান্ত তরঙ্গগুলি কেমন আবেশ ভরে নেচে নেচে নিদ্রিতা মমতাজ বিবির শ্রবণপথে সাজাহান বাদশার প্রেমগুঞ্জরণের প্রতিধ্বনি কলসঙ্গীতে গেয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। মানবহৃদয়ের অনন্ত বিরহ-বেদনার মৌন উচ্ছ্বাস আলোর উচ্ছল জোয়ারে আজ লাজহীন, মুখর। কেমন সুন্দর দেখেছ!

জুলেখা। সত্যি বড় সুন্দর। সিয়ার! তুমি ত সাজাহানের মত দিল্লীর বাদশা হয়েছ। তোমার প্রেয়সীর সমাধির উপর তুমি এ রকম একটা সৌধ গড়ে দিতে পারবে?

সিয়ার। তুমিই ত আমার প্রেয়সী, জুলি! ধরো আমি যেন পারলুম, কিন্তু তুমি কি এ রকম একটা সৌধের নীচে ঘুমিয়ে পড়বার জন্য আমায় ছেড়ে চলে যেতে পারবে?

জুলেখা। ইস্ কেন পারব না? তুমি সত্যি করে বলো আমি মরলে পর এ রকম একটা তাজমহল তুমি গড়বে?

সিয়ার। হাঁ, আমি সত্যি সত্যিই বলছি—আমি গড়ব।

জুলেখা। তোমায় বিশ্বাস?

সিয়ার। যদি বিশ্বাস না করতে হয় নাই বা করলে।

জুলেখা। তোমায় খুব বিশ্বাস করি,—সিয়ার। কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না, ওরকম লক্ষটা তাজমহলের জন্যও নয়। এ সৌন্দর্য্যদীপ্তিতেও—তোমা ছাড়া আমার জগৎ আলোকিত হবে না—তুমি যে দেশে নেই—উঃ! সে কি আঁধারেরই দেশ হবে, ভাবতে পারছি না। আচ্ছা, সিয়ার! তুমি আমায় যেমন ভালবাস, সাজাহান বাদশা কি—তাজ বিবিকে তেমনি ভালবাসতেন?

সিয়ার। হাঁ জুলি! সম্রাট সাজাহান যথার্থ প্রেমিক ছিলেন। কত নিভৃত নিশিতে রাজপ্রসাদের শূন্য বাতায়নে বসে জলভরা ছল ছল আঁখি দুটী তাঁর ঐ সৌধের পানে চেয়ে চেয়ে নিশান্তের তারার মত বেদনায় মলিন হয়ে যেত; কত দীর্ঘশ্বাস তাঁর যমুনায় কল্লোল তুলে প্রভাতের আকাশকে বেদনার অরুণ আভাসে রঞ্জিত করে' অপূর্ব্ব লাবণ্য বিলাসে ডুবিয়ে দিত। সে যে স্বপ্নের কথা, জুলি!

জুলেখা। তোমার কথ যে আজ ফুরুচ্ছে না, সিয়ার। আমি একটা গান গাইব।

সিয়ার। জীবনের অব্যক্ত কথাগুলি অভ্যাসেই চিরকাল থেকে যায়—তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা বৃথা। অনন্ত প্রেম চিরবিরহীর বাণীতে ফুটি ফুটি করে—ফুট্‌তে ফুট্‌তে আধখানা সঙ্গীতের মত অন্তরার মাঝে থেমে পড়ে।

(অবতরণিকার একধারে একখানা সুন্দর ছোট নৌকা যমুনার "তীরাপহত লহরীর"—সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছিল—সিয়ার ও জুলেখা উভয়ে একই সঙ্গে তাহাতে উঠিয়া পড়িল।)

কি গান গাইবে, গাও না জুলি!

গান।

জুলেখা। কালো জলে চলে নীল তরী
চুমু খেয়ে ঢেউ ছল করি যেতেছে সরি।
আলো নাচে আধ কল গানে
কি যে কথা কয় কানে কানে,
বাঁধি প্রিয়তমে বাহুডোরে—
বলে আরো শুনি হিয়া ভরে
তাই শুনিই বঁধু নিশিদিনি
রাখ সখা রাখ বুকে করি।

পটপরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর দরবার কক্ষ। সময় প্রভাত; সম্রাট ফরাকসিয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট চিনকালিচ খাঁ হোসেনআলী খাঁ ও আবদুল্লা খাঁ দণ্ডায়মান।

হোসেন। (হস্তে একখণ্ড কাগজ) সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে কোন কোন স্থানে একটু কঠোর হতে হয় খাঁ সাহেব!

চিনকালিচ। তা স্বীকার করি, হোসেন! কিন্তু যে ক্ষেত্রে যতটা দরকার ঠিক ততটা, তার বেশী নয়। যেখানে আজীবন কারাগারে বন্দী করে রাখলেই চলে, সেখানে বধ করবার আদেশ কেবল নৃশংসতার পরিচয় দেয়।

হোসেন। খাঁ সাহেবের বয়স হয়েছে কিনা তাই হৃদয়টা কোমল হয়ে পড়েছে। যতক্ষণ অবধি একটা কাঁটাও মাথা উঁচু করে থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অবসর পেলে সে পায়ে ফুটে বসতে কসুর করবে না।

চিনকালিচ। হাঁ অবসর পেলে সে আকার করতে পারে বটে; কিন্তু সে অবসর আসবার সম্ভাবনা যদি জীবনে একেবারে লোপ হয়ে যায়, তবে—

হোসেন। অবসরকে না আসতে দেওয়া বড় কঠিন কাজ, কিন্তু কাঁটাটা তুলে ফেলা তত কঠিন নয়।

(সম্রাটের স্বাক্ষরের জন্য হোসেনকে আবদুল্লা ইঙ্গিত করিল)

(হোসেন নিকটবর্ত্তী হইয়া) সম্রাট স্বাক্ষর করুন।

সিয়ার। দিন (এই বলিয়া বামহস্তে কাগজখানা লইয়া স্বাক্ষর করিতে উদ্যত।)

চিনকালিচ। সম্রাট! স্বাক্ষর করবার পূর্ব্বে একবার ভেবে দেখুন, এর কি কোনও প্রয়োজন আছে, কি নেই।

আবদুল্লা বাধা দেবেন না, খাঁ সাহেব! এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

হোসেন। জাহাঁপনা স্বাক্ষর করুন।

সিয়ার। (স্বাক্ষর করিতে করিতে) পিতার মৃত্যুর জন্য এই প্রতিশোধ। এই নিন্।

(হোসেনের হস্তে প্রদান)

চিনকালিচ। হায়! জাহান্দার জাহানের খেলাও শেষ হয়ে গেল। সম্রাট বাহাদুর-শার পুত্রদের শেষে এই পরিণাম;—উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনটী পরস্পর সংঘর্ষে আকাশচ্যুত হয়ে আঁধারের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। হোসেন! মনে কিছু করো না। সত্যই হৃদয়টা আমার একটু কোমল; এত দিন একই সঙ্গে ছিলুম, তাদের কোন দোষ থাকলেও আজ আর সে কথা ভাবতে পারছি না। তাই গলাটা কেমন ধরে আসছে, চোখের জল পড়ো পড়ো।

হোসেন। না খাঁ সাহেব! এ স্বাভাবিক।

সিয়ার। আর কোনও কাজ আছে, সেনাপতি?

হোসেন। হাঁ জাহাপনা! মহারাজ অজিতসিংহ গত যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—কিন্তু যে কোন কারণেই গেক তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নি। রাজপুতজাত টা কিছু দিন হল দিল্লীর বাদশাদের বিপক্ষতাচরণ করে আসছে। এদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। হিন্দুদের উপর যে মুণ্ডকর আওরঙ্গজেব বাদশা স্থাপন করে যান বাহাদুর বাদশা তাকে রহিত করেন। এবার রাজপুতনার হিন্দুদের উপর এ কর পুনঃস্থাপিত হবে। কি বলো, আবদুল্লা?

আবদুল্লা। সে ঠিক কথা। তার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ অজিতসিংহকে এ আদেশ পাঠান হোক, কেন তিনি মিথ্যা স্তোক বাক্যে আমাদের আশা দিয়েছিলেন? তাকে নিজে এসে এর কারণ জানাতে হবে।

সিয়ার। বেশ তাই হোক,—কোন পরোয়াণায় স্বাক্ষর করতে হবে?

হোসেন। না খোদাবন্দ, এ পরোয়াণায় স্বাক্ষর আমিই করব। তারপর,—দাক্ষিণাত্যের শাসন ভার চিনকালিচ খাঁর উপর অর্পিত হোক। খাঁ সাহেব! এ আপনার কৃত উপকারের পুরস্কার।

সিয়ার। ভাল কথা, আজ হতে চিনকালিচ খাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার।

চিনকালিচ। বন্দেগী খোদাবন্দ।

আবদুল্লা। খাঁ সাহেব মনে রাখবেন যেন নেমকহারামী না হয়।

সিয়ার। এখন তবে উঠি, সেনাপতি।

হোসেন। আপনার মরজী।

(সিয়ারের প্রস্থান।)

আবদুল্লা। বিলাসের অঙ্কে প্রতিপালিত যৌবন লীলায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত নবীন সম্রাটের পক্ষে রাজকার্য্য সম্পাদন একটুও সুখের নয়। আসি খাঁ সাহেব।

(অবদুল্লার প্রস্থান)

চিনকালিচ। হোসেন! ভুল করলে, সুপ্ত সিংহের গায় হস্তক্ষেপ করতে কখনো যেয়ো না। রাজপুত শক্তি এখন বড়ই প্রবল, মুহূর্ত্তে এই মোগল সাম্রাজ্যটাকে ধূলিতে পরিণত করবে। মারবার রাজ অজিতসিংহ বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞ ও প্রকাণ্ড যোদ্ধা, সমস্ত রাজপুত

জাতিকে সংহত করে' এমন একটা প্রবল ঝটিকার সৃষ্টি করবে যার আঘাতে সাম্রাজ্যের মূলদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়ে উঠ্‌বে। সে ধাক্কা সামলানো বড় সহজ হবে না, হোসেন।

হোসেন। খাঁ সাহেব! সাম্রাজ্যের তরী ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরে চালাবার উপযুক্ত নাবিক থাকলে—আর কোনই ভয়ের কারণ থাকে না। আপনি ভীত হচ্চেন কেন? মোগল-সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়েছে, এ বিশ্বাস দূর করবার জন্যই আমাদের কতকগুলি যুদ্ধের সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে। আমি তাই আজ বিরোধকে জাগাতে যাচ্ছি।

চিনকালিচ। জানি না, হোসেন! এর পরিণাম কি। তবে প্রার্থনা এই যে এ বিরোধের অগ্নিতে যেন মহাত্মা বাবরের সাম্রাজ্যটা পুড়ে ভস্ম হয়ে না যায়। গড়া জিনিষটা ভাঙ্গতে দেখ্‌লে বড়ই কষ্ট হয়, হোসেন! সূর্য্য যখন ডুবে যায় নিজের বুকের রক্তের উৎস ধারায়—সমস্ত আকাশটাকে আপ্লুত করে' সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মান্তিক।

হোসেন। লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে খাঁ সাহেব। যদি এতে মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংশই হয় তবু এ গৌরবটুকু অন্ততঃ আমরা দাবী করতে পারব যে নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখাকে উজ্জ্বল করে তুলতে আমরাই চেষ্টা করেছিলাম। সেলাম খাঁ সাহেব! হৃদয় দৃঢ় করুন।

(হোসেনের প্রস্থান)

চিনকালিচ। হোসেন, তুমি ভাঙ্গবে আর আমি গড়ব। কার কৃতীত্ব কত?

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর রাজ প্রাসাদ, বেগম মহলের অভ্যন্তরস্থ উদ্যান।

সময়—অপরাহ্ন উদ্যানস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট লয়লা ফরাকসিয়ারের সঙ্গে দর্শন প্রতীক্ষায়।

লয়লা। আমি কেন আসলুম? যদি সিয়ার এসে জিজ্ঞাসা করে "লয়লা! তুমি কেন এসেছ?" তখন কি উত্তর দেবো? সে কি আগেকার মত প্রেমের বিভোল সুরে আর

আমার লয়লা বলে ডাকবে? মিছে আশা! সংসার একটা বড় রকমের ধাঁধা; যতই ভাবি সা যেন গোলমাল হয়ে যায়। এ সংসারে শতবার দেখার পরেও তুদিনের অসাক্ষাতে মানুষ তার এক সময়কার প্রাণের চেয়ে প্রিয়জনকে ভুলে যায় আবার কিনা কখনও চার চোখের চকিত মিলনে চিরজীবনের জন্য তুজনাই তুজনের হয়ে পড়ে—এ ধাঁধার উত্তর কে দেবে? (একটু থামিয়া) এত দেরী হচ্চে কেন? সে ত আসছে না! আজ দেখা পাবার আশার ভিখারী হয়ে এসেছি। এত উতলা হলে চলবে কেন? যেখানে না চাইতে একটা মহান বীর-হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমার হতে পারত তাকে নিরাশার চির আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে আজ শূন্য ঝুলি নিয়ে ভিক্ষায় নেমেছি।—ঐ যে আসচে, যদি ভুলে গিয়ে থাকে—কেন এসেছি প্রশ্ন করে? এ কি করলুম? ও কে ছুটে এসে লতার মত হাত তুখানি দিয়ে সিয়ারের কণ্ঠে বাহুর হার পড়িয়ে দিল।

(সিয়ার ও জুলেখার প্রবেশ)

জুলেখা। কি গো তুমি কি চাইছ?

সিয়ার। থামো জুলি, সব জায়গাতেই কি আর ছেলেমানুষী করতে হয়? কি লয়লা! কেন এসেছ? তুমি বোধ হয় খাঁ সাহেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছ?

লয়লা। হাঁ, শুনিছি সম্রাটেরই আদেশে দাদামশায় দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছেন। আমি তাঁরই সঙ্গে যাব কিন্তু কবে এখনও ঠিক হয় নেই।

জুলেখা। কি আমি ছেলে মানুষ! (একটু রাগতঃ স্বরে) দাঁড়াও আমি আসছি, তোমায় একটা শাস্তি দেবই দেব।

(জুলেখার প্রস্থান)

সিয়ার। দেখেছ লয়লা! দক্ষিণ বাতাসের মত চঞ্চল, পার্ব্বত্য নির্ঝরণীর মত কেমন দ্রুত আর প্রভাতের শিশিরের মত কেমন স্বচ্ছ। (জুলেখাকে দেখিতে পাইয়া) শোন জুলি!

(জুলেখার প্রবেশ)

জুলেখা। (ক্রোধের ভান করিয়া) সাবধান সিয়ার! তুমি দিল্লীর সম্রাজ্ঞীকে অপমান করেছ। শাস্তি তোমায় পেতেই হবে।

সিয়ার। কি শাস্তি তুমি আমায় দেবে? অনেক বার তোমার কাছ থেকে ও শাস্তি আমি পেয়েছি কিন্তু সে ত কঠোর নয়, ফুলের মত কোমল।

জুলেখা। কি শাস্তি দেখ্‌তেই পাবে?

(জুলেখার প্রস্থান)

লয়লা। দিল্লীর সম্রাজ্ঞীর শাস্তি যত কোমল, দিল্লীর সম্রাটের বিচার ততোধিক নির্ম্মম, ততোধিক কঠোর—প্রাণ ভেঙ্গে দিয়ে যায়, হৃদয়ের কামনার ফুলগুলি উপেক্ষার দুরন্ত উত্তপ্ত নিশ্বাসে শুষ্ক করে ফেলে। সিয়ার......না, ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো—সম্রাট্।

সিয়ার। লয়লা! ভুলে যাও ওসব কথা, সে শৈশবের খেলা। সত্য মিথ্যা কিছুই তাতে নেই।

লয়লা। হাঁ সম্রাট! সে শুধু খেলা! কিন্তু আমার হৃদয়ের ব্যাথাটা জাগিয়ে রাখা কি ভুলে যাওয়া সে একান্ত আমারি, তোমার উপদেশ না হলেও চলবে।

সিয়ার। সে খুবই সত্য—তুমি পুরাতন কথাগুলি ভুলেছিলে, তাই বলেছিলুম।

লয়লা। আমি তোমার কাছে প্রেমের অভিসারিকা হয়ে আসি নি—ভোলা কথার স্মৃতিটাকে জাগিয়ে তুলে হৃদয়ে আবার নুতন সুরের সৃষ্টি করতে আসি নি। যে, মন্দিরে প্রেমের দীপখানি জ্বেলে পূজা করতে বসে, চলে গিয়েছিল সে অসমাপ্ত পূজাও যেচে নিতে আসি নি। এত ভিখারী তুমি আমায় ভেবো না সম্রাট! প্রেমের উপযাচিকা আমি হব? স্বর্গের মত অক্ষয়, সাগরের মত অসীম, আকাশের মত গভীর জগতে অতুল প্রেম আমার দ্বারে এসে হাত পেতে ফিরে গেছে—আমি কণিকার বিনিময়ে তাকে পেতে পারতাম—যাক্ সে কথা। সম্রাট! আমার একটা প্রার্থনা আছে।

সিয়ার। কি প্রার্থনা বলো। দেখি তোমার এ প্রার্থনাটা মঞ্জুর করতে পারি কি না।

লয়লা। জাহানকে মুক্ত করে দিতে হবে।

সিয়ার। জানানের মুক্তি? বেশ। কে আছ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। বন্দেগী জাঁহাপনা।

সিয়ার। সেনাপতি হোসেন আলি খাঁকে খবর পাঠাবে যে অবিলম্বে জাহানকে, যেন মুক্ত করে দেওয়া হয়।

প্রহরী। যো হুকুম খোদাবন্দ।

(প্রহরী প্রস্থানোদ্যত)

সিয়ার। প্রহরী দাঁড়াও। জাহানকে কেন বন্দী করবার আদেশ দিয়েছি? তাকে শুধু বন্দী করতে নয়, তার প্রাণদণ্ডের আদেশও হয়ে গেছে। ওঃ পিতার মৃত্যুর প্রতিহিংসার জন্য। লয়লা! আমি দুঃখিত তোমার এ প্রার্থনাটাও আমি পূর্ণ করতে পারলুম না। যাও প্রহরী—ও আদেশ প্রত্যাহার করলুম।

(জুলেখা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে প্রবেশ করিল ও তড়িৎ পদক্ষেপে
সিয়ারের কণ্ঠে মালাদান করিল)

জুলেখা। কেমন শাস্তি দিয়েচি, হোল ত। (লয়লার দিকে চক্ষু পড়িতেই) তুমি যে কাঁদচ (লয়লার কাছে যাইয়া) বুঝি ঐ দুষ্ট সিয়ার তোমায় কাঁদিয়েছে। ঐ যে আমি ঢুকতেই তোমায় বলছিল "তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করতে পারলুম না। কি প্রার্থনা তোমার, আমায় বলো।

লয়লা। যদি সম্রাটের কাছেই মুখ ফুটে জানাতে পেরেছি তবে তোমারও জানাতে পারব। আমার প্রার্থনা জাহানকে মুক্ত করে দিতে হবে। সম্রাজ্ঞী!

জুলেখা। জাহান তোমার কে? (লয়লাকে নিরুত্তর দেখিয়া) তাকে তুমি ভালবাস বুঝি? সিয়ার! এ প্রার্থনা তোমাকে মঞ্জুর করতেই হবে।

সিয়ার! না, জুলি! এ বিষয় নিয়ে তুমি আর আমায় অনুরোধ করো না। এসো যাই।

জুলেখা। (লয়লার নিকট যাইয়া দুঃখিত স্বরে) পারলুম না, ক্ষমা করো—তোমার ভালবাসার জনকে মুক্ত করে দিতে পারলুম না।

(জুলেখা ও ফরাকসিয়ারের প্রস্থান)

লয়লা। স্বগতঃ—এত উপেক্ষা, এত অপমান!—সিয়ার ভেবেছ নারীর চিত্ত ফুলের মত কোমল, তার ঐ উপেক্ষার তাপে শুষ্ক হয়ে মুষড়ে যাবে। মনে রেখো—সুশীতল জলভরা

মেঘেও বিশ্বদাহনকারী বজ্র থাকে, কুসুমেও কণ্টক থাকে তাহানকে আমি মুক্ত করবই করব। তারপর দেখব কেন তোমার এত দর্প, এত নিষ্ঠুর তুমি !

(বেগে প্রস্থান)

(পটনিক্ষেপ)

ক্রমশঃ—

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।
ও
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শরতের গান।

—:*:—

কে আজ ডাক দিয়েছে প্রাণের মাঝে
মন লাগে না ঘরের কাজে !

প্রাণ জুড়ান কাহার হাসি
দূর গগণে বাজায় বাঁশী
শ্বেত জলদের ফাঁকে ফাঁকে
নীল চাহনির সরম লাজে
ও সে ডাক দিয়েছে প্রাণের মাঝে !

কচি পাতার সবুজ সাড়া
মৌমাছির ঐ গুঞ্জরণে
রবির সোহাগ কিরণ তাপে
কাঁপ্‌ছে মরি বনে বনে।

বুকের মাঝে কোথায় কেন
ব্যথার মত লাগ্‌ছে যেন
যতন ঘেরা এ ফুল বনেও
পাষাণ হয়ে কঠিন বাজে !
ও সে ডাক দিয়েছে প্রাণের মাঝে !

পতিত জার্ম্মেণীর শিক্ষা সংস্কার।

(২) শ্রমিক দিগের শিক্ষা।

ভাবের পরিবর্ত্তন।—য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ জানা যায় যে, যখনই এখানে কোন প্রকার বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে,—সে বিপ্লব রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, অথবা অর্থ-নৈতিক যেরূপই হোক না কেন,—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার পাঠাগারের একটী ছবিতে, যখন জার্ম্মেণ ফরাসীতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, তখন জেনার এই সমর ক্ষেত্রের অদূরেই হেগেল্ তাঁহার একটী কঠিন পুস্তকের রচনায় ব্যপৃত। এই ছবিটী আমাকে উপরের সত্যটী বিশেষ ভাবে মনে করাইয়া দেয়। ফ্রান্সের নিকট জার্ম্মেণীর এই অপমানের পরই এই যুগের ফিক্‌টে ও হেগেলের চিন্তা ধারাই জার্ম্মেণীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন আকার প্রদান করে। ইহারই ফলে ফ্রান্স্ একবার জার্ম্মেণীর পদচুম্বন করিতে বাধ্য হয়, এবং ইহার ফলে গত য়ুরোপীয় মহা সমরে জার্ম্মেণী নিজের দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় দিয়াও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একরূপ সমবেত শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে। জার্ম্মেণীর যুদ্ধের পূর্ব্বের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও, এই যুদ্ধের ফলেই বর্ত্তমান সময়ে এই শিক্ষার প্রায় সকল স্তরই নূতন জীবন ও নূতন সংস্কার চেষ্টাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে।

আদ্য ও মধ্য শিক্ষার ছোট ছোট পরিবর্ত্তনগুলি আপাত দৃষ্টিতে অনেকটা বাহ্য পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যথার্থ ভাবে সেগুলিও যে জীবনকে পূর্ণতর ও বৃহত্তর করিবার নূতন প্রয়াস তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মেণীর শিক্ষার কোন স্তরেই জ্ঞানার্জ্জন ও সঙ্কীর্ণ স্বদেশানুরাগ শিক্ষার একমাত্র আদর্শ নয়। পরিবার, গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্র,—প্রত্যেকেই যে এক একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, এবং প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকা ও যে এরূপ এক একটী ছোট খাট পরিপূর্ণ জগৎ,—এই সত্য মনে রাখিয়া শিক্ষাদ্বারা মানবীয় হৃদ্যতার এবং বিশ্ব মানবীয় প্রতিবেশিক ভাবের পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণই জার্ম্মেণীর সকল প্রকার শিক্ষার নূতন আদর্শ। পতিত জার্ম্মেণীর শ্রমিকদিগের শিক্ষার নূতন ব্যবস্থার আলোচনায় এই ভাবের পরিবর্ত্তন আরো বিশদ হইবে।

নূতন শিক্ষক।—সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে কেবল সামাজিক সাম্যবাদী প্রজাতান্ত্রিক দলের রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় নেতারাই যে শিক্ষার এই নব ভাবের উদ্বোধন করিতেছেন,—এরূপ নয়। দেশের শিক্ষকগণ, কারখানার মালিকগণ, শিক্ষা উপনিবেশের কর্ম্মিগণ, স্থানীয় শাসনপরিচালকগণ, এবং বিশেষ ভাবে দেশ বিস্তৃত শ্রমিক-সংঘগুলি শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রচলনের দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়াছেন। পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিরূপে শিক্ষকদের স্বাধীনতা ছিল খুব সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই শিক্ষক, অধ্যাপক, ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম্মযাজকগণই অবসর সময়ে শ্রমিকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। দেশের লোকে এই ধর্ম্ম যাজক দিগকে সম্প্রদায় হিসাবে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেও, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং প্রাচীন মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া দেশের নূতন সামাজিক রাষ্ট্রীক সাম্য বাদের উপাসকরূপে দেশের লোকের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারাই দেশব্যাপী সার্ব্বজনীন শিক্ষার সহায়। জার্ম্মেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায় সর্ব্বত্রই এখন ও এই নূতন ভাব বরণ করিয়া লইতে সমর্থ হয় নাই। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের মধ্যে যুদ্ধ প্রত্যাগত সামরিক কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বড় কম নয়। দুই একটী বিশ্ববিদ্যালয় এই জন্যই প্রাচীন সামরিক ভাবের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু এখানেও প্রাচীনের সহিত নবীনের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে, এবং অনেক স্থলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের

নূতন ও পুরাতন অধ্যাপকদের মধ্যে কেহ কেহ এখনই সর্ব্বান্তঃকরণে নবভাবের আচার্য্যের স্থান গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক লাভ হওয়াতেই এখানে শ্রমিকদিগের উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষার অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। শ্রমজীবীদের সহিত বুদ্ধিজীবীদের এই অতি ঘনিষ্ঠ সংযোগ জার্ম্মেণীর শ্রমিক আন্দোলনের (Labour Movement) একটী অন্যাত্র-দুর্লভ বিশেষত্ব।

বালকদের শিক্ষা।—যে শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া জার্ম্মেণীতে শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, সেই গ্রুণ্ডস্কুলেন্ বা আদ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা পূর্ব্বেই সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। দেশীয় সার্ব্বজনীন শিক্ষার একটী বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে শ্রমিকদের শিক্ষার নূতন ভাব ও নূতন প্রেরণা বিশেষভাবে বোধগম্য হইবে। ফ্রাঙ্কফুর্টের (Frankfurt) কএক মাইল দূরে ভেগ্সাইডের (Wegscheide) বন্য প্রদেশের মধ্যে যুদ্ধের সময় একটী সেনানিবাস স্থাপিত হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের অধিবাসীরা নিজেদের অর্থে এই সেনানিবাসটী ক্রয় করিয়া, ইহাকে একটী শিবির বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছে। এখানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীই নিজ নিজ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বৎসরে একমাস কাল অবস্থান করে। সকল ছাত্রছাত্রীকেই বেতন দিতে হয়; কিন্তু বেতনের হার খুব অল্প,—সমস্ত খরচের পঞ্চমাংশ। অবশিষ্ট খরচ চাঁদা ইত্যাদি নানা উপায়ে সংগৃহীত হয়। শিবিরনিবাসটীর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন প্রায় সমস্ত কর্ম্মই এই এক মাসের জন্য বালকবালিকারা নিজেরাই সম্পন্ন করে। শিবিরের বিভিন্ন কুটীরে তাহারা এক একটী পরিবারের ন্যায় বাস করে। বসবাস, সামাজিক অবস্থা, ও পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন প্রকার পার্থক্যই এখানে সংগৃহীত হয় না। কিন্তু এইরূপে সংঅবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিলেও, বালকবালিকারা এখানকার দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করিয়া তোলার যথেষ্ট অবসর পায়। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই প্রত্যেক কুটীরের বাহিরের দেওয়ালে দরজার চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার রঙদার বঙ্গচিত্র আঁকিয়া, নানা ভাবের নীতি কথা লিখিয়া, এবং অন্য নানা উপায়ে নিজেদের কুটীর সুন্দরভাবে সজ্জিত করে। এই সাজ সজ্জা সম্বন্ধে প্রত্যেক কুটীরের এক একটী নিজস্ব বিশেষত্ব থাকে। সমগ্র শিবিরনিবাস এবং ইহার

অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কুটীরের শাসন ব্যবস্থার ভারও অনেকটা ছাত্রছাত্রীদের উপর ন্যস্ত থাকে। শিক্ষা বিষয়েও তাহারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পায়। কেতাবী শিক্ষা অপেক্ষা নানা প্রকার কর্ম্মের ভিতর দিয়া বস্তুগত ও ব্যক্তিগত শিক্ষার আদরই এখানে খুব বেশী; এবং দেশের প্রচলিত গান, প্রচলিত নৃত্য, এবং প্রচলিত নানা প্রকার সমবেত ক্রীড়াও ছাত্রছাত্রীর ভিতর বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে মুক্ত প্রকৃতির সাহচর্য্য। সামাজিকতা বর্দ্ধন, এবং স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনই এই শিবির বিদ্যালয়টীর শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু ফ্রাঙ্কফুর্ট নয়,—জার্ম্মেণীর নানা স্থানে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই জার্ম্মেণীর শ্রমিকদের উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ভিত্তি বলা যাইতে পারে।

কিশোরদিগের শিক্ষা। পাশ্চাত্যের সম্প্রসারিত বিদ্যালয়গুলি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকারান্তরে কিশোর বয়স্ক শ্রমিকদের শিক্ষাশালা। জার্ম্মেণীতে সকল স্থানেই এই সম্প্রসারিত বিদ্যালয়গুলির সহিত কলকারখানা ও পণ্য শিল্পশালার কর্ম্মের ঘনিষ্ট যোগ থাকে। কারখানা ও শিল্পাগারে শ্রমিকেরা প্রতিদিন আট ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করে না। ইহাই দেশের নিয়ম। দেশীয় শ্রমিক সংঘগুলির চেষ্টায় শ্রমিকেরা সর্ব্বত্রই ক্রমাগত চার বৎসরের জন্য স্থানীয় সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন আট ঘণ্টার শিক্ষা লাভ করে। এরূপ শিক্ষার সময়েও তাহারা নিজ নিজ নির্দ্ধারিত বেতন হইতে বঞ্চিত হয় না। কারখানার মালিকের এই সম্প্রসারিত শিক্ষার কালেও শ্রমিকদিগকে বেতন দিতে বাধ্য হন।

জার্ম্মেণীর বিভিন্ন মিত্ররাজ্য ও স্থানীয় জনসমাজের সহিত কলকারখানা ও পণ্যশিল্পাগারের মালিকেরা এরূপ শিক্ষার আংশিক ব্যয় ভার বহন করেন। স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও বার্ত্তিক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক স্থানে নানা প্রকার সম্প্রসারিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল শিক্ষাশালায় শ্রমিকেরা নিজ নিজ অবলম্বিত বৃত্তির তত্ত্বের দিকটা আলোচনা ও আয়ত্ত করে, এবং মালিকদিগকে নিজ নিজ কারখানায় এই সকল বৃত্তি ও শিল্প সম্বন্ধে শ্রমিকদের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ব্যবহারিক শিক্ষা বিষয়েও স্থানীয় শ্রমিক সংঘ মালিকদের কর্ত্তব্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু পণ্য-শিল্প-উৎপাদন-বিষয়ক বৃত্তি

শক্ষাই শ্রমিকদের শিক্ষার একমাত্র আদর্শ নয়। সৎসাহিত্যের অনুশীলন এবং পৌরজনিক ও প্রতিবেশীকভাবের উন্নত সাধনই জার্ম্মেণীর সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিশেষত্ব; বৃত্তি ও বার্ত্তিক শিক্ষার কারু কর্ম্মের উপযোগী দক্ষতা এবং পৃথক পৃথক বৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষভাবে চর্চ্চিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বৃত্তি সম্বন্ধে শ্রমিকদের রুচি ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে,—সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহাতে তাহাদের শক্তি বর্দ্ধিত হয়,—তাহার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ইহা হইতেই বেশ বুঝাইবে যে সর্ব্ব প্রকার সামাজিক ও মানসিক উৎকর্ষ মূলক শিক্ষাই জার্ম্মেণীর সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষার নূতন আদর্শ।

বয়স্কদিগের শিক্ষা। সম্প্রসারিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হয় বলিয়া বিদ্যালয়গুলি উক্ত নামে অভিহিত হয়। এখানকার শিক্ষা সাধারণত বয়স্কদিগের শিক্ষা নয়। বয়স্ক শ্রমিকদিগের শিক্ষার জন্য জার্ম্মেণীতে নূতন একপ্রকার শিক্ষা-শালা স্থাপিত হইতেছে। বিদ্যালয়গুলির নাম ফোক্‌হোশুলেন (Volkohochschulen.) দেশের ছোট বড় নানা স্থানে এরূপ অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিচালন বিষয়ে ইহাদিগকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা হয় নাই। বিদ্যালয়গুলি সর্ব্বত্রই বেসরকারী চেষ্টার ফল। জার্ম্মেণীর বিভিন্ন মিত্র রাজ্য, স্থানীয় শাসন সংঘ, এবং নানা স্থানের শ্রমিক সংঘ দেশের সাধারণ লোকদিগের সহিত একযোগে বিদ্যালয়গুলির ব্যয় ভার বহন করেন। স্থল বিশেষে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমিক সংঘ, স্থানীয় জন সমাজ ইত্যাদির সাহচর্য্যে অনেকটা স্বাধীন ও পৃথক ব্যবস্থা দ্বারা এরূপ শিক্ষার পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোথাও ত্রিশজন অথবা তাহারা কম থাকে; আবার কোথাও এই সংখ্যা একশতেরও অধিক হইতে দেখা যায়। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থাও নানা প্রকার। সময় সময় কোন কোন ফোক্‌সোকুলনে দুইটী বিভাগ থাকে;—প্রাবেশিক বিভাগে প্রাথমিক লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষাও প্রয়োজন হয়, এবং উচ্চতর বিভাগে এমন কি দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা গুরুতর বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে সম্প্রদায় হিসাবে যাজকদিগের সম্বন্ধে জার্ম্মেণীর জন সাধারণের যে অনেকটা অবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান তাহা পূর্ব্বেই

উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণেই বয়স্কদের শিক্ষাতেও ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। কিন্তু ইতিহাস, দর্শন, নীতিবিদ্যা ও ধর্ম্মতত্বের দিক দিয়া বাইবেলের আলোচনায় কোন প্রকার আপত্তি থাকে না। ক্ষেত্র বিশেষে ক্রীড়া, ব্যায়াম, সঙ্গীত প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত বিষয়গুলিও উপেক্ষিত হয় না।

বয়স্ক শ্রমিকদিগের শিক্ষা অনেকটা অবসর সময়ের শিক্ষা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কলকারখানাও পণ্য শিল্পশালায় দৈনিক আট ঘণ্টার পরিশ্রমই দেশের নিয়ম। এই জন্য শ্রমিকদের শিক্ষার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্যও শিক্ষার আয়োজন হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের সর্ব্বপ্রধান বয়স্ক-বিদ্যালয়টী এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। এখানে ক্রমাগত এক বৎসরের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এবং যাঁহারা শ্রমিকদিগকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য এখানে পাঠান, তাঁহারাই এই এক বৎসরের জন্য বিবাহিত শিক্ষার্থী শ্রমিকদিগের পারিবারিক ব্যয় ভার পর্য্যন্ত বহন করেন। থুরিঞ্জিয়া (Thuringia), শ্লেস্‌হ্বিগ্ হোল্‌ষ্টাইন্ (Schleswig Holotein) ও হ্বুর্টেম্বের্গে (Wartemberg) ছাত্র-শিক্ষকের বসবাস সম্বলিত বিদ্যালয়ে অনেকটা এইরূপ শিক্ষারই বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল স্থানে শিক্ষার কাল সাধারণতঃ ছই মাস, এবং বিষয়ও অনেক সংক্ষিপ্ত।

বয়স্ক শ্রমিকদের উন্নতির জন্য জার্ম্মেণীতে আরো নানা প্রকার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাট্যশালা স্থাপনের আন্দোলন (Little Theatre Movement), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান নির্ম্মাণে আন্দোলন (Little Garden Movement), এবং যুবকদিগের আন্দোলন (Youth Movement), এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। শিক্ষার উন্নতি এই আন্দোলনগুলির পরোক্ষ উদ্দেশ্য। সেই কারণে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। প্রথমটীর দ্বারা শ্রমিকেরা খুব অল্প ব্যয়ে নানা প্রকার অভিনয় দর্শন করে, দ্বিতীয়টীর দ্বারা তাহারা নগরের উন্মুক্ত উপান্ত-প্রদেশের ছোট ছোট উদ্যানে নাগরিক জীবনের গতানুগতিক, কলকারখানার যান্ত্রিক আবহাওয়ার সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে কিছু কালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রকৃতির ফুল, ফল, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদির ভিতর সপরিবারে জীবন যাপন করে, এবং তৃতীয়টীর দ্বারা বালকবালিকাদের শিবির বিদ্যালয়ের অনুরূপ ব্যবস্থার

মধ্যে তাহারা মুক্ত প্রকৃতি সাহচর্য্যের সুযোগ পায়। এই সকল অনুষ্ঠানের ফলাফল চিন্তা করিয়া দেখিলে, জার্ম্মেণীর বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কার যে জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক আধ্যাত্মিক ভাবের সংস্কার তাহা বোধ হয় সহজেই অনুমান হইবে।

বয়স্কদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একটী প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং বীচক্রফ্‌ট (Beechcroft), লেচ্‌ওয়ার্থ (Letch worth) ও কোক্‌হাউসের (Kock house) মত মাত্র কয়েকটী স্থানে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। অর্থাভাববশতঃ এখানেও বয়স্ক বিদ্যালয় আন্দোলন (Adult school movement) নানা বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। বয়স্ক শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্দ্দেশে (Extramural) নানা প্রকার শিক্ষার আয়োজন করিতেছে। আমেরিকাতেও এইরূপ নানা প্রকার শিক্ষার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু জার্ম্মেণীতে বয়স্কদিগের শিক্ষার জন্য কোন প্রকার প্রকাশ্য আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরাজয়ের ফলে নিজেদের অভাব ও অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি অনেকটা অন্তর্মুখীন হওয়াই স্বাভাবিক। জার্ম্মেণী ধীরভাবে অথচ নিঃশব্দে দেশের বয়স্ক শ্রমিকদিগের উচ্চতর শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিতেছে,—তাহা পতিত জার্ম্মেণ জাতির এই অভ্যন্তরীণ অভাব বোধ হইতেই উৎপন্ন। এই কারণেই বয়স্কদের শিক্ষার দেশব্যাপী অনুষ্ঠান অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনেকটা আধ্যাত্মিক; এবং সেই জন্যই অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ সুফল প্রদান করিতেছে। দেশবাসীর লৌকিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক এবং অন্তর্জগতিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষই ইহাদের মৌলিক শিক্ষাদর্শ, এবং এই কারণেই সমগ্র দেশটী একত্র হইয়া অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বয়স্ক শ্রমিকদের উচ্চ ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষাকালে তাহাদের সাংসারিক সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উন্নতিই এরূপ চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য নয়। তাহাদের এরূপ শিক্ষা জাতীয় সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের অনুকূল হইবে মনে করিয়াই, এই পতিত অবস্থাতেও জার্ম্মেণী এরূপ প্রভূত ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এবং যাহারা শিক্ষা পাইতেছে তাহারাও যে এই জাতীয় আদর্শ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে,—এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। পুনরুক্তি দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাই আবার বলি,—জার্ম্মেণীর শিক্ষার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই জাতীয় আধ্যাত্ম ভাবের পরিবর্ত্তন। দুঃস্থ অবস্থায় দরিদ্রতার মধ্যেও কেবল

এই ভাবের পরিবর্ত্তনই যে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে,—জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান শিক্ষা সংস্কার ইহার একটী অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

অন্ততঃ শিক্ষা সম্বন্ধে ভগবানের আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের দেশেও কি এই ভাবের পরিবর্ত্তন আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে না? *

শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়।

কবি নজরুল ইসলাম।

-:০:

হে রুদ্র বিদ্রোহী কবি! ধূমকেতু রথের সারথি!
আজি তব ধন্য পূজারতি!
দীনহীনা ক্ষুধাতুরা হেরিয়া জননী
ব্যাকুলিয়া উঠেছিল তব বক্ষখানি,
তাই তুমি পায়ে দলি' শত অত্যাচার
নিবারিতে জননীর চিরদুঃখ ভার
লভি কারাগার
নীরবে সহিয়া কত, আছো তুমি জাগি'
নিপীড়িতা জননীর লাগি।

* Educational Ideals in Germany এবং Education in Germany—The Times Educational supplement—September 24, 1921.

হে কবি! যে সুর তুমি তুলি গেছ রুদ্র বীণা তারে
আজো তাহা বাজে বারে বারে
যে পথ দেখায়ে গেছ সব তুচ্ছ করি,
আজি সবে চলিয়াছে সেই পথ ধরি,
যে পতাকা বেঁধে গেছ মন্দিরের পরে—
আজো তাহা নির্ব্বিবাদে উড়ে বায়ু ভরে
উচ্চ নীলাম্বরে।
নহ তুমি বন্দী কবি! নহ পরাধীন
চিত্ত তব সতত স্বাধীন।

অন্ধকারে কারাগারে নিশিদিন হে কবি মহান!
দীপ্ত তব বিমথিত প্রাণ।
আপন অন্তরখানি করিয়া মন্থন
তুলিয়াছ কবিবর যে মহা রতন,
তাহারি পরশে আজি সবাকার প্রাণ
সোণা হয়ে গেছে শুধু—নহে ম্রিয়মান
আঁধার সমান।
হে পরশমণি তুমি—দেবের সাধনা—
জননীর আকুল কামনা।

ফিরিয়া আসিবে যবে—হেরি তব জননীর ছবি
মুগ্ধ হবে হে সমর কবি!
রক্তবাসে তনু ঢাকা—শুভ্র ভালে লিখা
উজ্জ্বল সিঁন্দুর বিন্দু জ্যোতির্ম্ময় টীকা,

আননে অমল দীপ্তি—মধুর হাসি
তোমারে বরিয়া লবে সগৌরবে আসি
কত ভালবাসি।
তোমারি শিখান গানে করিব বন্দনা—
গঙ্গাজলে গঙ্গারই অর্চ্চনা।

শ্রীরেণুকা দাসী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

রক্তাম্বরা

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধাঁধাঁ।

আমি আসনে প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা তরুণীর অপরূপ রূপশোভা দেখিতে লাগিলাম। তিনি আসমানীরং এর পাতলা বেনারসী পরিয়াছিলেন। অবগুণ্ঠনের বেষ্টনের মধ্যে তাঁর মুখের লজ্জারঞ্জিত গোলাপী আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। খানিক পরে তরুণী রাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "আমি হঠাৎ এসে পড়ে তোমাদের বিরক্ত করলাম। তোমার কাছে কেউ এসেছেন তা জানতাম না।" রাণী হাসিয়া বলিলেন "কিছু গোপনীয় কথা হচ্ছে না ত ভাই। এই এদিকে এস, পরিচয় করিয়ে দিই।" তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "আমার মামাত বোন সুন্দরা সেন—আর ইনি ডাক্তার কর।" আমার স্ত্রী আমাকে নমস্কার করিয়া বসিলেন। তাঁর মুখে কি সে সুন্দর হাসির আভাস। তারপর বলিলেন "ডাক্তার কর আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমায় নিশ্চয় ক্ষমা কোরবেন।" আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলাম "নিশ্চয়ই।"

রাণীর মামাত বোন বলিয়া আমার সঙ্গে এই তরুণীটির পরিচয় করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও আমি স্থির বুঝিয়াছিলাম যে ইনিই সেই মরণাহতা সুন্দরী এবং আট দিন আগে ইহাঁকেই আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। আমার নাম শুনিয়া তিনি ত একটুও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। সরল স্বাভাবিক ভাবে চাহিতে পারিলেন ত। তবে কি তিনি নিজের বিবাহের কথা জানেন না? আমি তাঁর চক্ষু দুটির দিকে ভাল করিয়া দেখিলাম সেই রাত্রে আমার স্ত্রীর বাম চক্ষুটি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল ইহার চক্ষে ত কিছু দোষ নাই। তিনি যখন রাণীর সহিত কথা বলিতেছিলেন তখন আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। যদি সত্যিই তাঁর নাম ফুল্লরা সেন তবে আদিত্যের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিবার কি দরকার ছিল? আমি ভাবিলাম সব কথা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তাঁর অসঙ্কোচ ব্যাবহারে বুঝিলাম তিনি আমায় যথার্থই চেনেন না, শেষে সন্দেহ হইল তিনি আমার স্ত্রী নহেন তাঁহারই মত দেখিতে আর কেহ।

তরুণী হাসিয়া বলিলেন "আজই আমরা ফিরে যাব দেশে, কিছু জিনিষ কেনবার কথা ছিল এখান থেকে, নীরদা সে সব ভুলে গিয়ে গল্প কোর্‌ছ।"

"এরকম ভুল হওয়া ভাল।"

রাণী বলিলেন "ডাক্তার বাবু কি আমায় ঠাট্টা কোরছেন?"

আমি। আমি আমার রোগীদের সঙ্গে ঠাট্টা করি না।"

রাণী। বন্ধুদের সঙ্গে করেন না?"

আমি। বন্ধুদের কথা আলাদা। আমিই তাদের ঠাট্টার জিনিষ।

দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন, তারপর ফুল্লরা বলিলেন "ওঃ! এখানে কি গরমই পড়েছে! এখন দেশে যেতে পারলে বাঁচি।"

আমি। "কোথায় যাবেন? জমিদারী যেখানে?"

ফুল্লরা। হাঁ আমরা জমিদারীতেই যাব, তারপর রাঁচির কাছে রাজা যতীন্দ্রনাথের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে। আপনি তাঁকে জানেন?

আ। না, কতদিন থাকবেন সেখানে?

ফু। "পনের দিন। তাদের সঙ্গে আমাদের খুব আত্মীয়তা আছে।

রাণী। সত্যি যদি বাজার কোরতে হয় ত বড় দেরী হোয়ে গেল। চল তা হলে গাড়ী জুততে বল একবার ঘুরে আসি।"

আমি উঠিলাম। আমার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না তবুও উঠিতে হইল।

রাণী বলিলেন "ডাক্তার বাবু আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে কি বলুন?"

আ। "প্রেসক্রপসন যা দিলাম ব্যবহার কোরবেন। ভাল হ'লে জানাবেন।"

ফুলরা বলিলেন "একদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে হরনাথ দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

রাণী। কিন্তু আমি যে ডাক্তার করকে ডেকে প্রেসক্রপসন লেখাচ্ছিলাম সে কথাটা তাঁকে জানতে দেওয়া হবে না।

আ। মেয়েরা খুব কথা লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে।

ফু। ছেলেরাও পারে। তারা ভাবে কিছু লুকোন থাক্‌লে জীবনে বুঝি রোমান্স হয়।

তাঁর কথার যেন বিশেষ কিছু অর্থ ছিল,—কিছু ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি শিশুর মত সরল ও পবিত্র প্রাণের দর্পণ স্বরূপ সেই তাঁর স্বচ্ছ নীলাভ চোখদুটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মন থেকে বোল্‌ছেন?"

ফু। কি জানি। হয় ত সবারি জীবনে কিছু কিছু লুকোবার প্রয়োজন আছে।

আমি "আবার দেখা হবে" বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। হায় আমার স্ত্রী আমায় চেনে না অথচ তাহাকে আমি রীতিমত রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ করিয়াছি। তাঁহার উপর দাবী করিব এমন কোন প্রমাণও আমার নাই। আমি ফিরিয়া আসিয়াছি এসংবাদ আদিত্যরা এতক্ষণে অবিশ্যি পাইয়াছে। এখন সমূহ বিপদের আশঙ্কা। যেমন করিয়া পারি সে বাড়ীটি আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী পৌঁছিয়া দেখি বিনোদ আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বিনোদ বলিল "কোথায় উধাও হোয়েছিলে হে!"

"সমুদ্রে!"

"বল কি! সমুদ্রে একেবারে? কি রকম করে?"

"উপরে চল বোলছি, বড় গোপনীয় কথা" তারপর উপরে গিয়া সব কথা বলিলাম। বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "এ রকম বিয়ে এই প্রথম, বিয়ে সত্যি হোয়েছিল ত ?"

"নয় ত কি ? রেজেষ্ট্রী করে আবার। তবু আমার স্ত্রী আমায় চিনতে পারলো না হে।"

"আদিত্য মহা তুখোড় লোক। চোখ ও'রকম হয়ে, রক্ষা হওয়া ত সহজ কথা নয়।"

"হাঁ বাঁ চোখের তারাটি বন্ধ হোয়ে গেছ্ল"

"আর আজ দেখ্লে দু চোখই ঠিক আছে ?"

"সম্পূর্ণ"

"কিন্তু ভাই ডাক্তারি মতে ত তা থাক্তে পারে না কোন রকমে যদি তোমার স্ত্রী বেঁচেও যান তাঁর চোখ কখনো সারবে না।"

"তাইত আশ্চর্য্য। আমার যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তিনি আমার সামনেই মারা যান। আমি বিনা দ্বিধায় তাঁর মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতাম কিন্তু তাঁরই সঙ্গে আজ কথা করে এলাম।"

"আমি তোমায় এর খোঁজ কোরতে যথাসাধ্য সাহায্য কোরব। আমার মনে হয় এতে আরও কিছু বিশেষ রহস্য আছে নইলে আর আদিত্য অত টাকা শুধু বিয়ের জন্য দেয় ? আর রাণীকেও আমার সন্দেহ হয়।"

"আমারো হয় ভাই। তাঁর কথা থেকেই ত ধরা পড়ে।"

"হাঁ তা—তবে"—খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বিনোদ বলিল "হয়ত তোমায় ভালবেসে থাকতেও পারেন।"

"তা কি হয় ? আমি কখনো ওঁকে দেখিনি আগে।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল "তুমি যে কার্ত্তিক বিশেষ! আরও ত অনেকে তোমায় দেখে মজেছে আগে।"

"তুমি যে প্রশংসার ঢেউ লাগিয়েছ দেখ্ছি। তা যদি সত্যি হয় তবে যখন তিনি জানতে পারবেন যে আমি তাঁর বোনের স্বামী তাঁর ঘুমঘোর বড় নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙ্গবে যে।"

"এক কাজ কর। রাণীর সঙ্গে ভাব কর। তাহলে স্ত্রীর খোঁজখবর রাখ্‌তে পারবে অনায়াসে।"

"তা পারবো না বিনোদ। ফুল্লরাও আমার মত হয় ত কষ্ট পাচ্ছে।"

"এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। তুমি যে ফুল্লরাকে ভালবেসে ফেলেছ।"

"আমি ভালবেসেছি শুধু নয়। সে নইলে আমার চল্‌বে না।"

"আমি ভাবতাম তুমি কথনো বিয়েই কোরবে না। তোমার বিয়ে ত নয় রহস্যের গোলকধাঁধা।"

মেজর।

পরদিন আবার আমার স্ত্রীকে দেখিবার জন্য প্রবল বাসনা হইল। আমি বরাবর বিনোদের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করিয়া রহস্যভেদের শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিলাম আমার স্ত্রীর গতিবিধির উপর নজর রাখা। আমার ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীর নিকট গিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলি কিন্তু বিনোদ আমাকে ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। সে বলিল "বরং তুমি যতীন্দ্রনাথের জমিদারীতে গিয়ে ওঁদের সব কাজকর্ম্মের উপর নজর রাখ। কিন্তু সাবধান কেহ তোমায় যেন না চিন্‌তে পারে। যদি সত্যি সত্যিই আসল কথা জানবার ইচ্ছা থাকে তা হ'লে খুব সাবধানে কাজ কোর্‌তে হ'বে।"

"আমি সত্যিই সব কথা বার কোরতে চাই যদি প্রাণান্তও হয় তবুও ফুল্লরাকে আমার পেতে হবে।"

"প্রমাণ না পেলে তাঁকে কি করে পাবে?"

"আদিত্যরা ত তাকে আবার মারবার চেষ্টা করতেও পারে।"

"তোমার তাকে রক্ষা ক'রবার চেষ্টা করা উচিত, তুমি গোপনে গোপনে আপনার কর্ত্তব্য কর।"

"ঠিক কথা। আমি তাহ'লে যতীন্দ্রনাথের জমীদারীতে যাই।"

"হ্যাঁ দেখ, যদি এঁদের কিছু খবর পাও।"

"আমি ডিটেকটিভের কাজ অনেক সময়ে নিজে থেকে করেছি তারপর সন্ধান করতে পারলে পুলিসে খবর দিয়েছি। কাজেই এবারও কিছু জানতে পারবো আশা করি।"

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় বুকের পকেটে একটা আধপোড়া সিগারেট পাইলাম। ফুল্লরার সহিত যে দিন আমার বিবাহ হয় সেদিন এই জামাটিই পরিয়াছিলাম। আমি পোড়া সিগারেট কখনো পকেটে রাখি না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম এ একটু নূতন জিনিষ। এর ওপর গ্রীক ভাষায় নীল কালিতে কি লেখা ছিল। একটু পরেই মনে পড়িল এই সিগারেটটি মেজর দত্তর দেওয়া। আমি যখন ফুল্লরার চীৎকার শুনিয়া উপরে যাই তখন সেটি আমার হাতে ছিল। বোধ হয় আদিত্যের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় এটকে পকেটে ফেলিয়াছিলাম।

আমি সিগারেট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহাতে একরকম তীব্র বিষ মেশান ছিল। সেই বিষই লালার সঙ্গে শরীরের ভিতর গিয়া আমার ওরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছিল। মরি নাই এই যথেষ্ট।

বিনোদ ফিরিয়া আসিলে দুই জনে সে যে কি বিষ জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানারূপ পরীক্ষা করিলাম কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে না পারায় আমি অবশেষে সেটুকু যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম। পরদিন আমি যতীন্দ্রনাথের জমিদারীর উদ্দেশে রওনা হইলাম। বিনোদ বাড়ীতেই রহিল। সে বার বার আমায় সাহায্য করিবার ইচ্ছা জানাইল।

আমি যতীন্দ্রনাথের জমীদারীতে এক হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। চা পান করিতে করিতে হোটেলওয়ালাকে রাজা যতীন্দ্রনাথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম তাঁর প্রাসাদ কাছেই।

আ। তাঁর বাড়ী কি বেশ বড় ?

হো। হাঁ তা বই কি। তাঁর নায়েব গোমস্তা সবারি বাড়ী বড়।

আ। তাঁর নাম শুনেছি দেখিনি কখনো। কেমন লোক ?"

হো। একটু মেজাজী ধরণের। লম্বা রোগা মাথার চুল সব পাকা। বড্ড বেশী খাজনা নেন। প্রজারা তাঁকে তত পছন্দ করে না।"

আ। তাঁর রাণীও এখানে থাকেন ত ?

হো। দ্বিতীয় পক্ষের রাণী। তিনি শুনেছি সুন্দরী কিন্তু প্রথম পক্ষের ছেলের সঙ্গে নাকি বনে না।

আ। তাই নাকি? ছেলে আছে আগের পক্ষের? কত বড়?

এতক্ষণে আমার কৌতুহল বাড়িল।

হো। পঁচিশ বছরের ছেলে। খুব আমুদে। বেশীর ভাগ সহরে থাকেন। ব্যারিষ্টার। মাঝে মাঝে বাড়ী আসেন।

আ। মার সঙ্গে বনে না কেন?

হো। চাকররা ওদের ঝগড়ার মজার মজার গল্প বলে। কিছুদিন আগে রাণী রাজাকে বল্লেন যে সতীশকে তাড়িয়ে না দিলে তিনিই বাড়ী থেকে চলে যাবেন। রাজা ছেলেকে ত আর তাড়াতে পারেন না। চোটটা পড়্‌ল চাকর বাকরের উপর। সবাই ত কি হবে ভেবে অস্থির। শেষে সত্যি সত্যিই রাণী বাপের বাড়ী চলে গেলেন। এই দু'মাস হোল রাণী আবার ফিরিয়ে এসেছেন। এখন সব আবার মিটে গেছে।

আ। বাড়ীতে কি অনেক আগন্তুক অভ্যাগত আসেন?"

হো। হাঁ, রাজা সে বিষয়ে ভাল। বড় অতিথি পরায়ণ।

আ। তাঁদের নাম জান! আমার পরিচিত একজন আসেন। রাণী হরনাথ দত্ত।

হো। হাঁ, হাঁ। রাজা হরনাথ দত্তর রাণীর সঙ্গে আমাদের রাণীর খুব ভাব।

আ। আর একজন রাণী নীরদার বোন আসেন তাঁকে দেখেছ? ফুল্লরা সেন?

হো। নাম জানি না। দেখ্‌লে বল্‌তে পারি।

আ। দেখ্‌তে লম্বা ধরণের, খুব কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। খুব ফরসা আর খুব ভাল কাপড় চোপড় পরে থাকেন।

হো। হাঁ তাঁকে ত জানি। তিনিই ত সতীশবাবুর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী।

আ। কি!

বিস্ময় ও দুঃখ যুগপৎ আমাকে আকুল করিয়া তুলিল।

হো। চাকররা বলে বিয়ে হলেই হয়। দুজনের খুব ভাব। অনেক দিন থেকে বাগ্‌দান হয়ে গেছে।

আ। আমি যাঁর বর্ণনা করলাম ঠিক তিনিই ত?

হো। আমি যাঁর কথা বোল্‌ছি তাঁর নাম বেলা।

তা হলে যে নামে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম সে সেই নামেই এখানে পরিচিত। বেলা আদিত্য! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি এখানেই থাকেন বেশীর ভাগ ?"

হো। হাঁ বিশেষ যখন সতীশবাবু আসেন। অনেক সময়ে দুজনে বেড়াতে যান।

আ। হোটেলওয়ালার যাহাতে কোন সন্দেহ না হয় তাই বলিলাম "আমি যাঁর কথা বলছি তাঁর নাম বেলা নয়।

হো। চেহারায় অনেক মেলে কিন্তু।

আ। সতীশবাবুর বিয়ে কবে হবে ?

হো। ঠিক নেই। কেউ বলে সৎমা হিংসেয় দিতে চায় না কেউ বলে রাজার পছন্দ নয়।

আ। তা হলে ওঁদের বিষয় খুব আলোচনা হয় ?

হো। অনেকে অনেক রকম বলে কেউ কেউ বলে বেলা দেবীর বাবা নাকি জেলে গিয়েছিলেন।

আ। কে বলে ?

হো। কি জানি গুজব ত এরকম।

আ। তাঁর বাবা কি কাজ করতেন ?

হো। তাঁর বাবা সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ছিলেন।

বেলা তবে ইচ্ছা করিয়াই আমার সঙ্গে অন্য নামে পরিচিত, কি উদ্দেশ্য তার ? সে তবে সতীশকেই ভালবাসে। তাকে ভালবাসিলে সে এ বিয়ে অস্বীকার করিতে ত চাহিবেই। তবে তার বাপের নামে বদনাম থাকিলেও নাম বদলাইতে পারে বটে তবে এ বদনামের ভেতরও কিছু সত্যি আছে! হা ভগবান আমি যে কি করিব। আমি যে তাকে বিয়ে করেছি। তারপর বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া জমিদারের বাড়ীর ধারে পৌঁছিয়া বেশ ভাল করিয়া চারিদিক দেখিলাম। ভিতরটা দেখিবার ইচ্ছা হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া খিড়কির দরজা দিয়া ঢুকিয়া সুরকির রাস্তা ধরিয়া বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাগানের মাঝখানে প্রকাণ্ড আয়নার মত একটী পুকুর, বাড়ীখানিও প্রকাণ্ড, অনেক মহালে

বিভক্ত, দেখিতে ভারি সুন্দর। খানিক পরে বাড়ীর ভেতরকার ফুলবাগানে দশ বার জন লোককে দেখিতে পাইলাম। কয়েকজন তাস খেলিতেছিলেন, অন্যরা বসিয়া আছেন, ভৃত্য তাঁহাদের লেমনেড্ খাওয়াইতেছে। ঝোঁপের ভিতর দিয়া আগাইয়া গিয়া আমি লোক-গুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দূরে গেরুয়া রংএর রেশমের শাড়ী পরা একটি যুবতী উঠিয়া একজন সুবেশ যুবার সামনে দিয়া চলিয়া গেলেন। যুবা সিগারেট ধরাইয়া তাস খেলা দেখিতেছিলেন। আমি দূর হইতেও বুঝিলাম ওই যুবতীই আমার স্ত্রী। যুবক আমার স্ত্রীর পিছনে পিছনে উঠিয়া পড়িয়া একখানি চেয়ারে আমার স্ত্রীকে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। যুবকের আত্মহারা ভাব দেখিয়া বুঝিলাম তিনি বেলার রূপে একেবারে তন্ময়। এই বুঝি সতীশ! কিন্তু তখনি পিছনে শব্দ শুনিলাম। কেহ আসিতেছে বুঝি? আমি সাবধানে আত্মগোপন করিয়া যে আসিতেছে দেখিবার চেষ্টা করিলাম। এক পুরুষের মূর্ত্তি। আমার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। এই ত সেই, যে আমায় মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই পোষাক সেই হাবভাব। সে ক্রুর এক দৃষ্টিতে আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিতেছিল, বুঝিলাম সে কোন অসদভিপ্রায়ে আসিয়াছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

ভক্তি মন্ত্র।

—:০:—

ঘন বন মাঝে দেবালয় এক,
এখনো সাহস করি',
আছে দাঁড়াইয়া পাষাণ দেবতা
পাষাণ বক্ষে ধরি'।

সৌম্য-মধুর　　গোপাল মুরতি,
যবন অস্ত্রাঘাতে
হারায়েছে আহা　　শ্রীঅঙ্গ রাগ
পূজা উৎসব সাথে।

নিয়মিত সেবা　　পূজা ও আরতি
পড়িয়া রয়েছে বাকী,
শুধু সন্ধ্যায়　　কেঁদে ওঠে হায়,
ব্যথিত হৃদয় পাখী।

নিঝুম দাঁড়ায়ে　　ঘন ঝাউ বন
আছে তার চারি ভিতে,
মৌন প্রকৃতি　　আনে গুরুভার
ভক্ত পথিক চিতে।

ক্ষত সে মুরতি　　শিখী চুড়া বাঁশী
নাহি আর কোন মান,
কতবার গিয়ে　　দেখেছি দেবতা
পাইনি দেখিতে প্রাণ।

একদা শুনিনু　　বৈষ্ণব এক
এসেছেন সেই বনে,
দেবত্বহীন　　দেবতায় পুনঃ
স্থাপিয়া সিংহাসনে,—

পূজেন নিয়ত　　ভকতির ভরে
সাজায়ে মনের মত,
জুটেছে আবার　　ভকতির টানে
ভক্ত সেবক কত।

শুনিয়া সে কথা গেলাম একাকী,
হেরিলাম পূজারীরে,
চূড়া-বাঁশী-মালা সেজেছে কেমন
দেখিছে ভক্ত ধীরে।
কখন হেলায়ে আরো বাঙ্কিমে
দেয় শিখী চূড়াখানি,
ওষ্ঠ প্রান্তে ধরেন চাপিয়া
মোহন মুরলী আনি'।
মনের মতন হয় না সাজান
বিভোর ভক্ত সাধু,
এনেছে গো মরি নীরস কুসুমে
প্রেম কমলের মধু।
যা ছিল অভাব তাঁর সেই ভাব,
পূর্ণ করেছে আজি,
পাষাণে সত্য করেছে দেবতা
ভক্তের ভোজবাজী।
যে ঠাকুর সেথা ছিল এতদিন
প্রাণহীন মৃত-দেহ,
বিশ্বাস ভরে এতদিন হায়,
দেখে নাই যারে কেহ,—
তারে আজ শুধু ভক্তের হৃদি
করেছে জীবন দান,
ভক্তি মন্ত্রে পাষাণ জীয়ায়
এ কথা নহেক আন।

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

দার্জ্জিলিং উপকণ্ঠে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুদূর অতীতে যখন বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক দুর্গম্য হিমালয় কন্দরে প্রবিষ্ট হয় নাই তখনও রাক্ষস-বিবাহ প্রথা ব্যতীত আধুনিক সভ্যজাতিপ্রবর্ত্তিত "কোর্টশিপ্" প্রথাও লিম্বু-গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও লিম্বুদিগের মধ্যে "কোর্টশিপ্" দ্বারা অনেক যুবকযুবতীর বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোর্টশিপে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, যুবকযুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ ও মিলামিশার ফলে যুবতী যদি দোহদ-সম্ভবিতা হয় যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া কন্যার পিতামাতা তাহাদিগকে যথেচ্ছা বিচরণ ও অবাধ দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। প্রণয়পাত্রীর প্রণয় লাভে সমর্থ হইলে, কৌশলে তাহার সঙ্গীত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত করিয়া যুবক তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। লিম্বু জাতির মধ্যে "কাশীলিম্বু" নামে একটি শাখাবিভাগ আছে, ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে একজন নাকি (বেনারস্) কাশী হইতে গঙ্গার স্রোত প্রবাহের বিপরীত দিকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয় পৃষ্ঠে অবস্থিত সুদূর লিম্বুয়ান প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। লুপ্ত অতীতের প্রাচীন ইতিহাসে এ ঘটনার কোন উল্লেখ আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহার সহিত লিম্বুগণের অভিনব বিবাহ-পদ্ধতি ও সঙ্গীতানুরাগের কোন সম্পর্ক আছে কি না তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয়।

বেলা অধিক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া জাতিতত্ত্বের আলোচনা ত্যাগ করিয়া স্নানাহার সমাপনে ব্যাপৃত হইলাম। অশ্ব প্রস্তুত হইলে বেলা প্রায় বারটার সময় পুলবাজার ত্যাগ করিয়া ঝেপি যাত্রা করিলাম। হাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত ট্রাফিক্ অফিসের পার্শ্ব দিয়া চড়াই পথে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিলাম, বামপার্শ্বে ক্ষুদ্র রঙ্গীত নদীর তটভূমি হইতে স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত সবুজ ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া মৃদুমন্দ বাতাস ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল।

নিম্নে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ, সম্মুখে সবুজ ধান্যক্ষেত্র ও চতুর্দ্দিকে মেঘমণ্ডিত সারি সারি পাহাড়—সকলগুলির অভিনব একত্র সমাবেশ দেখিয়া ডিঃ এলঃ রায়ের—

"এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কাল মেঘে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়, বাতাস কাহার দেশে।"

প্রভৃতি গানটি মনে পড়িতেছিল।

চা-কর অধিকৃত দেশে চায়ের পরিবর্ত্তে ধান্যের আবাদ দর্শন করিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই জনৈক কৃষকের নিকট অনুসন্ধানের অবগত হইলাম যে নদীর অপর পার হইতেই চা-কর প্রভুদিগের রাজত্বের সীমানা শেষ হইয়া এপার হইতে রিলিং জমিদারের এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। এ অঞ্চলে চা-কর প্রভুগণ তাঁহাদিগের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন নাই বলিয়াই আজও স্থানীয় কৃষকেরা ইচ্ছামত ধান্য, মাকই, মারুয়া, ও নানাবিধ শাক সব্জীর আবাদ করিয়া সুখে কাল কাটাইতেছে, নচেৎ তাহাদিগকেও দশ পয়সা ছ আনা মজুরীতে সারাদিন চা বাগানে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইত।

ঝাপিতে রিলিং এষ্টেটের হেড কোয়াটার বলিয়া তথায় ম্যানেজার ও কতক[illegible] কর্ম্মচারী বাস করেন।

প্রায় সাত আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ন বেলা প্রায় চারিটার সময় ঝাপি বাজার অতিক্রম করিয়া রিলিংএর কাছারী বাটীতে আসিয়া পহুঁছিলাম। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সাহেবী পোষাক সজ্জিত যুবক জমিদার শ্রীযুক্ত ফক্‌সিং কাজী মহাশয় স্বয়ং আসিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন। তাঁহার অমায়িক সুন্দর মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম, এবং সুন্দর আকৃতিখানির মত মধুর অন্তরখানি দেখিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম।

সত্বর চা ও জল খাবারের উদ্যোগ হইল, উভয়ে চা পান করিতে করিতে ইংরাজীতে গল্প আরম্ভ করিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদিগের জমিদারী সংক্রান্ত এক জটিল

মোকর্দ্দমার গল্প উত্থাপন করিলেন। রিলিং এষ্টেট তাঁহাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু পরলোকগত জমিদারের বিধবা যুবতী পত্নী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করেন, এবং তিনিই এ জমিদারীর স্বত্ব ও উত্তরাধিকার জন্য এ সঙ্গীন মামলার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভুটিয়া ও সিকিমী লেপ্‌চাগণের সম্বন্ধে, হিন্দু বা মুসলমান আইনের মত বিধিবদ্ধ কোন আইন কানুনাদির অস্তিত্ব না থাকায় এ মোকর্দ্দমা লইয়া বিচারক মহোদয়গণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এক আদালতে জয় লাভ করিয়া উর্দ্ধতম আদালতে পরাজিত হইয়া, বহু অর্থব্যয় ও ক্ষতি সহ্য করিয়া উভয় পক্ষই বর্ত্তমানে মহামান্য প্রিভিকাউন্সিলে বিচার-প্রার্থী হইয়াছেন এদিকে প্রকৃত প্রস্তাবে জমিদারীর কোন প্রকৃত উত্তরাধিকার নাই এই অজুহাতে দার্জ্জিলিং খাসমহল বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট জমিদারী খাস করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় গেরুয়া বেশধারী এক স্থূলকায় বৃদ্ধ "নারাইন"* শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে একটি অতি ক্ষুদ্র হুকা হস্তে তথায় প্রবেশ করিলেন এবং কাজীসাহেবকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আসন ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ আসন পরিগ্রহ করিলে কাজীসাহেব তাঁহার সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া কহিলেন যে তিনি অবসর প্রাপ্ত একজন সুবেদার এবং সৈন্য বিভাগে কার্য্যকালে বহু দেশ পরিভ্রমণ দ্বারা বিভিন্ন দেশবাসী লোকজনের আচারব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সুবেদার সাহেব যদিও জাতিতে "রাই জমিদার" তথাপিও তিনি বাঙ্গালী সাধুর মত মস্তকে পাগড়ী, পরণে ধুতি ও গাত্রে লম্বা পাঞ্জাবি পরিধান করিয়াছেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক আলোচনা হইল এবং বর্ত্তমান যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সহিতও তিনি অপরিচিত নহেন বুঝিতে পারিলাম।

গল্প করিতে করিতে মাঝে মাঝে হস্তস্থিত হুকাটিতে টান দিয়া ধুম উদ্গীরণ ও "নারাইন" "নারাইন" শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি নাতি ক্ষুদ্র ভুড়িটির উপর ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন।

* "নারাইন" অর্থাৎ নারায়ণ।

অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া তাঁহাকে রাইজাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি কহিলেন যে রাই জাতি পূর্ব্বে কিরাতজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাভারতাদি নানা প্রাচীন গ্রন্থ ও ইতিহাসে কিরাতজাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এই কিরাতগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে মৃগনাভি, কস্তুরী পশুচর্ম্ম, বনৌষধি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া পর্ব্বত-পাদমূলস্থ নিম্নদেশগুলিতে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত, এবং কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া নিরীহ সমতলদেশবাসীর ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিত; আবার কোন কোন সময় সীমান্ত দেশবর্ত্তী কোন সামন্ত রাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া অপরাপর নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইত। বর্ত্তমান কালে রাইগণের দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ও সাহসিকতা দর্শনে মনে স্বতঃই প্রতীতি জন্মে যে ইহারা সত্যসত্যই সেই অতীতের রুদ্র-প্রকৃতি কিরাত দস্যুগণের বংশধর। এখনও দার্জ্জিলিংবাসিগণ রাইগণকে ভয়ানক চরিত্র বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য করে, ব্রিটিশ সুশাসনে বাস করিয়াও ইহারা কোন কারণে অল্প মাত্র উত্তেজিত হইলেই অপরাধীর অঙ্গে সামান্য কারণে ছুরিকাঘাত করিতে তিলমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। সাধারণতঃ—ইহাদিগকে কুলীগিরি ও ঘোড়ার সহিসের কার্য্য করিতে দেখা যায় কিন্তু কিছু কাল হইতে ইহারা অধিক সংখ্যায় পুলিশ ও পল্টনে ভর্ত্তি হইতেছে। রাই জাতি বহুকালাবধি লিম্বু জাতির সহিত একত্র অবস্থান হেতু উক্ত জাতির সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে উভয় জাতির হাবভাব ও আচারব্যবহারে কদাচিৎ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয়।

তবে বিবাহাদি ব্যাপারে রাইগণের মধ্যে এখনও গুর্খালিগণের মত বরপক্ষ হইতেই কন্যা পক্ষীয়ের নিকট উপঢৌকন* সহ বিবাহ প্রস্তাব প্রেরিত হয়। ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে ইহাদের বিশেষ কোন ধর্ম্মানুচরণে আসক্তি বা আগ্রহ লক্ষিত হয় না, তবে হিন্দু দেবদেবী যথা নারায়ণ, দেবী প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া মান্য করে।

পূর্ব্বে নাকি ইহাদের মধ্যে গোহত্যার প্রচলন ছিল কিন্তু ইহার প্রতিবিধানকল্পে একদা কোন গুর্খারাজ রাইগণকে বহুদিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত করেন,

* আর মদ্য ও পক্ক শূকর মাংস।

এবং তদবধি উক্ত যুদ্ধের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইহারা গোহত্যায় বিরত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যে এখনও গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন রহিয়াছে তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সুবেদার সাহেব তাঁহার ছোট্ট হুক টিতে নূতন করিয়া তামাকু সজ্জিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, কাজী সাহেবেও শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলেন। রাত্রি ভোজের আয়োজনটি বিশেষভাবেই হইয়াছিল এবং অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী ছিল না সুতরাং সুদূর পল্লীদেশে প্রবাসে আসিয়াও নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য সংযোগে রাত্রি ভোজ সমাধা করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন কাজী সাহেবের নির্ব্বন্ধাতিশয্য বশতঃ ঝাপিতেই মধ্যাহ্ন ভোজন ক্রিয়া সমাপণ করিয়া বেলা প্রায় বারটার সময় লোদমা যাত্রা করিলাম। কখন বা চড়াই পথে অশ্বারোহণে, কখন বা উৎরাই পথে পদব্রজে চলিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অথচ সুগভীর ঝরণা পার হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোদমার উপকণ্ঠে উপনীত হইলাম। লোদমা বাজারের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত ঝরণাটি (খোলা) দূর হইতে শুভ্র মেখলার ন্যায় দেখাইতেছিল। লোদমা বাজার অতিক্রম করিয়া পুলিশ পেট্রল হাউসে পহুঁছিয়া রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিলাম।

লোদমা হইতে নেপাল ও সিকিম উভয় রাজ্যের সীমানা অধিক দূরবর্ত্তী নহে, এ নিমিত্ত হাট বারে উক্ত দেশস্থ কৃষক ও গৃহস্থগণ যথেষ্ট পরিমাণে মাখন ও আলু লোদমা হাটে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে, এবং সহর হইতে এ স্থান বহু দূরে অবস্থিত হওয়া নিবন্ধন ও পথ দুর্গম হওয়া বশতঃ লোদমাবাসী মাড়োয়ারী মহাজনগণই ঐ সকল দ্রব্যাদি স্বল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া পরে দার্জ্জিলিং বাজারে অধিক মূল্যে চালান দিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন।

রাত্রিতে বিশেষ শীত অনুভূত হইতেছিল, সুতরাং গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে ফালেলং বা ফলুট্ এ স্থান হইতে মাত্র আঠার মাইল দূরে অবস্থিত, সুতরাং এখানে শীতাধিক্য হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য জনক নহে। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া চা পানান্তে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

পাথেয়।

—:০:—

বড় নির্ম্মম এই ধরণী যে হায়
এ জীবন বড় সুকঠোর
হৃদয়ের মধু শুষে নিতে চায়
ছিঁড়ে দিতে চায় প্রেমডোর।
এ যে অচেনা প্রাণের খেলা-ঘর
তাই জানে না প্রাণের কত দর
চোখে চেখে চায় হেসে চলে যায়
খোঁজে না আপন কেবা পর!

ছিঁছ এই ত ধরণী এই ত জীবন
এরি নাম এরা বলে সুখ!
কভু চোখে পড়ে যদি চেনা দু'নয়ন
বুকে এসে ঠেকে জানা বুক;
ভাবি লুকায়ে রাখিব সে হৃদয়
যদি জীবনে জীবনে জেগে রয়
দুটি হৃদয়ের প্রদীপ আলোকে
ও জীবনে যদি দেখা হয়।

এই জীবন প্রদীপ নিভে গিয়ে আর
সে কি কভু ফিরে জ্বলে না?
দুটি হৃদয়ের পুরাণ সেতার
বিস্ময় কথা বলে না?

এই সুখপ্রভাতের হাসি মুখে
এই বেদনা রাতের ভাঙ্গা বুক
প্রাণে প্রাণে এই জড়িত প্রেমের
ব্যথা-শঙ্কিত ভরা সুখ ?

তবে এই কি সাজান পণ্যের হাটে
কাড়ি দিলে প্রেম কেনা যায় ?
সেকি লাগে না খেয়ার ও পারের ঘাটে
মরণের ঐ কিনারায় ?

ওগো অচেনা আমার কে আপন
আহা চিরজীবনের পরিজন
প্রেমিকের প্রাণ বাঁচাও বাঁচাও
আশায় বাঁচাও এ জীবন !

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

রামায়ণের ধর্ম্ম ।

-:*:-

ভিন্সেণ্ট স্মিথ রামায়ণের যে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দুগণ রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজা, লক্ষ্মণকে আদর্শ ভ্রাতা, সীতাকে আদর্শ স্ত্রী এবং হনুমানকে আদর্শ সেবক বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। নানা বিষয়ে রামায়ণ যে হিন্দুসমাজের কল্যাণই সাধন করিয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। বাংলায় রামচন্দ্রের উপাসক সংখ্যা তত অধিক না হইলেও উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রামচন্দ্রের উপাসক মণ্ডলী

অগণিত। হরেকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমেই বাঙ্গালী বেশ আত্মহারা হয়, রামচন্দ্রের নামে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে আমি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নাই। কোন যাদুমন্ত্রবলে চৈতন্যদেব বাঙ্গালীকে কেমন করিয়া এই নূতন রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন তাহা ঐতিহাসিকগণ সুস্থির করিবেন। আমি এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র এই ভারতবিখ্যাত সর্ব্বজন-প্রশংসিত রামচন্দ্রের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিব। তবে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল যে বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য আলোড়ন পূর্ব্বক কোনও তথ্য বা অমৃত পাঠকপাঠিকা-গণকে উপহার দিবার ক্ষমতা আমার নাই। কারণ আমার সম্বল মাত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত বাল্মীকির রামায়ণ মাত্র। যদি মূল রামায়ণের সহিত এই গ্রন্থখানির অনৈক্য থাকে তবে সুধীমণ্ডলী যেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করেন।

সর্ব্বপ্রথমে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব ঈশ্বরসম্বন্ধে বা ধর্ম্মসম্বন্ধে রামচন্দ্র কি ধারণা পোষণ করিতেন; অর্থাৎ কবিগুরু, রামচন্দ্রের শ্রীমুখ দিয়া এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ দ্বারা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রামচন্দ্রের যখন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষস বিনাশার্থে লইয়া যান। লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে চলেন। দশরথ অবশ্য রামচন্দ্রকে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার অনুমতির জন্য বশিষ্ঠ "সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান, তপস্যার আশ্রয় ও অনুরক্ত" এই কয়েকটি বিশেষণ দ্বারা রামচন্দ্রের পরিচয় রাজা দশরথ সকাশে প্রকাশ করেন। (বা ২১ স)। রামচন্দ্রের শিক্ষাসম্বন্ধে কবিগুরু পূর্ব্বেই কহিয়াছেন—"তিনি বেদবিদ মহাবীর, সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর এবং জ্ঞান ও গুণ সম্পন্ন। তিনি তেজস্বী, সত্যপরাক্রম ও প্রিয়দর্শন। তিনি অশ্বারোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদে সুপটু এবং এবং পিতৃশুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগী (বা ১৮ স)। বিশ্বামিত্রের সহিত চলিতে চলিতে রাম ও লক্ষ্মণ যখন গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম স্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন তাঁহারা দুই জনেই মহর্ষির নির্দ্দেশ মত তীরে অবতীর্ণ হইয়া ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিলেন (বা ২৪ স)। বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা প্রদান করিবার পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সরযূর জল লইয়া আচমন

করিয়া পবিত্র হইতে আদেশ করেন। রামচন্দ্র সহাস্যমুখে সে আদেশ পালন করিয়া ঐ বিদ্যা দুইটি গ্রহণ করিলেন (বা ২২ স)। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় এই সময়ে নদী-পূজা প্রচলিত ছিল এবং নদীর জলে স্নান কিম্বা আচমন করিলে মানুষ পবিত্র হইতে পারে এ ধারণ ও তখনকার লোকের ছিল।

নদী-পূজা বা river cult

এই নদীপূজা বা River cult এ নও ভারতবর্ষে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে গঙ্গা যেমন পুণ্যতোয়া রুশিয়া ইজিপ্টে তেমনই ভল্গা ও নীল নদ ঐ দুই দেশের নরনারীর নিকট পুণ্যতোয়া। [গঙ্গা — ভগ্গা — ভল্গা। ইহা সত্য হইলে, ভল্গা-তীরবাসী লোকই ভারতবর্ষে আসিয়া গঙ্গাকে তাহাদের দেশের নদীর নামে নামকরণ করিয়া স্বদেশে স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল ইহাই কি অনুমান করিতে হইবে? ঐতিহাসিকগণ কি বলেন?]

অতঃপর বালকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গে দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র তাড়কাকে বধ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং রাজধর্ম্ম সম্বন্ধেও উপদেশ দিতেছেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন—"স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। দেখ, চাতুর্ব্বর্ণের হিতের নিমিত্ত রাজকুমারের ইহা কর্ত্তব্যই হইতেছে। যিনি লোকরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাহাকে কি নৃশংস, কি অনৃশংস, কি পাপকর, কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্য্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। অতএব তুমি অধর্ম্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ইন্দ্র পৃথিবী বিনাশ-সঙ্কল্পকারিণী বিরোচন-সুতা মন্থরাকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণু ইন্দ্রের নিধনকামনাকারিণী শুক্র-জননী পতিপরায়ণা ভৃগুপত্নীকেও বিনাশ করিয়াছিলেন। অতএব তুমিও স্ত্রীহত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নির্দ্দেশে ঐ পিশাচীকে সংহার কর।" সুতরাং দেখা যাইতেছে বিশ্বামিত্র (১) রাজধর্ম্মানুশাসন (২) গুরুর নিদেশ এবং (৩) বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ব্যবহার এই তিন প্রকার যুক্তি দ্বারা রামকে স্ত্রীবধে লিপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই নারী কিন্তু অবলা নারী নয়, বরং ভয়ানক সবলা—যাকে বলে পুরুষের বাবা। ইহার উপর ইনি আবার অধর্ম্মনীলা

রাজধর্ম্ম

যজ্ঞবিঘ্নকারিণী নরঘাতিকা। ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে তখনকার দিনে স্ত্রীহত্যা সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিত। রামচন্দ্র অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন এবং বিশ্বামিত্রের সহিত আসিবার সময় দশরথ বলিয়া দিয়াছিলেন—"বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবে।" সেই জন্য বিশ্বামিত্রের নির্দেশ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন—"পিতার নির্দ্দেশ ও পিতার বাক্য গৌরব এই দুই কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব, কদাচই অবহেলা করিব না। এক্ষণে আমি গো ব্রাহ্মণের হিত ও দেশের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বধ করিব।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে পিতৃ আজ্ঞা ছিল বলিয়াই রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কথা শুনিলেন। দেশ ও গো-ব্রাহ্মণের হিতের কথা সর্ব্বশেষে যে রামচন্দ্র জুড়িয়া দিলেন তাহা শুধু বিশ্বামিত্রের অতবড় বক্তৃতার মানরক্ষা করিবার জন্য। বিশ্বামিত্র কথিত রাজধর্ম্ম এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ব্যবহার যে রামচন্দ্র সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন তাহা বোধ হইতেছে না। নতুবা তিনি যে তাড়কাবধে প্রবৃত্ত হইবার দুইটি কারণের উল্লেখ করিলেন তন্মধ্যে নিশ্চয়ই ঐ সকলের উল্লেখ থাকিত। স্ত্রীবধ যদি সমাজে ঘৃণার্হ পাপকর অযশস্কর ও নৃশংস বলিয়া বিবেচিত না হইত তবে এই কারণ নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইত না।

স্ত্রীহত্যা ঘৃণার্হ

এইখানে বিশ্বামিত্রের রাজ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। রাজাকে যদি প্রজার হিতের নিমিত্ত পাপকর অযশস্কর ও নৃশংস কার্য্য করিতে হয় তবে সে রাজধর্ম্মকে পৈশাচপন্থী বলিতে হইবে। পাপ ও নৃশংসতার উপর যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত তাহাকে শান্তি না বলিয়া পৈশাচিক তৃপ্তি বলাই সঙ্গত। বিশ্বামিত্রের রাজধর্ম্মের সহিত চাণক্য রাজনীতি ও কৈশোর রাজনীতি তুলনীয়। এই তিনটিই একই ছাঁচে ঢালা। ঐ তিনটির মতে ভালমন্দ পাপপুণ্য সকলই দেশের জন্য রাজার পক্ষে করণীয়। এ রাজধর্ম্মকে অনেকেই বর্ব্বরোচিত বলিয়া মনে করেন।

সুতরাং দেখা গেল রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞার জন্যই বিশ্বামিত্রের নির্দেশানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র কথিত রাজধর্ম্ম পালনের জন্য নয়। বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে

বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যাগ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। রামচন্দ্রকে এই শিষ্যত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যেন নির্বিঘ্ন যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিশ্বামিত্র কহিলেন—"বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম, তুমি গুরুবাক্য যথার্থতই প্রতিপালন করিলে।" আমরা জানি পিতার আজ্ঞাতেই রামচন্দ্র রাক্ষস বধ করিয়া যজ্ঞরক্ষা করার জন্য বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আসেন, গুরু বিশ্বামিত্রের বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য নয়। আর গুরুত্ব ত পথে আসিতে আসিতে পাইয়াছেন। সুতরাং "গুরুবাক্য" এই কথা বলিবার কেবলমাত্র তাঁহার গুরুত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। কার্য্যও তাহাই হইল। "শর্ব্বরী প্রভাত হইতে না হইতেই রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন "ভগবন! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে! এই বাক্যের 'কিঙ্কর' হইতেই যে মনে করিতে হইবে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কিঙ্করত্ব স্বীকার করিলেন এবং তখনকার দিনে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে ছিল তাহা নয়। "আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে" এই বাক্যেরই উদার, মধুর বা ভদ্র (Polite) সংস্করণ হইতেছে রামচন্দ্র যাহা বলিলেন সেই বাক্যটি। ঐ কিঙ্কর শব্দ শিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই আছে বলিয়া বোধ হয় না।

পিতৃআজ্ঞা ও গুরুভক্তি

ব্রাহ্মণ পূজনীয়

তবে ব্রাহ্মণগণ যে তখন পূজনীয় ছিলেন তাহা আমরা এই কাণ্ডেই পাই। ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়াও রামচন্দ্র পরশুরামকে কহিলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ।" ব্রাহ্মণগণের জন্য যদি সমাজে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে রামচন্দ্র এই ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যবহার করিতেন না। বিবাহের সময় এবং শ্রাদ্ধবাসরেও ব্রাহ্মণগণ এখনকার মত নানা প্রকার দান ও সমাদর পাইতেন। আর ব্রাহ্মণ হওয়া যে কতখানি আয়াসসাধ্য তাহা আমরা বিশ্বামিত্রের জীবনেই দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে যে ব্রাহ্মণ সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন তাহারও অনেক প্রমাণ রামায়ণে আছে।

ব্রাহ্মণে দান

ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

তবে আমরা একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না। দশরথের মত এত বড় রাজা কেমন করিয়া তাঁহার অত স্নেহের রাম লক্ষ্মণকে সৈনাসামন্ত ইত্যাদি সঙ্গে না দিয়া এক রকম নিঃসম্বল অবস্থায় অতবড় রাক্ষসবাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন—তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। রাজপুত্রের পক্ষে অতবড় শত্রুর বিরুদ্ধে পদব্রজে যাত্রা করাও গৌরবজনক নয়। বিশেষতঃ রামের বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। তখনকার দিনে বিবাহের পূর্ব্বে সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত এবং শিক্ষার জন্য মুনি ঋষিগণের আশ্রমে যাইয়া কয়েক বৎসর থাকিতে হইত। রামচন্দ্র জন্মাবধি বাড়ীতে থাকিয়াই ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিলেন। তাঁহাকে কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্য এবং তাঁহাকে যজ্ঞাদির সহিত পরিচিত করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের সঙ্গে একরকম একাকী প্রেরণ করিবার কারণ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র শাস্ত্র ও শস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মত গুরুর নিকট শিক্ষা সমর্পিত করা যে গৌরবজনক ও কল্যাণকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি নিজে আসিয়া বলিয়াছেন—"মহাবীর রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্য তেজ প্রভাবে * * * যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম ত্রিলোকবিখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ইঁহার সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ইঁহার নিমিত্ত ভীত হইবেন না। * * * অতএব এক্ষণে ইঁহাকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করেন।"

ব্রহ্মচর্য্য

পুত্রবৎসল দশরথের অবস্থা বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শ্রবণে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই রামচন্দ্রকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইতেছিলেন না। কিন্তু কুলগুরু বশিষ্ঠ অনেকগুলি ভীষণ অস্ত্র শস্ত্রের নাম করিয়া কহিলেন—"ঐ সকল অস্ত্রের আবার নানা প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ, মহাবীর্য্য, দীপ্তিশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহাদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জ্ঞাত আছেন। ইনি অপূর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যা বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ইঁহার কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষির প্রভাব এই রূপই জানিবেন। অতএব আপনি ইঁহার সমভিব্যাহারে রামকে প্রেরণ করিতে কিছুই

কুলগুরু

সঙ্কোচ করিবেন না।" (বা ২১ স)। বশিষ্ঠের কথা শুনিয়াই দশরথ রামলক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রাণীর সহিত মঙ্গলাচরণ করিয়া এবং রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীত মনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় নয় যে শস্ত্র শিক্ষার জন্যই রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে প্রেরিত হইল। এই অনুমান গ্রহণ করিলে পূর্ব্বলিখিত বিশ্বামিত্র কথিত "গুরুলাঘব," এবং রামচন্দ্র কথিত "কিঙ্কর" শব্দ সঙ্গত বোধ হয়, এবং উহাদের মধ্য হইতে dramatic ভাব তিরোহিত হয়। সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ সর্গে আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হয়। এই দুই সর্গে দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনেকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছেন। ঐ সকলের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রও রহিয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত অনুমান করিবেন রামায়ণের সময়ে বন্দুকের মত কোন অস্ত্র প্রচলিত ছিল।

অস্ত্র শিক্ষা

অস্ত্রশস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইবার আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। সত্যরক্ষা বা বাক্যানুযায়ী কার্য্য করা যে ধর্ম্মের অন্তর্গত তাহা রামায়ণে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দশরথ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন—"এক্ষণে যদর্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন। আমি আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। ** ** ** আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব (১৮ স)। রাজা দশরথ রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত পাঠাইয়া এই সত্যরক্ষা করিয়া ছিলেন। এই সত্যরক্ষার জন্য পরে রামচন্দ্রকে বনে যাইতে হইয়াছিল এবং বালীকে অন্যায় পূর্ব্বক সংহার করিতে হইয়াছিল।

সত্যরক্ষা

বৈরশুদ্ধি বা প্রতিশোধ লওয়া যে তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল তাহা ষট্‌সপ্ততিতম সর্গে দেখিতে পাই। রাজা দশরথ সসৈন্যে পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের সহিত মিথিলা হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথে ক্ষত্রিয় কুলান্তক জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরাসুর সংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন—"তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমার এই পৈত্রিক শরাসন গ্রহণ কর ও ইহাতে শর সংযোগ কর।" এই কথার উত্তরে রামচন্দ্র কহিলেন --"আপনি

বৈরিশুদ্ধি

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম

পিতার বৈরিশুদ্ধির উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা শ্লাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনার সমুচিতই হইয়াছে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আপনি যে আমাকে দুর্ব্বল অক্ষম বোধ করিয়া অবমাননা করিতেছেন ইহা কোন মতেই আমি সহিতে পারি না।" সুতরাং দেখিলাম পিতৃবৈরী ও নিজবৈরীকে বিনাশকরা বা নির্য্যাতন করা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অন্তর্গত এবং এখনকার দিনে coward বা ভীরু বলিলে মানুষের রক্ত যেমন গরম হইয়া উঠে এবং ন্যায়তঃ (morally) অবজ্ঞাকারীকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে তেমনই তখনকার দিনে ঐরূপ অবজ্ঞাকারীকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে তেমনই তখনকার দিনে ঐরূপ অবজ্ঞাকারীকে শাস্তি দেওয়া ক্ষাত্রধর্ম্মান্তর্গত ছিল।

পিতৃশুশ্রূষা ও আরধনা করা তখনকার দিনে ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও কর্ত্তব্য ছিল। এখনকার দিনেও ভারতবর্ষে পিতামাতার সেবাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকি বালকাণ্ডে পিতৃশুশ্রূষা ও পিতার আরাধনার কথাই বলিয়াছেন, মাতৃশুশ্রূষা বা মাতার আরাধনার কথা বালকাণ্ডে বলেন নাই। মাতৃগণকে অন্যান্য গুরুজনের সহিত একসঙ্গে

পিতামতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেবা বালকাণ্ডের ৭৭ সর্গে দেখিতে পাই—"রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ** ** পিতৃশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।" "রাম ও মহাবল লক্ষ্মণ দেবসদৃশ পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পৌরকার্য্য সমুদয় পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রযত্নে পুরবাসীদিগের প্রিয় ও হিতকর সকল বিষয়ই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মাতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।" বোধ হয় তখনকার দিনে পিতা, মাতা অপেক্ষা অধিক পূজনীয় ও আরধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনকার দিনে যদিও সকলে মাতাকে পিতা অপেক্ষা অনেক অধিক গুণে পূজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু কার্য্যতঃ অধিকাংশ সন্তানই মাতা অপেক্ষা পিতাকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত বাক্য হইতে আরও দেখিতে পাই যে নিজকে সুখী করা এবং অন্যান্য সকলের সুখ ও হিতসাধন করা তখনকার দিনেও মানব জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

সার্ব্বজনীন সুখ

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে তখনকার দিনে প্রীতির বন্ধন ছিল এবং পরস্পরের ভাব বিনিময় এবং অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হওয়ায় তখনকার দিনের দাম্পত্য জীবনও অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। বালকাণ্ডের সর্ব্ব শেষ সর্গে আমরা দেখিতে পাই "রাম তাঁহার (সীতার) প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জনকীর স্পষ্টই জানিতেন এবং ** ** ** জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন।" ইহা হইতে মধুর ভাব দাম্পত্য-জীবন আর কি হইতে পারে ?

মধুর দাম্পত্য জীবন

রামায়ণের সময় লোকের আদর্শ কত উচ্চ ছিল তাহা নারদের প্রতি বাল্মীকির প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায়। "এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বিদ্বান, মহান পরক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন ? কোন ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন ? কোন ব্যক্তি লোক-ব্যবহার কুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন ? কোন ব্যক্তিই রোষ ও অহঙ্কার বশবর্ত্তী নহেন ? রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন ?" (বা ১ স)। এই প্রশ্ন হইতে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শুধু রামায়ণের সময়ের আদর্শ নহে—তাহা চিরকালের আদর্শ। এই আদর্শে মনকে বড় করিয়া দেহকে খাট করা হয় নাই। ইহা হইতে ঐহিক বিষয় পরিত্যক্ত হইয়া পারত্রিক বিষয়কে বাড়াইয়া তোলা হয় নাই। এই আদর্শ শুধু লৌহকাঠিন্যের পরিচয় প্রদান করে নাই, পুষ্প পেলব কোমলতার পরিচয় দিয়াছে।

আদর্শ পুরুষ

রামায়ণের যুগে ত্রিসত্য করা প্রচলিত ছিল। এখনও অনেকে ত্রিসত্য করিয়া থাকেন। সুখের বিষয় পুরুষ মহল হইতে এই শপথ করার রীতি অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এই শপথ করার প্রথাকে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। এই ত্রিসত্য করার কথা আমরা (বা ৭১ সর্গে) দেখিতে পাই। "জনক

ত্রিসত্য করা

কহিলেন—"সুর কন্যার ন্যায় সুরূপা বীর্য্যশুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি প্রীত মনে অবশ্যই এই কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি (বশিষ্ঠ) রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্ব্বাহ করিয়া দেন। * * * এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো হিরণ্যাদি দান করা কর্ত্তব্য হইতেছে।" সুতরাং দেখিতে পাইলাম এখনকার মত রামায়ণের যুগে বিবাহের সময় পিতৃকৃত্য বা পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ এবং গো হিরণ্যাদি দান অনুষ্ঠিত হইত। এখন সম্ভবতঃ

পিতৃশ্রাদ্ধ বা পিতৃপূজা

এই রকম শ্রাদ্ধের সময় পিতৃকুলের ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষ এবং মাতৃকুলের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের পিণ্ড প্রদান করা হয়। এই রকম পিতৃশ্রাদ্ধকে পিতৃপূজা বলিলে যে বিশেষ ভুল হইবে তাহা নহে। চীন দেশে পিতৃপূজার প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষেও ইহার প্রচলন কম নয়। কারণ অন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত যত অনুষ্ঠান হয়, তাহার অধিকাংশের সহিতই এই পিতৃশ্রাদ্ধ বিজড়িত। সুতরাং বলিতে হইবে চৈনিক প্রভাব ভারতবর্ষে কিম্বা ভারতবর্ষের প্রভাব চীনে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বা ৭২ সর্গে দেখিতে পাই, জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে কহিলেন—"আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম্ম আমার সঞ্চিত হইল।"

কন্যাদান-পরম ধর্ম্ম

সুতরাং বুঝা যাইতেছে কন্যাদান করা বা কন্যার বিবাহ দেওয়া তখনও এখনকার মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত।

বা ৫ সর্গে দেখিতে পাই "সাগ্নিক গুণবান বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা ঋষিগণ তথায় (অযোধ্যায়) নিরন্তর কাল যাপন করিতেছেন।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তখন অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল, এবং বেদ

অগ্নিপূজা

বেদাঙ্গ জানা এবং সত্যপরায়ণ ও দানশীল হওয়া ঋষিগণের পক্ষে কর্ত্তব্য ছিল। রাজা দশরথও বেদ বেদাঙ্গপারগ, পরম ধার্ম্মিক, দূরদর্শী, তেজস্বী, যজ্ঞশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মার্থ কাম অনুসরণকারী ছিলেন। আর তাঁহার প্রজারা ছিল ধর্ম্মপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, হৃষ্ট, স্বধন-তুষ্ট, অলুব্ধ স্বভাব ও সত্যবাদী

সঙ্কুলী ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহও কামোন্মত্ত দুরাচার, ক্রূর, মূর্খ, ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিক ছিল না। সকলেই সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল (বাল কাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ)। সুতরাং দেখিতে পাই সুখের আর সীমা ছিল না। এবং ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া নগরবাসীর পক্ষে সাগ্নিক হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। ইহা হইতে রামায়ণী যুগে অগ্নিপূজা যে কতখানি ব্যাপক ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে বেদ বেদাঙ্গবেত্তা কেবল ঋষিরাই হইতেন। রাজা হইতেন বেদ বেদাঙ্গ পারগ আর প্রজারা হইত শুধু শাস্ত্রজ্ঞ।

আদর্শ সমাজ ঋষি, রাজা ও প্রজা

বা: ৫ সর্গে বর্ণ বিভাগের কথা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে—"ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।" সুতরাং দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের পর বৈশ্য এবং বৈশ্যের পর শূদ্র এই ক্রমে জনসমাজ চারি স্তরে বিভক্ত ছিল। রিজ্ ডেভিড্ (Rhys Davids) এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন।

বর্ণ বিভাগ

পক্ষপাত শূন্য ন্যায় পরায়ণতা যে রামায়ণীযুগের ধর্ম্মান্তর্গত ছিল তাহা আমরা বা ৭ সর্গে দেখিতে পাই। দশরথের মন্ত্রীগণের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া কবিগুরু লিখিয়াছেন—"ইঁহারা কৃতাপরাধ পুত্রকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না।"

ন্যায়পরায়ণতা

অথর্ব্বেদও যে রামায়ণের সময়ে প্রচলিত ছিল তাহা আমরা বালকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গে দেখিতে পাই। রাজা যে যজ্ঞের বলে পুত্রমুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং সে যজ্ঞ অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া ছিল। এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পূর্ব্বে প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইয়াছিল। পুত্রের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে প্রথমেই পুত্রেষ্টি করা উচিত ছিল। সম্ভবতঃ অথর্ব্ববেদ তখন তত প্রচলিত ছিল না সেই জন্যই সকলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা না দিয়া অশ্বমেধের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এখনও অনেকে অথর্ব্ববেদকে বেদের মধ্যে ধরেন না।

অথর্ব্ববেদ

রামায়ণের সময়ে প্রাতঃকালে উঠিয়া শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ধ্যানাদি করিতে হইত। বা ২৩ সর্গে দেখিতে পাই রামচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান, অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রীজপ সমাপন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এখনও বিহার অঞ্চলে সকলেই প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিয়া থাকে এবং স্নানের পর গীতাপাঠ ইত্যাদি নানা প্রকার ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রামায়ণী যুগের প্রভাব এখনও অনেক স্থানে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রাতঃকৃত্য

অতিথি-পরায়ণতা রামায়ণী-যুগে ধর্ম্মের একটা অঙ্গ ছিল। বা ২৩ সর্গে দেখিতে পাই—"বিশ্বামিত্র ও রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাপসেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বামিত্রের অতিথিসৎকার করিয়া পশ্চাৎ রামলক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন।" আরও অনেক স্থানে প্রাচীন ভারতের অতিথিপরায়ণতার কথা আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধর্ম্মশালা ইত্যাদি দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন ভারতবর্ষে অতিথিপরায়ণতাকে ধর্ম্মজগতে কত উচ্চ স্থান প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ হইতে এই প্রথাটি এক রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

অতিথি-পরায়ণতা

রামায়ণের সময়ে কার্ত্তিক পূজারও প্রচলন ছিল। বা ৩৭ সর্গে দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিতেছেন, "এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয় সে দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া তাহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।" এখনও কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গে কার্ত্তিকপূজায় বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

কার্ত্তিকপূজা

বা ৩৮ সর্গে দেখিতে পাই রাজা সগর নিজ পুত্র অসমঞ্জকে পাপাচারী, পৌরজনের অহিতকারী সাধুদ্রোহী হওয়ার জন্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় সমাজে ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধার্ম্মিক হইলে রাজপুত্রকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইত। রাজা যদি স্বেচ্ছাতন্ত্র বা absolute হইতেন তাহা হইলে সগর পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন সেই পুত্রকে কখনও পরিত্যাগ করিতেন না।

ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়ম পরতন্ত্রতা

রামায়ণের সময়ে কৃচ্ছ্র সাধন যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল তাহা আমরা বা ৪২ সর্গে দেখিতে পাই। পূর্ব্বপুরুষগণকে অপমৃত্যুর পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য গঙ্গাকে ভূলোকে আনয়ন করিবার জন্য রাজর্ষি ভগীরথ গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপানুষ্ঠান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কখন মাসান্তে আহার করিতেন এবং কখনও পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী ও কখন বা উর্দ্ধবাহু হইয়া থাকিতেন।" ইহা হইতে আরও দেখিতে পাই যে ঐ সময়ে অপমৃত্যু পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখনও হিন্দুগণ অপমৃত্যুকে পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন। বা ৫১ সর্গেও দেখিতে পাই বালখিল্য ও বৈখানসের মধ্যে কেহ কেহ জলমাত্র পান এবং কেহ বায়ু মাত্র, কেহ শীর্ণ পত্র এবং কেহ কেহ বা ফল মূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন। এই কাণ্ডের ৬১ সর্গে দেখিতে পাই—"বিশ্বামিত্র আলম্বনশূন্য ও উর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণে প্রাণধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাসময়ে অনাবৃত দেশে এবং শীতকালে অহোরাত্র জলের মধ্যে কালযাপন করিলেন।" এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রামায়ণী যুগে কৃচ্ছ্র সাধন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল।

কৃচ্ছ্রসাধন-ধর্ম্ম

অপমৃত্যু-পাপ

শরণার্থীকে রক্ষা করা রামায়ণের সময়ে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং তাহাকে পরিত্যাগ করা যে পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা আমরা বা ৬২ সর্গে দেখিতে পাই। মুনিবালক শুনঃশেফকে রাজা অম্বরীষ তাঁহার যজ্ঞাশ্বের পরিবর্ত্তে বলিদান করিবার জন্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। এই বালক প্রাণরক্ষার্থে বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিলেন—"এই মুনিবালক শরণার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশীল, এক্ষণে এই মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন কর। ইহাতে এই ঋষিকুমার রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন

শরণার্থীকে রক্ষা করা ধর্ম্ম

নরবলি

হইতে পারে।" সুতরাং দেখা গেল যে পুত্র বিসর্জ্জন দিয়াও শরণার্থীকে রক্ষা করা তখনকার দিনে কর্ত্তব্য ছিল। আরও দেখিলাম রামায়ণী যুগে নরবলি প্রচলিত ছিল এবং অগ্নিকে তৃপ্ত করা, যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সাহায্য করা, দেবগণের তৃপ্তি সাধন করা ও পিতৃ আজ্ঞা পালন করা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল। বিশ্বমিত্রের পুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত না হওয়ায় তিনি কহিলেন—"পামরগণ! তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিলি! ইহা শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধর্ম্ম তোদের ত্রিসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে নীচ জাতি প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুর মাংসে উদর পূর্ণ পূর্ব্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।" সুতরাং বুঝা গেল পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে সৎকর্ম্মশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাক্তিও ঘোরতর অধার্ম্মিক বলিয়া রামায়ণী যুগে বিবেচিত হইত।

ধর্ম্ম

পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা অধর্ম্ম

বিশ্বামিত্রের জীবনী হইতে আমরা দেখিতে পাই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে ছিল এবং ব্রহ্মবলের নিকট ক্ষত্রিয়বল নগণ্য ছিল। তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্র নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র তাঁহার নিকট হইতে লাভ করেন। এবং ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র পরে বশিষ্টের উপর প্রয়োগ করেন। বশিষ্ট তখন তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"বিপুল ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষত্রিয় বলের তুলনাই হয় না। তুই আমার সেই অলৌকিক বল প্রত্যক্ষ কর।" ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা বিশ্বামিত্রের দিব্যাস্ত্র সকল ব্যর্থ হইয়া গেল এবং বশিষ্টের দয়ার জন্য তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল। এইরূপে পরাভূত হইয়া বিশ্বামিত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"হা! ক্ষত্রিয় বলে ধিক; ব্রহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। * * * এক্ষণে আমি স্থির নিশ্চয় হইয়া এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপানুষ্ঠান করিব।" সুতরাং দেখা গেল বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন ব্রহ্মবল ক্ষত্রিয় বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল ব্রহ্মবল ক্ষত্রিয় বলের নিকট একেবারেই নগণ্য। এবং সেই জন্যই তিনি বশিষ্টের কামধেনু শবলাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সুতরাং বুঝা যায় বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে জানিতেন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল কিন্তু বশিষ্টের নিকট পরাজিত হইয়া বুঝিলেন ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক্ষেত্রে শাস্ত্র

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে

দ্বারাই নিরূপিত হইল ব্রাহ্মণ বড় না ক্ষত্রিয় বড়। শবলা নিজেকে বিশ্বামিত্রের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল সৈন্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার মধ্যে পহ্লব, যবন, শক, কম্বোজ, বর্ব্বর, কিরাত ও হারিত সৈন্যের নাম দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে বশিষ্ঠ এই সকল জাতীয় লোকের গুরুদেব ছিলেন, এবং উহারা তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিল। বোধ হয় তিনি উহাদিগকে হিন্দুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাহারা আসিয়া বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শবলাকে উদ্ধার করিল এবং বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ যে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র অপেক্ষা শক্তিশালী বা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত হইল। বোধ হয় এই যুদ্ধের জন্যই রাজ্য হারাইয়া বিশ্বামিত্রকে তপস্যা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং বোধ হয় তাহার গুপ্ত অভিপ্রায় ছিল বর্ব্বর ইত্যাদিকে দলে টানিয়া আনিয়া বশিষ্ঠের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। এই সমস্ত আনুমানিক কচকচি ঐতিহাসিকগণের জন্য রাখিয়া দিয়া আমরা দেখিব কোন কোন স্তরের ভিতর দিয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্বে গিয়া পৌছেন। 'সহস্র' এই শব্দটি অত্যুক্তি বোধে পরিত্যাগ করিয়া আমরা বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিবরণ প্রদান করিব।

অপরিমিত সন্তাপ লইয়া তপস্যা করিবার জন্য বিশ্বামিত্র মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে চলিলেন। এবং ফলমূল মাত্রে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এক বৎসর তপস্যার পরে তিনি রাজর্ষি লোক অধিকার করিলেন। তৎপর ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাইয়া এবং তাঁহার জন্য এক অন্তরীক্ষ জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং তৎপর শুনঃশেফের প্রাণ রক্ষা করিয়া বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে গিয়া পুনরায় একবৎসর কঠোর তপস্যা করেন। এই বারের তপস্যার ফলে তিনি ঋষিত্ব লাভ করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি কামের বশীভূত ছিলেন। সেই জন্য মেনকার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত দশ বৎসর কাটাইলেন। পরে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া পুনরায় একবৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলেন। এই বারের তপস্যার ফলে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা আসিয়া তাহাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইল। বিশ্বামিত্র কিছুতেই বিচলিত হইলেন না, বরং তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। কিন্তু অভিশাপ দিয়াই তাঁহার মনে হইল ক্রোধ রিপু তখনও আত্মাকে অধিকার করিয়া আছে। কাম নষ্ট হইয়াছে এইবার ক্রোধকেও নষ্ট করিতে হইবে। এইবার তিনি উত্তর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। একবৎসর তপস্যা করিয়া তিনি অন্ন ভোজন করিবার বাসনা করিলেন, অন্ন প্রস্তুতও হইল। কিন্তু ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে আসিয়া সেই অন্ন প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদায় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া পূর্ব্ববৎ মৌন ব্রত ধারণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাসরোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে একবৎসর কাল তপস্যা করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং ওঁকার, বষট্কার বেদ ও সমুদায় বরণ করিলে এবং সুরগণের অনুরোধে বেদবিৎ ও ধনুর্ব্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য বশিষ্ট আসিয়াও বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক অনুমোদন ও মৈত্রি স্থাপন করিলেন। সুতরাং বুঝা গেল কাম এবং ক্রোধ জয় না করিলে কোন ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না। আর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে ক্ষত্রিয়কে নিম্নলিখিত স্তর অতিক্রম করিতে হইত।

কাম ও ক্রোধ বর্জ্জনীয়

(১) রাজর্ষিত্ব
(২) ঋষিত্ব
(৩) মহর্ষিত্ব
(৪) ব্রহ্মর্ষিত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব।

সুতরাং বুঝা গেল ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ও মহীয়ান ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে হিন্দুগণ যন্ত্রাদির পূজা করিয়া থাকেন। যাত্রার দিনেও গৃহস্থালীর তৈজসপত্র অর্চ্চিত হইয়া থাকে। রামায়ণী যুগে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ধনুর অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল। বা ৬৭ সর্গে দেখিতে পাই জনক বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন "ব্রাহ্মণ! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সকল মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন।"

ধনুপূজা

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটিই হিন্দুগণের নিকট প্রধান দেবতা। কিন্তু দেবগণের প্রতি কার্য্য ব্রহ্মাকে সংশ্লিষ্ট দেখিয়া মনে হয় দেব ও মানব সমাজে ব্রহ্মার আধিপত্য নিতান্ত অল্প ছিল না। বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব তিনিই প্রদান করিয়া ছিলেন। অধিকার ও বর প্রদানে বড় হইলেও শক্তি হিসাবে রামায়ণের সময়ে বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মার পরামর্শ মতে দেবগণ রাবণবধের জন্য বিষ্ণুরই শরণ গ্রহণ করেন এবং কবিগুরু তাঁহাকেই ত্রিলোক পূজিত ত্রিজগৎপতি, দেবপ্রধান বলিয়া বর্ণনা করেন (বা ৫ স)। বোধ হয় মহেশ্বর পূর্ব্বে আর্য্যগণের দেবতা ছিলেন না। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে যজ্ঞ ভাগ দিতে প্রথমে স্বীকৃত ছিলেন না। কিন্তু দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া মহাদেব দেবগণের শিরশ্ছেদ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে দেবগণকে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞভাগ প্রদানে সম্মত হইতে হইল। (বা ৬৬ সর্গ)। এই ঘটনার পূর্ব্বে মহাদেবের নাম রুদ্র ছিল এবং তিনি বোধ হয় অনার্য্যগণেরই দেবতা ছিলেন। কিন্তু এত বড় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াও রুদ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইতে পারেন নাই। রামায়ণের সময়ে বিষ্ণুই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা বা ৭৫ সর্গে দেখিতে পাই। ভৃগুনন্দন রাম রামচন্দ্রের পথ অবরোধ করিয়া কহিলেন, "কোন এক সময় সুরগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মা সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উঁহারাও পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন, সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈব ধনু শিথিল হইয়া যায় এবং রুদ্র দেবও স্তম্ভিত হন। তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুই অধিক বল।"

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর

বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা

বেদান্তের বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত রামায়ণী যুগ যে পরিচিত ছিল তাহা আমরা বা ৭০ সর্গে দেখিতে পাই। সেখানে দেখি বশিষ্ঠ রাজা জনককে দশরথের বংশপরিচয় প্রদান কালে কহিতেছেন—"মহারাজ! প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন।" সুতরাং অপ্রমেয় ব্রহ্মের কথা বশিষ্ঠ জানিতেন।

অপ্রমেয় ব্রহ্ম

সুতরাং দেখিতে পাইলাম রামায়ণী যুগের ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। বারান্তরে অযোধ্যাকাণ্ডের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

অকাল-বোধন।

'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' সোনার বঙ্গভূমি আজ শ্মশানে পরিণত। জরা-ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এই বিভীষিকাময়ী মহাশ্মশানে মৃত্যুর মশাল জ্বালাইয়া অনশনক্লিষ্ট কোটী কোটী নর-নারীর করুণ আর্ত্তনাদ দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে! নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিহারা নয়নে, অবসন্ন দেহে, ক্লিষ্ট পদে, সর্ব্ব-হারার দল আমরা বিলাস-মারীচের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি,—এদিকে সুযোগ বুঝিয়া মায়াবী দারিদ্র্য-রাক্ষসকর্ত্তৃক আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী অপহৃতা হইয়া কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে নীত হইয়াছে কে জানে! লক্ষ্মীছাড়া আমরা তাই আজ উন্মত্ত অন্ধ-তাণ্ডবে চীৎকার করিতেছি,—অকাল—অকাল!

ঠিক্ এমনই একটি দিনে,—এমনই নির্ম্মল গগনে-পবনে, বর্ষাবিধৌত এমনই স্নিগ্ধ শারদ-প্রকৃতিবক্ষে এক অকালের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যখন নৃপকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র কুচক্রে পতিত হইয়া রাজৈশ্বর্য্য পরিহার পূর্ব্বক দীনবেশে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সীতা দেবীকে হারাইয়া সুগ্রীব সহায়ে মহাসঙ্কট-সঙ্কুল সমুদ্রপারে দুর্গম রাক্ষসপুরীতে সীতাউদ্ধারের জন্য ভীষণ সমরের অবতারণা করেন; পরিশেষে দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াও রাক্ষস-রাজ রাবণ বধে অকৃতকার্য্য হইয়া মহাব্যসনে অভিভূত হইয়া পড়েন। অকালের সেই পূর্ণপ্রকোপ-মুহূর্ত্তে, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা স্বর্গীয় দেবদূতবেশে, অকালে কালভয়হারিণী আদ্যাশক্তির উদ্বোধন করিয়া রাক্ষসবধশক্তি লাভের উপদেশ প্রদান করেন। তদবধি—

'বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনম্।'

চলিয়া আসিতেছে। উদরে অন্ন নাই, দেহে সামর্থ্য নাই,—বিশুষ্ক অধরকোণে ক্ষীণ হাসির রেশটুকু ফুটাইয়া দিয়া বিজলী-ঝিলিকের মত একটি ক্ষণিক আনন্দ-প্রবাহ তদবধি প্রতিবর্ষে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাহৃদয়ে সাড়া দিয়া যাইতেছে; কিন্তু হায় আর কত দিন?—

কত দিন আমরা বোধন-মন্ত্রের পুঁথিগত কীটদষ্ট বর্ণমালার সংযোজনা করিয়া বিদ্যুন্ময়ী শক্তিবীজের উদ্ধারপ্রয়াসী হইব? কোন্ বিধাতাপুরুষ স্বয়মাগত হইয়া আমাদের কর্ণকুহরে প্রণবপুটিত শক্তিবীজ ফুৎকারিয়া দিবে,—আর দৈবতেজা আমরা ধীরোদাত্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিব—

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা॥'

আর না। আর আমরা ব্যর্থ-প্রয়াসে উন্মত্তবৎ ইতঃভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইব না; আত্মশক্তি জাগরণে পরাঙ্মুখ হইয়া অংং পূজার বাহ্যাড়ম্বরে—

'শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥'

বলিয়া মহাশক্তিমাহাত্ম্যের অপচয় করিব না। আজ হৃদয়ে-হৃদয়ে প্রেমামৃতপূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া সহস্রদল-কমলে মাতৃমূর্ত্তির আবাহন করিব। নহবতে প্রভাতী গাহিবে;—

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে।'

অবাঙ্মনসগোচর নহে, মা যে আমাদের গৃহে-গৃহে বিরাজমানা! শক্তিরূপিণী জননী-গণের কঙ্কণ-ঝঙ্কারে যতদিন না ইঙ্গিত করিবে—আনন্দ-ময়ীর আনন্দ-কুটীর কোন্ গুহায়, শক্তি-রাণীর সহযোগিনী শক্তি-প্রেরণায় যত দিন না প্রসুপ্ত ব্রহ্মবস্তুর উদ্বুদ্ধ হইবে, বাহ্যিক ধ্যান-ধারণা, যন্ত্র-মন্ত্র, সাধন-ভজন ততদিন সমস্ত নিষ্ফল, সমস্ত নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিচিত্র বিলাস ব্যসনে পদে ঠেলিয়া—কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, কান্তি ও শান্তি-রূপিণী মাতৃ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা না করিয়া—

'জটাজুটসমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং'

শক্তিমূর্ত্তি আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে উদ্বোধনের কল্পনাও বৃথা!

এস অনন্যচিত্ত, অনন্যহৃদয়, অনন্যকর্ম্মা শক্তিউপাসক,—এস হে নবতান্ত্রিকের পূর্ব্বসাধক,—শক্তিবোধনের বেদাচার্য্য! আজ আমরা এই অকাল-বোধনের শুভ আমন্ত্রণ অধিবাসে আমাদের প্রাণের ক্ষণিক উত্তেজনা, ভোগ-বাসনার উদ্দাম লিপ্সা বিসর্জ্জন দিয়া

ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহসে, অকুণ্ঠ স্থির চিত্তে গৃহে-গৃহে মাতৃমূর্ত্তির আবাহন করি। বাহ্যাড়ম্বরের তুমুল আয়োজন এ বোধন-প্রক্রিয়ার অঙ্গ নহে—ইহার প্রধান উপচার—বিবেক-গন্ধ প্রীতি-পুষ্প, নিষ্ঠা-ধূপ, জ্ঞান-প্রদীপ, আত্মবোধ-নৈবিদ্যসম্ভার থরে থরে সাজাইয়া মোহ-মহিষাদি বলি-দান পূর্ব্বক ধায়োমশোণিতসিক্ত রক্তজবা মাতৃপদে অর্পণ করা। আজ গৃহে-গৃহে শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্ত্তির অর্চ্চনা হউক, পুরুষ প্রকৃতির নবসম্মিলিত রক্তস্রোত উজান বহুক, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এক হইয়া নবশক্তির দর্শন স্পর্শন ও প্রেমামৃত-রসাস্বাদন করুক, আর সম্মিলিত কোটী কণ্ঠে ধ্বনিত হউক— 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তবাপরা পরোক্তিঃ॥'

অকাল ফুটিবে, হাহাকার মিটিবে, অশিব বিনাশ হইবে। নির্জ্জিত দ্বিসপ্তকোটীভুজে অপূর্ব্ব তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারে অপরাজিতার চরণে অর্ঘ্য দান করিয়া কৃতার্থ হইব। শক্তি-মণ্ডপে বিজয়-শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। এ পূজায় আবাহন আছে—বিসর্জ্জন নাই, আগমনী আছে—বিজয়া নাই! অনাবিল প্রেমের আনন্দ-প্রশস্তি বন্ধনই এ পূজার পূর্ণ-অঙ্গ!—আর—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

ইহাই প্রণাম মন্ত্র!

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

ভুল-ভাঙ্গা।

—:o:—

(১)

জমীদার পুত্র সুকুমার ছেলেবেলা হইতেই নামে এবং কাজে সুকুমারই ছিল। সে কলিকাতা থাকিয়া কলেজে বি-এ পড়িত। বি-এ পড়িবার সময় বিয়েটা তার বাকী ছিল না। বাঙ্গলার বর—জমীদারের ছেলে,—কন্যার পিতার হাত এড়ান সহজ নয়। সুকুমারের স্ত্রী সুহাসকে পাইয়া শ্বশুর শাশুড়ী একবাক্যে বলিলেন 'এমন বৌ আর হয় না।' এমন তর।

আনন্দে এক বৎসর যাইতে না যাইতে বিধাতা পুরুষ সুকুমারের পিতার জীবন-ডোর কাটিয়া দিলেন,—হরপ্রসাদ সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতার মহাপ্রস্থানে সুকুমারের জীবনের আশা ও কল্পনার শেষ হইল গেল—তাহাকে বুঝিতে হইল তাঁহাকেও খেলাধূলা ছাড়িয়া আর একটা গদ্যময় জীবন ভোগ করিতে হইবে।

যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া গুরুজনের আশীর্ব্বাদ লইয়া সুকুমার বি-এ পড়িতে কলিকাতা চলিয়া গেল। দুই বৎসর সে বাড়ী গেল না, এই দীর্ঘ দুই বৎসর সহপাঠী বন্ধু নীরদের সঙ্গে নিরিবিলি পড়াশুনা করাই তার জীবনের চরম আনন্দ হইয়া উঠিল। প্রত্যেক ছুটীতে বাড়ী হইতে মা ও স্ত্রীর বাড়ী যাইবার সনির্ব্বন্ধ তাগিদ আসিত,—সুকুমার জবাব দিত, পরীক্ষা না দিয়া সে বাড়ী ফিরিবে না।

(২)

একদিন দুপ্রহরে পাড়ার শ্বশুর শাশুড়ীর নিন্দা লইয়া সুহাসের নিকট সমবয়সী এক সই আসিয়া জুটিল। এ-কথা সে-কথার পর যা'র যা'র স্বামীর কথা উঠিল। বলা বাহুল্য স্ত্রীলোকেরা পরস্পর পরস্পরের স্বামীর সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে ভালবাসে,—এবং ঐ সঙ্গে স্বামীর মার একটু নিন্দা করিয়া আলোচ্য বিষয়ের চাটনী যোগায়। নানা রকমের কথা হইতে হইতেই নীরদের এক পত্র আসিল, নীরদ সুকুমারের আবাল্য প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী,—একত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিত। তাহাতে সে লিখিয়াছে ;—

"বউদি, সুকুদাকে পত্র দিতে দিতে হয়রাণ হ'য়েছ বলেই মাঝখান থেকে আমি হতভাগা এক পত্র পেয়ে গেলাম। সুকুমারদাকে বাড়ী যেতে আমিও খুব তাগিদ দিচ্ছি,—সে সুকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ না হয়ে যাবে না বলছে। যা হোক পূজার সময় অবশ্যই তাকে পাঠাব, ভেবো না। তিনি আজকাল শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোকের ভারি ভক্ত হয়েছেন,—তার 'মেজদির' সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমায় ভুলেছেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী "নীরদ।"

দুই সখী পত্র পাঠ করিয়া কতক বুঝিল কতক বুঝিল না।

সুহাসিনী বলিল "নীরদবাবুর 'চিঠিতো না এ হেঁয়ালী, বরাবর মনের কথা চেপে রেখে কলম চালায়।"

সই এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দেখ সুহাস্ রাগ করিসনে, সুকুমার ভাল ছেলে কিন্তু কলিকাতার কোন চট্টোপাধ্যায় বাড়ী যাতায়াতে চিঠি লেখাও শেষ বন্ধ করেছে—আমি তো ভাল বুঝছি না, আমার ভাসুরের মুখে শুনেছি কলিকাতায় ৮০ লক্ষ লোকের বাস, একবার একজন লোক ছেড়ে দিলে আর খুঁজে বের করা দায়। আমার বিশ্বাস কোন মন্দ পথে"—ঢোক গিলিয়া বলিলেন "নইলে দেখ না—নইলে ও লিখবে কেন। সে তার মেজদির সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমাকে ভুলেছে।"

কথা কয়েকটি তপ্ত লৌহের আগার মত সুহাসিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল—কি বিশ্রী কথা,—তাহার দুই গণ্ড বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "ভাই তুই এখন যা, ছিঃ এমন সর্ব্বনেশে কথা বলতে আছে?" অগত্যা সখী বিস্মিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে গেল, যে এ কথায় সুহাস এমন করিয়া কাঁদে কেন? তার স্বামী কতদিন মদ খেয়ে লাথি মেরেছে কত কুব্যবহার করেছে, কৈ তার মনে এমন ভাব তো কোন দিন হয় নি। বৎসর বৎসর স্বামীর কাছ থেকে ফর্দ্দ মত গহনা পেয়েই সে সুখী!

—কিন্তু হায় সুহাসের তো তা নয়, গহনার তুচ্ছ সপ্ন তো তার ধ্যান নয়, তার সবই যে স্বামী! স্বামীর নিন্দা শুনিবে, স্বামীকে অবিশ্বাস করিবে, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবে ইহার অপেক্ষা যে তার মরণও ভাল। মনে মনে সুহাসের যতই পবিত্রতা থাকুক না কেন, সখীর টাট্‌কা ইঙ্গিত তখনও তার মনের তলায় আঘাত করিতেছিল,—"তাঁর মেজদির সঙ্গে ভাব কর্ত্তে তোমায় ভুলচেন!"

আর ভাবিতে পারিল না,—মনে মনে বলিল "হায় ভগবান শেষে এই করলে!"

সংসারের প্রায় লোকেরই দুই একটি এমন ব্যথাভরা গোপন কথা থাকে, যাহা নিজে সহ্য করিতে পারা যায় না অপরের নিকট প্রকাশ করাও চলে না। সুহাসিনীরও তাহাই হইল—সে নীরবে দিনগুলিকে কোন মতে কাটাইতে লাগিল।

(৩)

পূজার আর এক মাস বাকী, পূর্ব্ব হইতেই সুকুমারের মা তাহাকে বাড়ী আসিতে জিদ্ করিতে লাগিলেন, "মাথা খাও" 'না খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব' 'মরা মুখ দেখিবে' প্রভৃতি কথা লিখিতেও ছাড়িলেন না,—এবং নীরদকে সঙ্গে আনিবার জন্য সে চিঠিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ছিল।

চিঠি পড়িয়া সুকুমার হাসিয়া মাকে পত্র লিখিতে বসিল,—

মা, কিছুই করিতে হইবে না, ১৫ই তারিখে বাড়ী রওনা হইব—ভাবিও না, নীরদকে এত বলিলাম সে যাবে না।" ইতি— সেবকাধম—সুকুমার—

সুকুমারের আসিবার আর দিন দশেক বাকী আছে, এমন সময় ৮ দিনের জন্য সুকুমার অন্য একটি বন্ধুর বাড়ী গেল, ইচ্ছা যে সেখান হইতে নির্দ্দিষ্ট দিনে বাড়ী আসিবে।—নীরদ সেই দিনই তল্পী বাঁধিয়া একেবারে পাপপুণ্যের লীলাভূমি কাশীতে গিয়া হাজির হইল, সঙ্গে ছোট্ট একটি বিছানা ও খান কয়েক উপন্যাস লইল মাত্র। ইচ্ছা বন্ধটা কাশীতেই কাটাইয়া যাইবে। কাশী পৌছাইয়া নীরদ সুকুমারকে এক পত্র দিল,—

প্রিয় সুকুদা,—

সম্ভব এতদিন পৌঁছে গেছ। বউদি তো দীর্ঘ দেড় বছর পরে তোমায় পেয়ে স্বর্গ হাতে পেয়েছেন। যাক 'প্রেমকা ব্যথা প্রেমিকা জানে' এখন আমার গোটা দুই কথা। 'বামুনের মেয়েটা' হঠাৎ বাসা থেকে গেল কোথায়? ভেবে চিন্তে মনে করলেম এ তোমার কাজ। শেষে যতীশও বল্লে সে তোমাকে নিয়ে যেতে দেখেছে। ছিঃ বামুনের মেয়েটি একেবারে মজালে। যার মেয়ে সে শুনলে কি ভাববে। বয়স হয়েছে—এত বড় মেয়ে নিয়ে উধাও, ছিঃ।

শুভাকাঙ্ক্ষী—"নীরদ"—

সুকুমার যখন অন্য একটি বন্ধুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত ইতঃবসরে চিঠিখানা সুকুমারের বাড়ী যাওয়া—সুমাসের হাতে পড়ায় বিভ্রাটের শেষ অধ্যায়ও আরম্ভ হওয়া। সুহাসিনী আহারে বসিয়াছিল, হাতের ভাত রাখিয়া উঠিয়া পড়িল, কাঁদিয়া কাটিয়া শ্বশ্রূমাতাকে সকল কথা জানাইল। তখন পূজা উপলক্ষে নহবৎএর সানাই সন্ধ্যায় পূরবী ঢালিয়া দিয়া পূজার করুণ উৎসবের ইতিহাসটা আনন্দ ও বিষাদ মণ্ডিত করিয়া মানবের মর্ম্মতলে জ্ঞাপন করিতেছিল। লোকজনের কোলাহল, সমবয়সীর উৎসব আনন্দ এক সঙ্গে সব বন্ধ হইল, পাড়ার মেয়েমহলের বিরাট পার্লামেণ্ট তখনই বসিয়া গেল। 'কোন পুরুষ কোথায় চরিত্র হারাইয়াছিল' 'কোন স্ত্রী কেমন কৌশলে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছিল' ইহারই একটা গোপন ইতিহাস ইহকাল হইতে পরকাল পর্য্যন্ত নানা ভাবে ব্যক্ত হইতে লাগিল। এমনি ভাবে পূজাটাকে সকলে মিলিয়া খুবই নিরানন্দ করিয়া তুলিল।

(৪)

রাত্রি ১০টা, শারদচন্দ্রালোকে সুকুমারের ক্ষুদ্র প্রিয় জন্মভূমি দৃষ্টিপথে পতিত হইতেই স্নেহময় পিতার অভাব তার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। চখের পাতা ভিজিয়া আসিল। সে আবেগ-কম্পিত বক্ষে বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিতে বৃদ্ধ সরকার রামকানাই আসিয়া অভিবাদন করিল, কোন কথা বলিল না।

সুকুমার হাসিয়া বলিল "কি সরকার মশাই সব ভালতো?"

সরকার হাঁ না হাঁ না করিয়া—কি বলিল কিছুই বোঝা গেল না। উদ্বেগ ও আনন্দ লইয়া বাড়ীতে পা দিতেই মা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, মৃত কর্ত্তার নাম ধরিয়া অনেক কি সব বলিলেন। মোট কথা কর্ত্তাও আসিলেন না, মাও মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, স্ত্রীও ঘরের দরজা খুলিলেন না। ব্যাপার কি কিছু বুঝিতে না পারিয়া সুকুমার দ্রুত গ্রামসহচর মহেশের বাড়ী চলিয়া গেল। সুকুমারের বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা বিশ্রী

কান্নার শব্দ উঠিল যে গ্রামের সমস্ত লোক এই মনে করিয়াই ছুটিয়া আসিল যে চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী নিশ্চয়ই এই মাত্র কাহারও প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

মহেশের বাড়ী পশ্চিম পাড়ায় সে খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় সুকুমার গিয়া হাঁক দিল "মহেশ, মহেশ!" মহেশ খাওয়া ফেলিয়া একেবারে সুকুমারের গলা জড়াইয়া ধরিল, "বাঃ তুমি কখন এলে?"

কোন কথা না বলিয়াই সোজা সুকুমার বলিল—"মহেশ বল্‌তে পার আমাদের বাড়ী সবাই কাঁদছে কেন,—সব বেঁচে আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমায় দেখে বিশ্রী কান্না।"

মহেশ বিস্মিত হইয়া গেল, কোনই কারণ বলিতে পারিল না। সে রাত্রে সুকুমার মহেশের বাড়ী আহার করিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রে একবার মহেশ সুকুমারকে বলিল। "আচ্ছা তোমার বৌ এদানিং তোমায় পত্র দিত?"

"হ্যাঁ বেশ রঙ্গ রহস্য করেই পত্র দিত। আজ দেড়মাস তার পত্র পাই নি,—তখন আমি এক পত্র দিয়াছিলাম।—"সুহাস তোর জন্য কি আন্‌ব জানাস্‌।"

সুহাসিনী তার জবাবে লিখেছিল—"একজন জাবন্ত সুকুমার।"

বাস্‌—আর কোন পত্র নাই।

পরদিন প্রভাতে সঙ্গে সঙ্গে মহেশ সুকুমারের স্ত্রীকে খুব শক্ত করিয়া ধরিল। সুহাসিনীকে ঘাঁটিও না বলিয়া নীরবে মহেশের হাতে দুইখানি পত্র গুঁজিয়া দিয়া ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া অসার হইয়া শুইয়া পড়িল।

রাস্তায় আসিতে আসিতে মহেশ পত্র দুইখানি দুই তিন বার করিয়া পাঠ করিয়া মনে মনে ভাবিল অসম্ভব, অসম্ভব সুকুমারের মত মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

পত্র দুইখানি আবেগ কম্পিত বক্ষে সুকুমারের হাতে দিতেই সুকুমার খানিকক্ষণ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া একেবারে গম্ভীর হইল,—তখন রাগে অভিমানে সে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। একবার মনে মনে বলিল "ওঃ—এই জন্যে গ্রামশুদ্ধ লোকের কাছে আমার অপদস্থ করা?"

তখনই নীরদের কাছে কাশীর ঠিকানায় এক তার করিল।—

"আমি মরতে বসেছি, বিলম্ব করিলে দেখা হইবে না।"

টেলিগ্রামখানা যথাবিহিত ভৃত্যের হাতে দিয়া সুকুমার একখানা সাদা চাদর টানিয়া আপাদ মস্তক ঢাকিয়া মহেশের বিছানার পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। সুকুমারের হাসি এবং গাম্ভীর্য্য মহেশ কিছুই বুঝিতেও পারিল না কোন কথা আবার বলিতেও পারিল না।

বিকেলে জন কয়েক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া আনিয়া বাড়ীর সরকার মশাই বাবুকে আসিয়া অনেক বুঝাইল, "বয়স দোষে সবই হয় যা হইবার তা হইয়াছে, এখন নিজ বাড়ীর পূজা, আপনি বাড়ী আসুন।" সুকুমার কোন কথা বলিল না বাড়ীও গেল না। যাঁহারা লইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া যাইয়া সদ্য বলিদানের মহাপ্রসাদ খাইতে বসিয়া গেলেন।

(৫)

আজ বিজয়া। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পূজার দিনগুলি বিষাদমণ্ডিত হইয়া একটা ক্ষীণ উৎসবের রেখা টানিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। গ্রামের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এইদিনে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জনে যাইয়া থাকেন ইহাই এ বাড়ীর পূর্ব্বাপর নিয়ম। আজ গ্রামশুদ্ধ লোক আহারে বসিয়া বাড়ীর মালীক সুকুমারের চরিত্র লইয়া খুব আলোচনা করিতেছেন। গ্রামে যাহাদের বাড়ী, তাঁহারা জানেন আহারের সময় কাহারও নিন্দা-চর্চ্চা না হইলে গ্রাম্য প্রীতিভোজ সুনির্ব্বাহ হয় না।—সবাই সুকুমারের নিন্দায় মহামায়ার প্রসাদ পাইতেছেন। যে এই সব অনাচারের প্রতিবাদ করিত সে মহেশ,—সে সুকুমারকে লইয়া এ তিন দিন ঘরের বাহিরও হয় নাই।

বৃদ্ধ ত্রৈলক্য মুখুজ্যে কুলীনের শ্রেষ্ঠ। ৫৬টি দারপরিগ্রহ করিয়া নরকের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যের পরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তিনিও সেদিন সন্দেশের টুকরাটুকু ভাল করিয়া গলার নীচে নামিতে না নামিতে বলিয়া উঠিলেন,—

"হেঃ! সুকুমার,—ছোঁড়াটাকে ভাল বলে জানতেম, ছোঃ ছোড়া এমন বিগড়ে গেল—আমি জানতেম না বুঝলেন গিরিদা,—

এই কানসারা নড়ে চোখ মিট্ মিট্ করে,—
সেই বাঘেই মানুষ মারে।"

হেঃ চরিত্রবল যা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যা ডাকাতে নিতে পারে না আগুনে পোড়ে না—তাই কি না—হেঃ—একেবারে কালকাল"—

এমন সময় সেই কথাটিকে বাধা দিয়া বজ্রপতনের মত ক্ষুদ্র সভাটিকে চমকিত করিয়া তুলিয়া মহেশ বলিয়া উঠিল,—

"হাঁ মুখুজ্যে মশাই কলিকালই তো,—ঘোর কলি—নইলে যে লোকটি মরণের পথে যেতে যেতে ৫০টি স্ত্রীলোকের গলায় দড়ি দেবার ব্যবস্থা করেছেন তাকে এনে সমাজে এক সঙ্গে খায়? মানুষ একটি নিয়েই অস্থির—আর আপনি এতগুলি নিয়েও স্থির, বীর বটে! কুলীনের মুখোস প'রে কোন্ ধর্ম্মে কোন্ যুক্তিতে এই ৫০টি নারীর বৈধব্যের ব্যবস্থা করেছেন? আবার উঁচু গলায় কথা কৈছেন; লজ্জা করে না?"—মহেশ আর কি বলিতে যাইতেছিল সকলে সমবেত ভাবে বাধা দিয়া বলিল,—

"ওহে ছোক্‌রা থাম না, ব্যাপার কি? অমন চেঁচাচ্ছ কেন?"

এমন সময় দ্বিতীয় ঝড়ের মত নীরদ প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল—

"ও বেচারা অমন চাঁচাচ্ছে কেন শুনবেন?—স্নকুমার চক্রবর্ত্তী পরলোক গমন করেছেন বলে—আপনারা যে সবাই আনন্দ করে তার আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাচ্ছেন, মহেশ আপনাদের কাছে বল্‌তে চায়—যে স্নকুমার বাবু মরেন নি। বেঁচে আছেন।"

মহেশ বলিল,—"নেঃ রাখ তোর হেঁয়ালী, একবার হেঁয়ালী চালিয়ে তো সর্ব্বনাশ করেছিস্—আবার বুঝি তাই স্নরু করলি।"

তখন নীরদ স্নকুমারের মা ও বৌকে ডাকাইয়া আড়ালে আনিল।—তারপর উঠানের মাঝখানে খুব জোরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল।—

"আপনারা সবাই এমন মূর্খ তা জানতাম না। একজন লোককে সারাজীবন ভাল সচ্চরিত্র সরল জানা সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা কেউ বিচার করা বা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করলেন না। ব্যাপার কি শুনুন।

"প্রথম, স্নকুমার দার স্ত্রী আমাকে স্নকুমার সংবাদের জন্য এক পত্র দিলে।—তার উত্তরে আমি তাকে পত্র দিই তাতে শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলে বাঙ্গালার একজন বড় সাহিত্যিক তার একখানা বই আছে নাম তার মেজদিদি। স্নকুমারদা তাই তখন পড়ছিল আমি একটু রঙ্গ করে সেই কথাটাই লিখেছিলেম।"—তারপর—

দ্বিতীয় পত্রখানাও তাই—আমি কাশীতে কয়েকখানা উপন্যাস পড়বার জন্য সঙ্গে নি—তার ভেতর শরৎ বাবুর "বামুনের মেয়ে"—বইখানা ছিল। বুঝলেন মুখুজ্যে মশাই, কেচ্ছা ছাপার হরফে বেড়িয়েছে।—সেই বইখানা সুকুদা পরবে বলে বাড়ী নিয়ে আসে।—তাই তাকে রঙ্গ করে এই পত্রখানা দিয়েছি। সবাই—পাড়াগাঁয়ের ভূত চিঠী বুঝবে না অথচ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে সেই কাশী থেকে আমায় পাকড়াও করতে পার। ধন্য বউদি নিজের এমন ভোলানাথ স্বামী,—সবার চেয়ে তুমি তো তাকে ভাল জান—লেখা পড়া জান না,—"কেন বন্ধুর চিঠিপত্রে হাত দিতে গিয়েছিলে,"—বলিয়াই মহেশের হাত ধরে একেবারে তার বাড়ী গিয়ে হাজির।

সকলেই চুপ, সবাই অবাক,—সবাই এমন লজ্জিত যে আর মুখ তুলিয়া চাহিবার কারও শক্তি ছিল না। মা বলিলেন "বধূর দোষ"। বধূ বলিলেন "সই আমার মনে আগুন জেলেছে" নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বলিলেন "স্ত্রী জাতের বিশ্বাস নেই—ওঁরা সব পারেন। যেখানে মেয়ে কর্ত্তা সেখানে আমাদের এত হল্লা করা ঠিক হয় নি।"

(৬)

সুকুমারের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে মহেশের বাড়ী যাইয়া-তিন বন্ধুকে বাড়ী আনিলেন। সকলেই সুকুমারের সঙ্গে তানা না না করিয়া আপোষ করিল। বিপদ যত সুহাসিনীর। নীরদ তাহার পক্ষ হইয়া অনেক কথাই বলিয়া রাখিয়াছিল———রাত্রে "দুর্গা প্রীতে হরি হরি বোল" বলিয়া সকলে যখন ফিরিয়া—আসিল।—তখন সুকুমার জননীর পদে নত হইয়া শুইতে গেল।

খানিক পরেই পাশের দরজাটা একটু নড়িল, একটু আবার নড়িল—আবার—তার পর সুহাসিনী তাহার কম্পিত দেহখানি কোনমতে ঘরের ভেতর প্রবেশ করাইয়া দিল, তাহার বসনখানি চখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে, অপরাধীর মত ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। সুকুমার বুঝিল প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে।

সে বলিল "আজ কাঁদতে নেই! আমায় প্রণাম করলে না সুহাস,—আজ যে বিজয়া।"

স্তম্ভিত সুহাসিনী অবাক; এই তো সেই শান্ত স্বর সেই দেবতার মত নির্ম্মল চরিত্র স্বামী-দেবতা। কি পবিত্র দেবমূর্ত্তি! অমনি দুহাতে তার দুটী চরণ মস্তকে স্পর্শ করিতেই

সুকুমার তাহাকে নিজের বক্ষে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "ভাল আছ।" কম্পিত কণ্ঠে সুহাসিনী বলিল "ছিলাম না এখন আছি।" কতক্ষণ নীরব! উভয়ের মুখে কথা নাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুকুমার বলিল "কি ভাবছ সুহাস!"

"ভাবছি মার পূজা এবার আমার সার্থক—মাটীর ভোলানাথ আজ আমার মাকে নিয়া গিয়া আমায় সত্যিকারের ভোলানাথকে দিয়ে গেলেন।" বলিয়াই সুহাসিনী আবার স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

এমন সময় পান মুখে দিয়া বাহির বাড়ী শয়নের উদ্দেশ্যে যাইবার কালে নীরদ চেঁচাইয়া বলিয়া গেল "সাবধান বৌঠান, চরিত্রহীন স্বামীকে ক্ষমা করো না।"

দীর্ঘ বিরহের পর এ মধুর মিলন বর্ণনার বিষয় নয়—শুধু এই কথাটি বলিতে চাই;—আমার সহৃদয় পাঠকপাঠিকা সবাই দয়া করিয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য সাহিত্য সম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়া পাঠান যে আপনি আর বই লিখিয়া নিজে নামকরণ করিবেন না,—কারণ আপনার পুস্তকে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিতে সুরু করিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

শোক-সংবাদ।

এ মাসেও আর একটি মহাপ্রস্থানের সংবাদ। 'সন্দেশে'র সর্ব্বজনপ্রিয় সম্পাদক, প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, সুরসিক কবি, শিশু-সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত সুকুমার রায় বিগত ২৫শে ভাদ্র সোমবারে অকালে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অনন্যকর্ম্মী ও অটল-ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন; প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া তিনি দুরারোগ্য কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন—কিন্তু এই ব্যাধি তাঁহার দেহকে জীর্ণ শীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহার মনের অমিত বলকে একটুও ক্ষীণ করিতে পারিয়াছিল না,—তিনি রোগশয্যায় পড়িয়াও সন্দেশের জন্য নিয়মিত কবিতা ও ছবি আঁকিয়াছেন। বড় ভালবাসিত ছেলেরা তাঁর কবিতা,—সন্দেশ পৌঁছবামাত্র তাঁর কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া গৃহ মুখরিত করিত। সন্দেশের প্রতীক্ষায় ব্যগ্র শিশুরা আজও সন্দেশ কেন আসিতেছে না জিজ্ঞাসা করায়,—সন্দেশের সম্পাদকের মহাপ্রস্থানের কথা তাহাদের জানাইলে—তাহাদের ক্ষোভ দুঃখের সীমা নাই,—এতগুলি শিশুর পবিত্র হৃদয়ের অনাবিল আন্তরিক ভালবাসা সেই মহাপ্রেমিকের ক্রোড়স্থ সুকুমারকে নিশ্চয় শান্তিদান করিয়াছে। মুক্তাত্মার স্বর্গসুখ ও পার্থিব যশঃ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের একমাত্র সান্ত্বনা। গুণে আজ সুকুমার অমর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৭ম বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল। { ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কবি ও বাজীকর।

সভার মাঝারে দেখাইছে খেলা
সঙ্গীত-বাজিকর,
স্তম্ভিত সবে, অপলক আঁখি,
কম্পিত থর থর!—
উঠিছে নামিছে ছন্দঃ রাগিণী,—
শ্বসিছে ফুঁসিছে ক্রুদ্ধা নাগিনী,
শ্রবণ-বিদারী বংশীবাদন
মুখরিছে খেলাঘর!

হেথা তোর ঠাঁই নাই ওরে কবি,
সরে আয়, সরে আয়
বুকের আড়ালে লুকাইয়া বীণা
দাঁড়া দূর নিরালায় ;—
ঝঙ্কারি' সুর নদী-কল্লোলে,
বিথারি' ছন্দঃ বায়ু-হিল্লোলে,
প্রাণ হ'তে গান বাহিরিয়া আসি
ছেয়ে যাক্ নীলিমায় !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

রক্তাম্বরা।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নৈশ আর্ত্তনাদ।

আমার লুকাইবার জায়গা হইতে আমি মেজরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার আগমনে কোন শুভ ইচ্ছা নিশ্চয়ই নাই। সে একমনে সকলকে একবার দেখিয়া তারপর আবার বাগানের ভিতর মিলাইয়া গেল। তাহার গতিবিধির উপরি দৃষ্টি রাখিতে কৃতসংকল্প হইয়া আমি তাহার সঙ্গ লইলাম, দেখিলাম একটি ছোট আন্ধকার হোটেলে সে ঢুকিয়া পড়িল। খবর লইয়া জানিলাম, সে দুদিন হইতে ওই হোটেলে আছে। কিন্তু ব্যাপার সহজ নয়, আমায় দেখিলেই সে চিনিয়া ফেলিবে। আর আমার স্ত্রী, রেজেষ্ট্রি আফিসে মেজরকে যখন বাবা বলিয়া পরিচয় দিয়াছে তখন সেও এই ষড়যন্ত্রের ভিতর আছে। কিন্তু

তারও জীবননাশের ত ভয় ছিল। সব আবার গোলমাল বোধ হইল। যাহা হউক মেজর আবার কেন আসিল, জানিতে হইবে। তার কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা হইতে যদি এরহস্যের কিছু কিনারা পাই। আমি গরীব চাষার পোষাক যোগাড় করিয়া পরিয়া মেজরের বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রায় রাত ৯টার সময় আমার আশা পূর্ণ হইল। মেজর ধীরে ধীরে জমিদার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আমিও পিছনে পিছনে চলিলাম। সে বাগানের কাঠের বেড়ার ভিতর একটা ভাঙ্গা জায়গা দিয়া ভিতরে ঢুকিল। লোকটা তাহ'লে জানে যে এখন সদর দরজা বন্ধ। হয় ত সে নিজেই এ জায়গাটা ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছিল। আমিও সেইখান দিয়া ঢুকিলাম। মাঝে মাঝে শুকনো পাতা ও ডাল ভাঙ্গার শব্দে মেজর কোন দিকে যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছিলাম। রাত্রি নিস্তব্ধ। অতি সামান্য একটু শব্দও অতি স্পষ্টরূপে শোনা যাইতেছিল। আমার ভয়ের অন্ত নাই কিন্তু তবুও সাহস করিয়া মেজরের পিছনে পিছনে বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িলাম। বৈঠকে তখন নাচগান চলিতেছিল; বাড়ীর সম্মুখে দুজন লোক বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারাও একটু পরে ভিতরে গেলেন। আমি ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। একদিকে পর্দ্দার আড়ালে মেয়েরা, অন্যদিকে ছেলেরা। কিন্তু আমার স্ত্রীকে কোথাও দেখিলাম না। বেশীর ভাগই ধনবান লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাঁদের বাড়ীর মেয়েদের পোষাকও খুব জমকালো। এ সব নাচগান আমার একটুও ভাল লাগিল না। আমার স্ত্রীর এ সবের দিকে তেমন আকর্ষণ নাই জানিয়া বড় আশ্বস্ত হইলাম। হঠাৎ পাশেই পায়ের শব্দ পাইলাম আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে সরিয়া আসিলাম। দেখিলাম লোকটি কিছু অনামনস্ক। একটু সামনে ঝুঁকিয়া চলেন। তিনি নিজের পথে সোজা চলিয়া গেলেন। প্রায় একঘণ্টা হইল আমি বাড়ীর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পাছে আবার কেউ আসে সেই ভয়ে আমি আবার বাগানে ঢুকিতে যাইব এমন সময়ে দরজায় একজন ফিকে গোলাপী রেশমের কাপড় পরা যুবতীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া ছায়ায় সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি যেন কারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন শেষে বাগানের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমিও পুকুরঘাটের পাশ দিয়া চলিলাম। ঘাটের সামনা সামনি আসিতে কার মৃদু আর্ত্তনাদধ্বনি কানে গেল। রাত্রিতে কতরকম আওয়াজের বিকৃতি হয় ভাবিয়া আমি আর দাঁড়াইলাম না। ঘাটের সামনে তক্তকে পরিষ্কার জল

খক্ খক্ করিতেছে কিন্তু স্বরটা মানুষেরই বলিয়া বোধ হইল। যাই হউক আমি একটা আলের কাছে আসিতে আবার কাহার কথা বলবার স্বর কানে গেল। আলের পাশে কলাবন আমি তাহার ভিতর ঢুকিলাম। কলাবনের মধ্যে সরু ফালি জায়গায় কাহারা কথা বলিতেছিল—আমি আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। তারপর দুজনের পোষকে দেখিতে পাইলাম,—ঈষৎ গোলাপী রংএর পোষাক পরা একজন মেয়ে আর অপর জন পুরুষ। তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত গিয়াছে। তারই অস্পষ্ট আলোতে দেখিলাম পুরুষটি একটি গাছে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া। আর মেয়েটি তাঁর সামনে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

পু। ইচ্ছা করলে তুমি আরও আগে আস্‌তে পারতে। চারিদিকে এত লোক। বিপদের ভয় আছে। আমি একটি ঘণ্টা থেকে অপেক্ষা করছি।

যু। "আমি তোমার বারণ করেছিলাম আস্‌তে।" আমি আমার স্ত্রীর বীনাধ্বণির ন্যায় সুন্দর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

পু। "তা বটে।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল আর তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকেও চিনিলাম। এই মেজরদত্ত।

যু। হাসছ যে! বিপদ আমারই বেশী।

পু। মেয়েদের সঙ্গে পারবার যো নেই। দেখা করার দরকার না থাকলে তোমায় ডেকে পাঠাব কেন?

যু। বেশ এখন কি বোল্‌বে বল।

পু। বিশেষ দরকারী কথা আছে।

যুবতী ক্লান্তস্বরে বলিল "তোমাকে সাহায্য কোরতে হবে কেমন এই কথা ত? টাকা চাও?

পু। টাকা নয়। টাকা না হলে আমার চলে, আমি হাওয়া খেয়ে বাঁচতে পারি।

যুবতী বিরক্ত হইয়া বলিল "ঠাট্টা কোরছ? তোমার এ সাজে না। কারাগারের ভাত খাওয়ার চেয়ে হাওয়া খাওয়া ভাল বটে! কি চাই বল? এখনি ওঁরা আমার খোঁজ কোরবেন।"

পু। তোমার ভাবী স্বামী জানতে চাইবেন যে তুমি কার সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলে? কেমন? তা তুমি কিছু বুঝিয়ো আগের মতন। মিথ্যা কথা বলবার ক্ষমতাটা খুব কাজে লাগে। মিথ্যাবাদীদের আমি হিংসা করি তারা এমন সহজে সব বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

পুরুষ চিরপরিচিতের ন্যায় কথা বলিতেছিলেন। তাঁর কথার ভঙ্গীতে বুঝিলাম যুবতীর সহিত তাঁর ঘনিষ্টতা আছে।

যু। মিথ্যাবাদীদের আমি ঘৃণা করি কিন্তু শুধু তোমাকে রক্ষা করবার জন্য ক'বার মিথ্যে বোলতে বাধ্য হোয়েছি।

পু। সেটাতে তোমারও ভালই হোয়েছিল। কিন্তু পরস্পরকে এরকম করে প্রশংসা করবার জন্য আমি তোমায় ডাকিনি।

যু। কেন ডেকেছ শীঘ্র বল। শেষবার এসে বল্লে বিদেশে যাবে গেলে না কেন?

পু। গিয়ে ফিরে এসেছি।

যু। কোথায় গিয়েছিলে?

পু। তাতে তোমার কি! আমাকে ত আর আদর করে বাড়ীতে নেমন্তন্ন কোরছ না।

যু। শত্রুকে নেমন্তন্ন?

পু। আমি তোমার শত্রু? বেশ। আমি জানতাম আমি বন্ধু।

যু। বন্ধু! অপরূপ বন্ধুত্ব! কেবল ষড়যন্ত্র কোরতে আর আমাকে তোমার দূতী কোরতে বাধ্য করা।

পু। আরে চট কেন? সব কাজই ত দুজনের ভালর জন্যে করি।

যু। তা জানতাম না। আমার ভাল চাইলে এমন বিপদের মুখে আমায় তুমি ডেকে পাঠাতে না।

পু। দরকারের জন্য ডেকেছি। তোমাকে সাবধান কোরতে চাই। চিঠি লিখে ত আর তা পারি না।

যু। কেন সাবধান?

পু। জহুরা এখানে এসেছে। এই নামটী আমি আমার মৃত পত্নীর বালিশের তলায় এক টুকরা কাগজে লেখা পাইয়াছিলাম। বুঝি না কিছু ব্যাপার এমনি গুরুতর!

যু। গুরুতর? আরও কিছু ভয়ঙ্কর? আমি কি রকম কষ্ট পাচ্ছি তাত দেখ্‌ছ।

পু। কি কোরবে বল?

যু। কি কোরব জানি না। বছর ভর কেবল কি ক'রে জহুরার কবল থেকে রক্ষা পাব তাই ভেবে আমার অর্দ্ধেক রক্ত শুকিয়ে গেল। ইচ্ছে হয় গলায় দড়ী দিই।

পু। তা কেন? ছি! একটু চালাক হ'লে মেয়েরা সয়তানকেও প্রতারণা ক'রতে পারে।

যু। সত্যি বল্‌ছি বাঁচতে সাধ নেই। বেঁচে কোন লাভ নেই, মরলেও কারো লোকসান নেই।

পু। মরলে লাভ কি কিছু আছে?

যু। তুমি ত এখন ঠাট্টা করবেই। তুমিই আমাকে এই অন্যায় কাজে জড়িয়ে নিয়ে তোমার কুপরামর্শ শুনে চল্‌তে আমার বাধ্য কোরছ। আমি তোমায় প্রাণমনে ঘৃণা করি।

পু। নিঃসন্দেহ। আমি তোমার শত্রুতা কিন্তু কথনো করি নি।

যু। কর নি? অতীতের কথা ভুলে গেছ?

পু। যাক্ যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, এখন ভবিষ্যতের সুখের কথা ভাব।

যু। জহুরা এসেছে ত কি কোরতে বল তুমি?

পু। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

যুবতী ভগ্নস্বরে বলিল আমার মনে হয় আমি মরলেই সব চেয়ে, ভাল হয়।

পুরুষ ব্যগ্রস্বরে বলিল কি যে বল? তুমি পরমাসুন্দরী, কোন দুঃখে আত্মহত্যা কোরবে?

যু। বেঁচে কি লাভ?

পু। তুমি সতীশবাবুকে ভালবাস তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

যু। সতীশবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না।

পুরুষ সহানুভূতিপূর্ণ তরল কণ্ঠে বলিল "সতীশ তোমায় ত ভালবাসে।"

যু। ওসব কেন বোল্‌ছ?

পু। তোমার কি তাকে পছন্দ নয় ?

যু। তাতে তোমার কি ?

পু। সে তোমাকে বিয়ের কথা বলে না ?

যু। হাঁ, অনেকবার বলছেন।

পু। শেষ কবে বলেছিল ?

যু। আজই সন্ধ্যার সময় বোল্‌ছিলেন।

পু। তুমি করতে চাইলে না ?

যু। না।

পু। কেন ?

যু। কারণ মস্ত বড় বাধা আছে জান না তা ?

পু। সেইজন্য নিজের প্রাণ বাঁচাবার উপায় করবে না ?

যু। প্রাণ কি কোরে বাঁচবে ?

পু। সতীশের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেলে জহুরা আর তোমার কিছু কোরবে না।

যুবতী যেন একটু কিনারা পাইল, সে বলিল ওঃ! এদিক থেকে একথা কখনো ভাবি নি।

পু। বেশ আমার মতে সতীশকে তোমার বিয়ে করা উচিত। তাহলে নিশ্চিন্ত হবে।

যুবতী চুপ করিয়া রহিল। বোধহয় কথাটা ভাবিয়া দেখিতেছিল। তারপর বলিল "বোলছ বটে নিরাপদ হ'বো কিন্তু সব শত্রুর হাত এড়াতে পারবো না।"

পু। কেন ? কাকে ভয় ?

যু। তোমাকে।

পুরুষ বিরক্তিভরে বলিল "আমায় অবিশ্বাস কর না ?"

যু। আমাকে যে নিজের ইচ্ছাধীন রেখেছে তাকে আমি বিশ্বাস করি না।

পু। এত বিপদ মাথায় ক'রে তোমায় নিরাপদ কোর্‌তে এসেছি তা ভেবে দেখ।

যু। তার কারণ এই যে তোমার নিজেরও প্রাণের ভয় আছে।

পু। তা নয়। আমি দুটি পথ তোমায় বলে দি। এক সতীশকে বিয়ে করা। দ্বিতীয়—

যু। থামলে কেন ব'লে যাও।

পু। দ্বিতীয় আমার সাহায্য করা। আমি একটা মতলব এঁটেছি। তাতে আর জহুরার প্রতিহিংসা নেবার সা য হবে না।

যু। আবার মতলব। কোন্ কুকাজে সাহায্য চাই, যা কিছু পার আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও।

পু। কিছু খারাপ কাজ নয়। ওকে শুধু ঘাবড়ে দেওয়া।

যু। ঘাবড়ে দেওয়া? সয়তানেরও সাধ্য নেই।

পু। কি যে চট্ করে না ভেবেই মত প্রকাশ ক'রে বোস। ওরও কিছু দুর্ব্বলতা থাক্‌তে পারে।

যু। তুমি ওর দুর্ব্বলতার কি জান?

পু। হাঁ হাঁ জানি নয় ত কি বোল্‌ছি।

যু। তাহলে তুমি যখন আমার বন্ধু তখন সবটা নিজেই কর না? এতগুলো কাজ দুজনে কোরছি এখন সব তোমায় আমি জানি। এখন নিজের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তেও তুমি আমার সাহায্য কোরবে।

পু। তোমায় কিন্তু সাহায্য কোরতে হবেই।

যু। আমি কোরব না। আমি জানি তুমি আমার সাহায্য ছাড়াও সব খারাপ কাজ কোরতে পার।

পু। জহুরার অপকার করা খারাপ কাজ। জান ত সে তোমায় পেলে এক্ষুণি পায়ের তলায় ফেলে ঠাসে।

যু। আমাকে সে ধরে বার করবার আগেই আমি গলায় ছুরি দেবো।

পু। সময় যদি না পাও? আত্মহত্যা কোরতে মনের বলের দরকার।

যু। সে বলের জন্য ভেবো না তুমি।

পু। তোমার কি হোয়েছে আজ?

আমার স্ত্রী উদ্ধতস্বরে বলিলেন "আমি তোমার কথা কি আর শুন্‌ব? তুমি ত মহুয়াকে খুন কোরতে বোল্‌বে?"

পু। তুমি ভুল বুঝেছ।

যু। একবার ভুল বুঝেছিলাম। এবার ঠিক বুঝেছি।

পু। এখার দুজনেরই বিপদ। তুমি সাহায্য কোরবে না কি? কোরতে হবে বই কি।

যু। কখনো না।

পু। মহুয়াকে থামাতেই হবে।

যু। না থামালে ক্ষতি কি?

পু। আমার তাকে থামাবার একটা উপায় জানা আছে।

যু। তুমি আপনার উপায় দেখ। আমার তাতে কি?

পু। তোমার আমার সাহায্য কোরতে আমি বাধ্য কোরব।

যু। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গী হ'তে কয়েকবার বাধ্য কোরেছ কিন্তু আর না। এবার এ বাঁধন কাটব।

পুরুষ মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল "ওঃ! সে খুব মজা হবে।"

এবার যুবতী কুপিতা ফণীনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল "আমি আত্মহত্যা কোরব।"

পু। তুমি মর্‌লে বদ্‌নাম রটাবার ভার আমি নেব।

যু। মর্‌লে আমার নামে বদ্‌নাম দেবে? ঠিক্ ঠিক্। এবার নিজমূর্ত্তি প্রকাশ কোরেছ। তোমায় আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

পু। এই ত প্রথম শুন্‌ছি না।

যু। হা ভগবান। তোমার বিশ্বে আমার মত হতভাগী কেউ নেই। তোমায় শত ধন্যবাদ দেব। তুমি আমাকে আমার হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।

পু। কেন তোমার বন্ধুরা তোমায় ত খুব ভালবাসে। তাদের মধ্যে তোমার সুনামও ত যথেষ্ট।

যু। আমি বালির স্তূপে দাঁড়িয়ে। যেদিন সতীশবাবু সব জানবেন কি বোলবেন?

পু। অত তুমি ভেবো না। পরে পস্তাবে। অত বেশী স্বামীর সুখের কথা ভাবলে সে তোমার দিকে তাকাবে না।

যু। আমার এ অবস্থার জন্য তুমি দায়ী। সংসারের লোক জানে আমি সরল বালিকা কিন্তু যেদিন সত্যি কথা প্রচার হবে, সে দিন? হে ভগবান আমার মৃত্যু ভাল?

পু। মেয়েদের ঘ্যান ঘ্যান করবার ক্ষমতা অদ্ভুত। এরকম বাগযুদ্ধে কি লাভ? বরং এসো জহরার বিরুদ্ধে দু'নে পরামর্শ করি।

যু। আমি কোরব না।

পু। কিন্তু কি রকম গুরুতর ব্যাপার জাননা ত? যদি সে তোমাকে খুঁজে পায়?

যু। কি হবে? সোজাসুজি বল, বেশী ঘোর পাঁচ কোর না তুমি ওকে ভয় কর?

পু। পৃথিবীতে আমরা ছাড়া শুধু সে আমাদের কথাটা জানে তাই তাকে ভয় করি।

যু। তুমি তাকে মারবার মতলব এঁটেছ।

পু। কথাটা যদি সত্যই হয়?

যু। তা হলে এই শেষবার বোল্‌ছি আমি কিছু কোর্‌ব না।

পু। এই যে তোমার শেষ মন্তব্য এর জন্য তোমায় পস্তাতে হবে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌ছ।

যু। বেশ সে আমি বুঝব। কিন্তু আজ থেকে আমি তোমার কোন বদ্ মতলবে নেই। আজ রাত্রে একটু আরামে ঘুমতে পারবো।

পু। বেশ দেখা যাবে।

যু। সহসা বেগে গৃহের দিকে চলিল, পুরুষও তাহার অনুসরণ করিল। অগত্যা আমিও অনুসরণ করিলাম। কিছু দূরে দেখিলাম পুরুষমূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া যুবতীকে ব্যগ্রভাবে কি বলিল, কিন্তু পাছে আমার উপস্থিতি ধরা পড়ে সেই ভয়ে আমি কাছে গেলাম না। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার স্ত্রী অদৃশ্য হইয়া গেল আমিও বাসায় ফিরিলাম। প্রভাতে হোটেলওয়ালা বলিল "শুনেছেন খুন হোয়েছে।"

"কোথায়?"

"রাজবাড়ীর বাগানে।"

"রাজবাড়ীর বাগানে খুন ?"

আমি নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে।

হোটেলওয়ালা উত্তেজিত স্বরে বলিল "রাজা বাহাদুর খুন হোয়েছেন।"

"রাজা বাহাদুর ? অসম্ভব।"

"না না সত্যি সত্যি। অদ্ভুত ব্যাপার। সকাল ৬টায় তাঁর লাস পাওয়া গেছে।"

আমি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করায় সে বলিল "পুলিশ সার্জ্জেণ্ট এখুনি চা খেতে এসে সব বোলছিলেন। একজন লোক সকালে পুকুরে মুখ ধুতে গিয়ে দেখে রাজা সেখানে প'ড়ে আছেন। তখন লোকজন ডাকাডাকি করে। তাঁকে কেউ খুন কোরেছে। পুলিশ সার্জ্জেণ্ট বোলছিলেন পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঘাটের উপর ফেলে দেওয়ায় প্রাণ বেরিয়েছে। ঘাটের ওপর ধ্বস্তাধ্বস্তিরও চিহ্ন আছে নাকি। একজন ডাক্তার ডাকা হোয়েছে তিনি বোলেছেন খানিক আগেই প্রাণ বেরিয়েছে। এ অঞ্চলে রাজার শত্রু কেউ ছিল না তবে খুব ভালবাসত না আর রাণীকে কেউ পছন্দ করে না। আপনি ত বাগানে যান নি জায়গাটা বুঝতে পারবেন না, চলুন না, আমার সঙ্গে দেখে আসবেন।"

এতক্ষণে আমার চেতনা হইল। ভাগ্যিস কাল রাত্রে হোটেলওয়ালার তার বোনের কাছে নিমন্ত্রণ ছিল, নয় ত অতরাত্রে খাবার সাজে ফিরিতে দেখিলে না জানি আমার কি দশা হইত। যাহা হউক মতি স্থির করিয়া তাহার সঙ্গে বাগান দেখিতে বাহির হইলাম, পথে সে অনর্গল বকিয়া চলিল। সে বলিল "রাজার শত্রু ত কেউ নেই তবে রাণী যেন কেমনতর। পৃথিবীর সবারি সঙ্গে রাণীর বন্ধুত্ব কেবল রাজা ও রাজার ছেলের সঙ্গে ছাড়া। বড় ঘরের ব্যাপার বোঝা ভার। প্রথম রাণী রাজকন্যা ছিলেন। এঁর বংশের কাউকে লোকে জানে না। দেখুন পুলিশেরা যদি কিছু বুঝতে পারে।"

আমরা পুকুর ঘাটে গেলাম। কাল এই ঘাটেরই পাশ দিয়া যাইবার সময় মানুষের আর্ত্তনাদ-সূচক বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়াছিলাম। বোধহয় রাজাকে মরিবার জন্য আততায়ীরা লুকাইয়াছিল। তারা হয় ত আমাকে রাজা মনে করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিল ওঃ! খুব বাঁচিয়া গিয়াছি। একজন পুলিশ কনষ্টেবল জলের মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছিল সে বলিল রাত্রে রাজা ঘরে শুইয়াছিলেন কিন্তু মৃতদেহে ত সন্ধ্যারই পোষাক। খানিক পরে জানিলাম যে তাঁর সার্টের বহুমূল্য হীরকের বোতামগুলি চুরি গিয়াছে। তাহা হইলে চুরির উদ্দেশ্যেই রাজাকে খুন করা হইয়াছে। কিন্তু রাত্রে এমন নির্জ্জন স্থানে বাড়ী হইতে এতদূরে রাজা কি করিতেছিলেন যাহা হউক বেলা কোথায় দেখ। যাউক। আমি আমার স্ত্রীর প্রথম নামটিই বলিব কারণ সেই নামেই তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশনে গেলাম; শুনিলাম কয়েকজন মহিলা কলিকাতা গিয়াছেন। বেলা তাহা হইলে চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে পুলিশ ইনস্পেক্টর বরাটের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি কলিকাতা হইতে ডিটেক্টিভ পাঠাইবার জন্য তার করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কাছে এই আততায়ীদের সন্ধান নিবার অনুমতি চাহিয়া আমাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন যে কাজের ভার যে ডিটেক্টিভদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহারা অনুমতি দিলে কাজ করিতে পারি তারপর আমি কে, কোথায় থাকি, কি করি সব খবর নিলেন। পরদিন যথাসময়ে ডিটেক্টিভেরা আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তার ও পুলিশ ইনস্পেক্টর সমস্ত ঘটনাটি প্রধান ডিটেক্টিভকে বুঝাইয়া তাঁহার হাতে কাজের ভার সমর্পণ করিয়া আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন "এই ভদ্রলোক আপনাদের সাহায্য কোরতে চান। ইনি একজন বড় ডাক্তার।" প্রধান ডিটেক্টিভ বলিলেন "অচেনা লোকরা অনেক সময় সব মাটি করে দেয় তাই আমার আপত্তি।" আমি খুব সাবধানে কাজ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় তিনি তাঁহার সঙ্গে কাজ করিবার অনুমতি দিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

ক্ষণিক সঙ্গীত।

আমার এ গান তব চরণ-তলায়
ঝরে-পড়া কুসুমের প্রায়
দিনেকে শুকায়।

তবু সে যে বিকশিয়া দিনেকের তরে
তব দুটি চরণের 'পরে
পড়িয়াছে ঝরে

তোমার পরশ-আশী চুম্বন-উন্মুখ
অবশিত দুরু দুরু বুক,—
এই তার সুখ।

সে যে শুধু একদিন আবরি চরণ
বিরচিয়া চারু আস্তরণ
লভেছে মরণ,

এই তো পরব তার, আর কিবা চাই ?
পায়ে তব লভিয়াছে ঠাঁই,
ধন্য সে যে তাই।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

মোগল-সন্ধ্যা।

——:❀:——

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—কারাগার, সময়—রাত্রি, আকাশ গাঢ় মেঘাবৃত, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরণ ও মেঘ গর্জ্জন। জাহান শৃঙ্খলাবদ্ধ পিঞ্জরে।

জাহান। জাহান্দার আমার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়ে খাঁচার পাখী করেছে, ভেবেছে বড়ই শাস্তি দিয়েছি। এ দুনিয়াটাই যে একটা বড় খাঁচা সে কথাটা কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না। বড় মজা সবাই আমরা খাঁচার পাখী কিন্তু এ খাঁচায়ই বসে কেউ বা গায়, কেউ বা হাসে আর কেউ বা চোখের জল ফেলে। (বিদ্যুৎ স্ফুরণ ও গর্জ্জন) উঃ—কি গর্জ্জন! কি আলো! বুঝেছি শিকার আরম্ভ হয়ে গেছে। ঐ যে আবার গর্জ্জন—মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়ে দুষমনটা আবার শিকারে মেতেছে,—হাতে তার শাণিত কৃপাণ, মুখে ক্রুর হাসি। (বিদ্যুৎ) ঐ যে আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝে কৃপাণের উজ্জলতা ঝলসে উঠ্‌ছে, ওর সঙ্গে—তোমার ঐ নিষ্ঠুর কুটিল হাসির খর দীপ্তিটাও মিশিয়ে দিয়েছ?—আমায় ভয় দেখাচ্ছ? কে আছ? আমায় তরবারী দিয়ে যাও, এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা!

(হাতের শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল)

(লয়লার প্রবেশ)

লয়লা। জাহান!

জাহান। কে—কে তুমি?

লয়লা। চিন্‌লে না জাহান? আমি লয়লা।

জাহান। (একটু চিন্তিত ভাবে) লয়লা। এখানে কেন?

লয়লা। তোমায় মুক্ত করতে এসেছি।

জাহান। কি, মুক্ত করতে? মুক্তি কোথায়? এ সংসার একটা ভীষণ কারাগার, এর বাইরে একটা স্থান দেখিতে দিতে পার, যেখানে এ আলো ,এ বাতাস, প্রবেশ করতে পায় না, যেখানে ঘৃণা নেই—ভালবাসাও নেই, শ্রদ্ধা নেই, ভক্তিও নেই—হৃদয় এ শৃঙ্খলের মত শীতল, অসাড়, নিস্পন্দ।

লয়লা। জাহান! বেড়িয়ে এসো। (কারাগারের দরজা খুলিয়া দিয়া) এই যে দরজা খুলে দিয়েছি—চলো যাই।

জাহান। আমায় জাহান্নামের পথ যদি কেউ বলে দিতে পার তবে তাই দাও আমি সেখানেই যাব আর কোথাও না। (বিদ্যুৎ বিকাশ) এই ঝলসিত বিদ্যুতালোকের মাঝে দাঁড়িয়ে কে তুমি? সত্যই কি তুমি লয়লা আমার প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্ন, আমার হৃদয়বীণার প্রথম ঝঙ্কার, আমার যৌবন বসন্তের প্রথম পুষ্প—লয়লা! লয়লা! আজ কেন এসেছ? প্রত্যাখ্যাত জাহানের বেদনা-কাতর মুখের পানে চেয়ে তোমার ঐ বিশ্বভোলানো হাসিটুকু হাস্‌তে?

লয়লা। আর না, জাহান! থামো মিনতি করি। দেরী করো না চলো (প্রহরীর প্রবেশ ও সেলাম করণ) ঐযে প্রহরী বলছে আর সময় নেই চলো।

জাহান। এ মিনতি কেন, লয়লা? আজ দয়া করে আমায় মুক্ত করতে এসেছ? আমি ত দয়া চাই নি। অভিনয় আমার শেষ হয়ে গেছে, তবে আর কেন?

লয়লা। চলো, জাহান! ঐ যে এখন তারা এসে পড়বে—চলো।

জাহান। না, লয়লা! তুমি ফিরে যাও আমি যাব না।

লয়লা। সত্যি তুমি যাবে না? (কারাগৃহের লৌহদণ্ডগুলি ধরিয়া তদুপরি মস্তক স্থাপন করিয়া লয়লা দাঁড়াইয়া রহিল ও কিছুক্ষণ এ ভাবে থাকিয়া বলিয়া উঠিল।) জাহান! তোমায় আমি ভালবাসি।

জাহান। নিষ্ঠুর নারী! আজ উপহাস করতে এসেছ? একদিন উপেক্ষার দাবানলে আমার জীবনটাকে ছারখার করে দিয়ে আজ এসে বলছ "জাহান! তোমায় আমি ভালবাসি। পরিহাস! তীব্র পরিহাস!

লয়লা। না, জাহান! সত্যি—বলছি—।

জাহান। নরলা! আজ তোমার ও সত্যমিথ্যার আমার কিছু আসে যাবে না। পাহাড়ের শিখরের উপর দাঁড়িয়ে আছি—পায়ের নীচে পাতালস্পর্শী তমোময় প্রকাণ্ড গহ্বর হাঁ করে আমার গ্রাস করবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তেই উদ্যত হয়ে আছে—আর তুমি এখন আমার ভালবাসার কথা বলতে এসেছ। বলো আজ জাহান! তোমায় আমি ঘৃণা করি তবেই আমি সুখে মরতে পারব।

নরলা। জাহান! কি বলে তোমায় আজ বোঝাব, বলে দাও ওগো কি করে তোমায় বোঝাব? ঐ যে প্রহরী বলছে সময় শেষ হয়ে গেছে—কি আর করব বাই। জাহান! তোমায় আর ফেরাতে পারলুম না।

(জাহানের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে নরলার প্রস্থান।)

পটপরিবর্ত্তন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—মেবার জয় সমুদ্রের তীরস্থ প্রাসাদের কক্ষ। কক্ষের সম্মুখে জয়সমুদ্র হ্রদ সূর্য্যাস্তের লোহিত রাগে—পশ্চিম আকাশেও গগনচুম্বী হ্রদের শান্তবারি রাশি অনুরঞ্জিত রাণা অমরসিংহ পশ্চিম আকাশকে সমুখে রাখিয়া উপবিষ্ট। মহারাজ অজিতসিংহ ও জয়সিংহ পূর্ব্ব দিকে মুখ রাখিয়া আসনে উপবিষ্ট।

অমরসিংহ। মহারাজ অজিতসিংহ! মোগলের সৌভাগ্য আকাশ ক্রমশঃই গাঢ় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বর্ত্তমান মোগল সম্রাট ফররুকসিয়ার ঔরঙ্গজেবের উপযুক্ত বংশধর! সিংহাসনে বসেই কিনা ঔরঙ্গজেবের প্রদর্শিত জঘন্য রাজনীতির অনুসরণ করে রাজভক্ত রাজপুতজাতির উপর মুণ্ডকর স্থাপন করতে সাহসী হয়েছেন। এখন কি কর্ত্তব্য বলুন? মাথাপেতে এ অবমাননা সহ্য করবেন, না এ অধীনতা পাশ হতে মুক্ত হবার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করবেন? রাজভক্ত রাজপুত হাঁ, এ রাজভক্ত নামটা কেনবার জন্য অনেক ত্যাগ অনেক অপমান স্বীকার করতে হয়েছে।

জয়সিংহ। আপনার আদর্শ জাতি গঠন একটা স্বপ্ন বই কিছুই নয় এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, মহারাণা? আমি পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে মোগলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করুন মহারাণা! এ মুণ্ডকর আমাদের পবিত্র রাজ-ভক্তির শোচনীয় পুরস্কার!

অজিতসিংহ। অম্বররাজ! যে আদর্শ সম্মুখে রেখে—আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছিলাম আমার আজও বিশ্বাস যে আমার সে আদর্শ—স্বপ্ন নয় একটা প্রকাণ্ড বাস্তব। আমার বিফলতায় আমার আদর্শের গৌরব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি, মহারাণা।

অমরসিংহ। আপনার এ কথা খুবই সত্য কিন্তু রাজনীতির প্রথম উপদেশটা এই যে ব্যবস্থা যেন সময়োপযোগী হয় তা পূর্ব্বেই দেখতে হবে। আপনি বর্ত্তমান অবস্থাটা ভাল করে বুঝতে পারেন নি তাই আদর্শ সত্য হয়েও আপনি বিফল হয়েছেন।

অজিতসিংহ। মহারাণা! আমি বিফল হয়েছি হৃদয় নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধতায় ভরে উঠেছে হাহাকারের প্রতিধ্বনি দিক্‌প্রান্তে মিশে গেছে; কিন্তু তবুও যেন মনে হয় এর একটা সার্থকতা আছে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সংগঠনে যুগে যুগে যে মহতী চেষ্টা সমাবদ্ধ হয়েছে—আমরা এ ক্ষুদ্র প্রয়াস তারই অন্তর্গত। হায়! কোন সুদূরে—আমার এ স্বপ্নলোক পূর্ণতার আলোকে আলোকিত হবে? (সম্মুখে উদাস ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) হবে, সত্যই হবে। জয়সিংহ! আজ হয় নি বটে কিন্তু দু তিন শত বছর পরে।

অমরসিংহ। যাই বলুন, মহারাজ! এ অপমান আর সহ্য হয় না। মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে আমি কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। অম্বররাজ! আপনার কি মত?

জয়সিংহ। আমারও সেই ইচ্ছা, মহারাণা।

অমরসিংহ। এই তো ঠিক উপযুক্ত সময়। গুরু নানকের মহামন্ত্রে দীক্ষিত বিক্রান্ত শিখজাতি পঞ্চনদতীরে আপনাদিগকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। বিশাল দক্ষিণাপথে দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা যোগী দলপতির অধীনে আপনাদের কঠোর যথেচ্ছ লুণ্ঠন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা, তাতে আবার গৃহবিবাদ। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংশ অনিবার্য। এ বিধাতার কঠোর বিধান অজিতসিংহ। এ অলঙ্ঘনীয়।

অজিতসিংহ। মহারাণা! আমিও দেখতে পাচ্ছি যে পতন এর সুনিশ্চিত। আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। দেখলাম সম্রাট ফরাকসিয়ার অপরিণত বুদ্ধি তরুণ যুবক মাত্র। হোসেন আলী খাঁ আর আবদুল্লা খাঁ নামে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা; সম্রাট তাদের হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলি স্বরূপ। এই জঘন্য জিজিয়াকরের নিমিত্ত—সম্রাট দায়ী নন। দুরাচার

ঈশ্বর দ্বিতীয় বাটী রাজরক্তে রঞ্জিত করেছে—আর ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করে রাজ্যশাসন করছে।

অমরসিংহ। আমাদের সেই ত্রিবলাত্মিকা সন্ধিপত্র আবার নূতন করে স্বাক্ষর করতে হবে। (সন্ধিপত্র দেখাইয়া) এই যে! এবারকার প্রধান সর্ত্ত এই যে রাজপুতনা আজ হতে স্বাধীন। এই ত্রিবলের মধ্যে কেহই মোগলের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারবে না, দরকার হলে বিপক্ষতাচরণ করে আপনাদের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করবে। আর ঐ অবমাননার নিদর্শন "জিজিয়া" কর্ আমরা আর বহন করব না। এই নিন স্বাক্ষর করুন (জয়সিংহকে প্রদান।)

জয়সিংহ। এত দিন পরে আমরা কর্ত্তব্য অবধারণ করতে পেরেছি।

(স্বাক্ষর করা ও পরে অমরসিংহকে প্রদান)

অমরসিংহ। এই নিন্ মহারাজ—

(অজিতসিংহকে প্রদান)

অজিতসিংহ। (স্বাক্ষর করিয়া মহারাণা অমরসিংহকে প্রদান) তবে এখন ওঠা যাক্, কি বলেন।

অমরসিংহ। হাঁ, সন্ধ্যা হয়ে এল। দেখেছেন অম্বররাজ! রক্তাক্ত বীরের মত সূর্য্যদেব কেমন পশ্চিম আকাশে ঢুলে পড়েছেন।

জয়সিংহ। মহারাণা! ঐ পূবদিকে চেয়ে দেখুন দিকবলয়ের ধারে চন্দ্রদেব কেমন হাসি হাসি মুখে নিশার আগমন প্রতীক্ষা করছেন, এ সন্ধ্যা বড় আশ্চর্য্যের।

অজিতসিংহ। হাঁ অম্বররাজ! এ সন্ধ্যা বড়ই আশ্চর্য্যের—এ মোগলসন্ধ্যা,—একের পতন অপরের উত্থান—এ ঠিক যেন সঙ্গীতের লয়, সাগরে তরঙ্গের খেলা। মোগলের সৌভাগ্য রবি ঐ অস্তমিত আর এ কার উদয় কে জানে—এ কি হিন্দুর!

পটপরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—দিল্লী সমাধিক্ষেত্র। কাল—রাত্রি, আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না। লয়লা এক অঞ্জলি ফুলের মালা লইয়া জাহানের সমাধি মন্দিরের নিকট দণ্ডায়মানা।

গান।

লয়লা। ছিন্নমুকুল ধুলি শয়ান আঁধার ঘন
আকাশ ভুবন
থেমে গেছে গান নিখিলেরি বীণে
রেখে গেছে বিশ প্রাণের কাঁদন
অজানার দেশে গেছে প্রিয়তম
শুনি,—সেথা নাই বিরহ মরণ
ভাল বাসা বাসি বাঁশি হাসিরাশি
মরণে দুজনে মধুর মিলন।

ব্যথা, ব্যথা—শুধু ব্যথার ভরা আমাদের জীবন। যা চাই পাই না, যা পাই তাও আবার হারিয়ে ফেলি,—এ ব্যথা বড়ই গভীর। চোখে জল এনে দেয় না, উচ্ছ্বসিত কান্না এসে কণ্ঠকে অবরোধ করে না—তবুও এ ব্যথা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নার ম্লানিমাটুকুর মত করুণ, একটা ব্যর্থতার আলোয় জীবন কেমন বাণিয়ে ওঠে।

জাহান! জাহান! আমার এ আহ্বান কি জীবন-নদীর ওপারের আকাশটাকে আলোড়িত করে' প্রতিধ্বনি জাগাতে পারবে? কত দূরে তুমি চলে গেছ কত দূরে! এত বড় একটা প্রাণ নিরাশার ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে কত মহৎ, কত বড়। এ পারে বসে সময়ের ঢেউগুলি গুণে গুণে দিন কাটাচ্ছি আর শুধু ভাবছি কবে ওপারে গিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে। সে মিলনের বারতা তোমায় জানাবার জন্য এ মালাটী আজ তোমায় দিতে এসেছি, গ্রহণ করবে কি? এই নাও (বলিয়া জাহানের সমাধির উপর মালা স্থাপন) জাহান! কৈ কণ্ঠে ত বল পাচ্ছি না—তোমার এ নিদ্রা কি করে আজ এ পার থেকে আমি ভাঙ্গাব? দুঃখের জীবন। আমার মত দুঃখিনী আর কে আছে এ সংসারে?

(লালকুমারীর প্রবেশ)

লালকুমারী। আছে বই কি? তোমার চাইতে অনেক বেশী দুঃখিনী, দেখবে? এই যে।

লয়লা। কে ? দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী ইম্‌তিয়াজ ?

লালকুমারী। হাঁ। কিন্তু সে একটা স্বপ্ন ছদিনের জন্য আমায় সুখের আবেশে ডুবিয়ে দিয়ে কোথায় যেন সরে পড়েছে। কোথা হতে একটা ঝড়ো হাওয়া এসে আমার রঙীন, উজ্জ্বল আশার দীপ্তিতে ঝল মল প্রভাত-শিশির-বিন্দুটীকে এক নিমিষে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এ জীবনে কত বিচিত্রতার খেলাই দেখলুম—কখনো জাগরণ আবার কখনও—বা স্বপ্ন। এ যদি শুধু স্বপ্নই হোত, লয়লা। কত শত কল্পনার ফুল বাস্তব হয়ে গন্ধে স্পর্শে রূপে আমার এ জীবন সরোবরে—ফুটে উঠেছিল—আজ সরোবর শূন্য একটীও নেই, সব ঝরে পড়েচে। জন্মেছিলাম সেই সুদূর ইরাণের—নিভৃত ছায়াশ্যামল পল্লী গেহে,—আর এসেছিলাম বিলাসের কুসুম-শয়ন ঐশ্বর্য্যের লীলানিকেতন দিল্লী নগরে সেই প্রথম যৌবনের এক অস্থির উন্মাদনায়, নবীন প্রেমের আকুল আহ্বানে, আর অদৃষ্টের কুটিল ইঙ্গিতে। রূপ যৌবন আর দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির বলে আমি এ ভারত জোড়া সম্রাজ্যটাকে শাসন করবার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলুম—কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। সে রূপ, সে যৌবন এখনও কুসুমিত লতার মত আমায় জড়িয়ে রয়েছে—সে আশা এখনও ঝাড়াবাগির মত দাউ দাউ করে জ্বলছে, তবে আমার সাম্রাজ্য দুটো অকস্মাৎ ছায়াবাজির মত ক্ষণিকের খেলা দেখিয়ে অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেল কেন ? দু দুটো সম্রাজ্য—আমার হয়েছিল। গেল দুটো একই সঙ্গে। যদি একটা থাকত। দিল্লীর সাম্রাজ্য শুধু যদি যেত ভাল, কিন্তু যে হৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী আমি ছিলুম তা হারালুম কেন ? জাহান্দার, নাথ।

(জাহান্দারের সমাধির উপর মস্তক স্থাপন করিয়া—অবস্থান)

লয়লা। তাই বলছিলাম ব্যথাই জগতের প্রাণের সুর। জীবন একটা বিয়োগান্ত নাটক।

যবনিকা পতন ॥

শ্রীঅশ্রুমান দাশ গুপ্ত।
ও
শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গান।

—:o:—

আপনার চরকায় তেল দাও মন,
আপনার চরকায় তেল দাও।
আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম
তা কেন রে ভুলে যাও।
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা
আপন মিনি পায় পোত্তি কোথা ;
কত্তে খুড়োর গঙ্গা যাত্রা
(কেন) বাপ মায় ভাগাড়ে ফেলে দেও।
ভেবে ভেবে পর ভাবনা
আপনার্ পায় কুড়াল মে'রনা ;
কত্তে গিয়ে পরের ধান্ধা
ইষ্ট নাম কেন ভুলে যাও।
সুখের সময় বন্ধু কত
দুঃখের ভাগী কে ব'ল ত ?
তুল্‌তে গাছে অনেক আছে
নামায় না কেউ জেনে নেও।
ছাড় অসার বাহ্ বিচার
লও ভেতরগাঁর সমাচার
আপ্ ভালা সে জগৎ ভালা
এইটু ভেবে বুঝে নেও।

গায় দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা
দেখ্‌ছ স্বপন লাখ টাকা ;
বর্ষা এল টাপুর টুপুর
এই বেলা কুঁড়ে ছেয়ে নেও।
হলে আপন ন চাঙ্গা
কটোরা মে পাবে গঙ্গা।
ছিঁটে ফোঁটা মুখের কথা
আড়ম্বর সব শিকে থোও।
কোন্তে কোন্তে পর কল্পনা
দিন আঁখিরী হয় দেখ না ;
আসল কাজটা গুছিয়ে নিয়ে
নিজের দিনতো কিনে নেও।
ডুবে ডুবে যে জল খায়
শিবের বাপেও টের না পায়।
কথায় চিড়ে ভিজ্‌বে না ভাই
চোখের জলে কামিয়ে নেও।
—গেলে চ'লে বামুন ঘরে
কে ব'লনা আর লাঙ্‌ল ধরে ;
পরের মুখে ঝাল খেয় না
যাচাই ক'রে বাজিয়ে নেও।

পড়েছে যে-চিড়ের ফেরে
　　　কার সাধ্যি তায় উদ্ধার করে ;
দুষ্টে দূরে পরিহরে
　　　চাচা তো আপ্‌নি বাঁচ'ও।

হ'য়েছে যে দিশেহারা
　　　উত্তর যেতে যায় দক্ষিণ পাড়া ;
গাঁয় মানে না আপ্‌নি মোড়ল
　　　কেন মিছে সাজ্‌তে চা'ও।

আপনার বেলা আঁটিসুটি
　　　পরের বেলা দাঁত কপাটি ;
আপন পেটে ময়লা ভ'রে
　　　পরগায় গন্ধে নাক সেঁক্‌টাও।

যার জন্যে কর চুরি
　　　সেই চোর ব'লে দেয় পায় বেরী ;
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি
　　　কে কার আর সেই এক বই পাও।

দীনসেবক—ব্রহ্মানন্দদাস।

রাজতরঙ্গিণী।

—:†:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় তরঙ্গ।

মাতৃগুপ্তের মানসিক উৎকণ্ঠার অবধি না থাকিলেও পথাতিক্রমণে তিনি শ্রান্তি অনুভব করেন নাই। পথি মধ্যে নানা শুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার মন উৎফুল্লিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন কপিনীর কণায় খঞ্জনপক্ষী অবস্থান করিতেছে। অশেষ শাস্ত্রদর্শী কবি মাতৃগুপ্ত এইরূপে বহু শুভ লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আশান্বিত হইলেন এবং দৃঢ় প্রতীতি জন্মল যে মহারাজের আদেশপত্র তাঁহার পক্ষে শুভদ হইবে। তাঁহার মনে হইল কশ্মীর যদ্যপি আমি যৎসামান্য পুরস্কারও প্রাপ্ত হই তাহা হইলেও অন্য দেশের তুলনায় তাহা মূল্যবান বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পথি মধ্যে তাঁহার অন্য প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামীগণ তাঁহাকে সমাদরে আশ্রয় দান করিয়া ও অতিথিসৎকারে তাহার পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হয় নাই, এই প্রকারে বহু পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষ বনস্পতিবহুল বায়ু কম্পিত পত্ররাজি সুশোভিত বৃক্ষরাজিতে শোভায়মান ও মাঙ্গলিক দধি সমুদ্রবৎ শুভ্র হিমগিরি তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। বৃক্ষের রস গন্ধ গঙ্গাধার-শিকরস্নাত মৃদু হিল্লোল মাতৃগুপ্তের নিকট অতি পরিচিত অন্তরঙ্গ বলিয়াই মনে হইল। যেন তাহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই তথায় অবস্থান করিতেছে। ক্রমাবর্ত্তী প্রদেশে পদার্পণ করিয়া তিনি কম্বু নামক সুবৃহৎ ঢক্কা দেখিতে পাইলেন। এই ঢক্কা এক্ষণে সুরপুরে রক্ষিত আছে। অতঃপর মাতৃগুপ্ত বহু জনপূর্ণ ক্রমাবর্ত্তে লোকমুখে অবগত হইলেন যে কাশ্মীরে প্রধান মন্ত্রীগণ তথায় কোন কারণ বশতঃ অবস্থান করিতেছেন। তিনি পথিকের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞাপত্র প্রদান করিতে মন্ত্রিগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহাতেও শুভচিহ্ন সূচিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্য অভ্যুদয়ের সূচনা করিল। কতিপয় পথিক সেই শুভচিহ্নের পরিণাম দর্শন করিতে

তাঁহার অনুগামী হইল। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের দূত সমাগত হইয়াছেন শুনিবামাত্র দ্বারপালগণ ক্ষিপ্রপদে মন্ত্রীগণের নিকট তাঁহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। 'আগন্তুক প্রবেশ করুন, —অনুগ্রহ প্রবেশ করুন' চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ অনুরোধ অভ্যর্থনা লাভ করিয়া অবশেষে মাতৃগুপ্ত সামন্তগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র মন্ত্রীগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে তাঁহার যোগ্য সংকার ও সসম্মান সমাদর করিলেন। মাতৃগুপ্ত তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট হইলে মন্ত্রিগণ অতি বিনীতভাবে তাঁহার প্রতি যথা সম্মান প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয় এক্ষণে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করুন।'

মাতৃগুপ্ত অত্যধিক সমাদরে যেন লজ্জিত হইয়াই মহারাজের আদেশপত্র তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। মন্ত্রিগণ প্রভুর আদেশপত্র পাঠ করণের উদ্দেশ্যে সকলে এক নিভৃতস্থানে গমন করিলেন। পত্র পাঠে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া সত্বর মাতৃগুপ্ত সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিনম্রবদন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনার নামই কি মাতৃগুপ্ত?"

মাতৃগুপ্ত ঈষৎ হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন "হাঁ, মহাশয়, আমারই নাম মাতৃগুপ্ত।"

মন্ত্রীগণ কাল বিলম্ব না করিয়া অভিষেক বস্তু সমূহ আনায়ন করিলেন। তাঁহাদের তৎপরতা দেখিয়া মনে হইল রাজ-অভিষেকের দ্রব্য-সম্ভার যেন পূর্ব্বে হইতেই সংগৃহীত ছিল। বায়ু বিতাড়নে সাগর যেমন উদ্বেলিত চঞ্চল হইয়া নানা প্রকার শব্দের সৃষ্টি করে অসংখ্য জনসঙ্ঘ চন্দ্রণ অভিষেকোৎসবে আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া কোলাহলে স্থানটি মুখরিত চঞ্চল করিয়া তুলিল। অতঃপর মন্ত্রিগণ ও সামন্ত সমূহ সমবেত হইয়া মাতৃগুপ্তকে সুবর্ণ নির্ম্মিত মঙ্গলপীঠ রাজোচিত আসনে বসাইয়া অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করিলেন। অভিষেক-সলিলধারা মাতৃগুপ্তের শিরঃবক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত বক্ষে রেবা নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া ধরণী বক্ষে প্রবহমানা হইল। সে এক অপূর্ব্ব শোভা। এই রূপে আল্পত, সুগন্ধ দ্রব্যে অনুলেপিত ও বহু রত্নঅলঙ্কার মনিরত্নে বিভূষিত, করিয়া প্রজাগণ তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিল এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল, মহারাজ আমরা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট কাশ্মীরের সংরক্ষণ পালনের জন্য জনৈক মহামনা শাসন কর্ত্তা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সম্রাট বিক্রমাদিত্য, মহোদয়কে বহুগুণ সম্পন্ন ও কাশ্মীরের ন্যায় ভূস্বর্গ শাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত

স্থানে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। মহাশয় এক্ষণে আমাদিগের এই রাজ্য পালন করুন। জীব যদিও নিজ কর্ম্মফলে জন্ম লাভ করে তথাপি পিতা মাতাই তাহারা জন্মের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। নিজ কর্ম্মফলে রাজ্যলাভ করিলেও অন্য ব্যক্তিগণও বাহ্যতঃ সেই রাজ্যলাভের কারণ বলা যায়। অদৃষ্টই যখন মূল তখন আপনি কাহারও নিকট বিনয় প্রদর্শনে তিনি আপনার এই সৌভাগ্যের কারণ এইরূপ বলিয়া কখন নিজকে বা আপনার এই মন্ত্রিগণকে লঘু করিবেন না।"

মন্ত্রিগণ এইরূপ নিবেদন করিলে রাজা মাতৃগুপ্ত মনে মনে চিন্তা করিলেন এই সমস্ত অদ্ভুত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সমাদর ও সম্মান তাঁহার সর্ব্ব-সৌভাগ্যের মূল মহারাজা বিক্রমাদিত্যেরই প্রাপ্য ও তাহা স্মরণ করিয়াই বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল মাত্র মৃদু হাস্য করিলেন।

রাজা মাতৃগুপ্ত আত্ম সৌভাগ্যকে সম্মানিত ও প্রকট করিতে অকাতরে ধনরত্নাদি দান করিয়া সেই স্থানে সেই দিন নানা মঙ্গল উৎসবে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট নগর প্রবেশের প্রার্থনা করিলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার রাজ্যদাতা বিক্রমাদিত্যের নিকট নানাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। উপঢৌকন প্রদান কালে তাঁহার মনে হইল পাছে মহারাজা বিক্রমাদিত্য উপহার প্রাপ্তে বিবেচনা না করেন যে নবরাজ্যের ঐশ্বর্য্য উজ্জয়িনীর ঐশ্বর্য্যের তুল্য তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন রাজা মাতৃগুপ্ত প্রভু বিক্রমাদিত্যকে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন। এই আশঙ্কা মাতৃগুপ্তকে লজ্জিত করিল। তিনি তখনই কতিপয় ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া তাহাদের হস্তে অতি অল্প মূল্যের অথচ প্রচুর পরিমাণে উত্তম ফলাদি বিক্রমাদিত্যের নিকট পুনঃ প্রেরণ করিলেন, যেন বলিয়া দিতে মাতৃগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই নহেন, সেবক সম্রাটের নিত্যব্যবহারযোগ্য খাদ্য লইয়া তাঁহারই সমক্ষে সমুপস্থিত।

মাতৃগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অলৌকিক গুণরাশি স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পরিলেন না; এবং একটি শ্লোক রচনা করিয়া জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা প্রভু বিক্রমাদিত্যের সকাশে প্রেরণ করিলেন।

নাকারমুদ্বহসি নৈব বিকত্থসে ত্বং
দিৎসাং ন শূচয়সি মুঞ্চসি সৎফলানি।
নিঃশব্দবর্ষণমিবাম্বুধরস্য রাজন্
সংলক্ষ্যতে ফলত এব তব প্রসাদঃ ॥

হে রাজন্! আপনার অন্তরের ভাব কোনরূপ আকারে প্রকাশ করেন না, কোন বিষয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেন না, দানের অভিলাষ প্রকাশ না করিয়া উত্তম ফল দান করেন জলদের নিঃশব্দে বারিবর্ষণের মত আপনার প্রসাদ কেবল ফলের দ্বারায় সংলক্ষিত হয়।

মাতৃগুপ্ত অতঃপর বিশাল সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজধর্ম্মানুসারে কাশ্মীররাজ্য এরূপভাবে পালন করিতে লাগিলেন যে যেন তিনি পুরুষানুক্রমে ঐ দেই রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার দানের সীমা ছিল না কিন্তু দানেও তাঁহার আত্মইচ্ছা প্রকাশ পাইত। তিনি অন্যের বাক্যে নীত হইতেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ উন্নত ও উচিতকার্য্যে আসক্ত ছিল। ত্যাগশীল মাতৃগুপ্ত প্রচুর দক্ষিণাসহকারে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানের উদ্যোগী হইয়া যখন অবগত হইলেন যে যজ্ঞে বহু পশু হনন করা হইবে অমনি তাঁহার চিত্ত দয়ার্দ্র ও বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি আত্ম-অধিকৃত কাশ্মীরে রাজ আজ্ঞা প্রচারে জীবহত্যা একবারে নিবারিত করিলেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকার্য্যে মাংসের পরিবর্ত্তে মূল্যবান্ সুবর্ণ গুঁড়িকা-সংযুক্ত পিষ্টক প্রদানের ব্যবস্থা হইল। ঈদৃশ ব্যবস্থায় জনসাধারণ অসীম সন্তোষই লাভ করিয়াছিল। গুণবান্ রাজা স্বয়ং সাধারণের দুঃখ কষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সুখান্বেষীদিগের নিকট তিনি মহারাজা বিক্রমাদিত্য অপেক্ষাও সুগম ছিলেন; এবং তাঁহার উদারতা ও দানাধিক্যের জন্য তাঁহার রাজসভায় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভা অপেক্ষাও অধিক লোক আকৃষ্ট হইত। তিনি বিশেষভাবে যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া পণ্ডিতগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন।

একদা মেণ্ট নামক জনৈক কবি তাঁহার সভায় স্বরচিত হয়গ্রীববধ নামক নাটক তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। রাজা গ্রন্থখানির পাঠ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত

ভালমন্দ কোন অভিমতই প্রকাশ করিলেন না কিন্তু গ্রন্থ পাঠ সমাপনান্তে মেণ্ট যখন পুঁথিবন্ধনে উপক্রম করিলেন, মাতৃগুপ্ত তৎকালে গ্রন্থরক্ষার জন্য সুবর্ণ পট্ট প্রদান করিয়া কাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, সামান্য আবরণে রক্ষিত হইলে কাব্য সৌন্দর্য্য বহির্গত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায়ই যেন সুবর্ণ আধার প্রদান করা হইল। কবি ভর্তৃমেণ্ট রাজার গুণগ্রাহিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ ভাবে সৎকৃত হইলেন। অতুল প্রীতির তুলনায় সুবর্ণ পট্ট প্রদান যেন অতিরিক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইল।

এইরূপে কবি মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চারি বৎসর, আট মাস, ঊনত্রিংশ দিন অতিবাহিত করিলেন, অঞ্জনাতনয় প্রবরসেন তীর্থসলিলে পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া কাশ্মীর প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রবরসেন শুনিলেন—মাতৃগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি অসীম বিক্রমে, তাঁহার পৈতৃক রাজ্য কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছে, শ্রবণ মাত্র প্রবরসেন ক্রোধে আত্মহারা হইলেন—রজনীর শিশিরে শিক্ত বৃক্ষপত্র যেমন সূর্য্যোদয়ে প্রখর তপন তেজে অচিরে উষ্ণ হইয়া উঠে তদ্রূপ প্রবরসেনের পিতৃশোকজনিত ব্যাকুলতা ক্রোধ সম্পাতে তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইল। স্বরাজ্য উদ্ধারের মানসে প্রবরসেন শ্রীপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তথায় অশ্বপাদ নামক এক সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়া ফলমূল প্রদানান্তে বলিলেন—হে মহাভাগ! আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বলিয়া দিতেছি। হে সাধক, ভগবান শঙ্কর, তোমাকে কৃতার্থ করিবেন, তুমি যত্নবান হও। এই কথা বলিয়া শৈব সিদ্ধপুরুষ অশ্বপাদ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর প্রবরসেন রাজ্য প্রাপ্তির বাসনায় এক বৎসর তপশ্চরণে শ্রীপর্ব্বতে অতিবাহিত করিলে একদিন স্বয়ং শঙ্করই যেন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস তুমি নিত্য শুদ্ধ মুক্তি না চাহিয়া কেন নশ্বর রাজ্য ভোগ করিতে চাহিতেছ?

ইহার উত্তরে প্রবরসেন ভগবানের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—মহাজনের নিকট সামান্য প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা যেরূপ প্রচুর ফল প্রদান করেন স্বয়ং মহাদেব যেমন পিপাসায় জলের মাত্র অভিলাষকে দুগ্ধ সাগর দান করেন মুক্তির প্রার্থনা না করিলেও শঙ্করের কৃপায় তাহা দুর্লভ নহে। আমার অন্তর মুক্তি প্রয়াসী হইলেও মহাদেব কি আমার মর্ম্মভেদী দারুণ অন্তর্বেদনা ও আমার জ্ঞাতিগণের দারুণ অপমান অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

মহাদেবের ঈপ্সিত বর লাভ করিয়া প্রবরসেন কাশ্মীর যাত্রে সচেষ্ট ; এদিকে কাশ্মীরের মন্ত্রীগণ সে সংবাদ অবগত হইয়া প্রবরসেনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহামনা প্রবরসেন মন্ত্রীগণকে মাতৃগুপ্তের অনিষ্ট সাধনে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; বলিলেন,—হে মন্ত্রীগণ, মাতৃগুপ্তের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র ক্রোধ নাই। গর্ব্বিত বিক্রমাদিত্যকে উচ্ছেদ করিতে আমার চিত্ত উদ্যত। কারণ শত্রু হইলেও যাহারা আক্রমণ ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ তাহাদিগকে ক্লেশ দানে কোন পৌরষ ? বরং যে ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ—তাহার নির্য্যাতনই শোভা পায়। পদ্ম চন্দ্রোদয় সহ্য করিতে পারে না সুতরাং পদ্মের চন্দ্র অপেক্ষা অপ্রিয় কেহ নাই। হস্তী পদ্ম দলিত করে বলিয়া তাহার দন্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়া কোন্ নীতির কার্য্য ? যে ব্যক্তি শক্তিশালী উন্নত সে কখন নিজশক্তি প্রদর্শনের জন্য অযোগ্য পুরুষের সমক্ষে স্পর্দ্ধা করে না। প্রত্যুত যে তাহার যোগ্য তাহার সমক্ষেই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নিজের শৌর্য্য প্রদর্শন করে।

প্রবরসেন আর কাশ্মীরে গমন না করিয়া ত্রিগর্ত্ত দেশ আক্রমণ ও জয় করিলেন। বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রমেই উজ্জয়িনী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই প্রবরসেন শুনিতে পাইলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্য কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বারতা শ্রবণ মাত্রই প্রবরসেন অতিশয় শোকাবিষ্ট হইয়া হেঁট মুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নান আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল। বীর হৃদয় শত্রু হইলেও বীরের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। অতঃপর প্রবরসেন শ্রুত হইলেন, বর্ত্তমান কাশ্মীরেশ্বর মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। হয়ত তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ মাতৃগুপ্তকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি কতিপয় প্রহরীসহ মাতৃগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। যথোপযুক্ত অভিবাদনান্তে প্রবরসেন সবিনয়ে মৃদুভাবে মাতৃগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার রাজ্য ত্যাগের কারণ কি ?

মাতৃগুপ্ত কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"মহারাজ ! যাঁহার অনুগ্রহে আমি কাশ্মীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলাম আজ তিনি স্বর্গে। সূর্য্যকান্ত মণির ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য কাহার প্রভাবে ? দিঙ্মণ্ডল দীপ্তিকারী সূর্য্য কিরণ তাহাতে পতিত

হইলে না তাহার গৌরব—সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলে—সৌরকর হইতে সূর্য্যকান্ত বাঞ্চত হইলে উহা সামান্য প্রস্তর ব্যতীত আর অন্য কি ?"

প্রবরসেন বলিলেন "হে ভূপতি। কেহ কি আপনার কোন অপকার করিয়াছে,—যাহার প্রতীকারে অপারগ হইয়া আপনার সেই প্রভুকে স্মরণ করিয়া অধীর হইতেছেন ?

এই বাক্যে রাজা মাতৃগুপ্ত ক্রোধে উত্তপ্ত হইয়া তাচ্ছিল্যের হাস্যে উত্তর করিলেন—কে আমার অপকার করিতে সাহসী ? আমা-অপেক্ষা কেহ বলশালী হইলেও আমার অপকারে অসমর্থ। যে গুণগ্রাহী রাজা আমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় ভস্মে ঘৃতাহুতি বা অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ রোপণ করেন নাই। যাহারা উপকারীর উপকার স্মরণ করে, যাহারা কৃতজ্ঞতায় অবনত, তাহাদের পক্ষে কি উপকারীর পদানুসরণ করা অস্বাভাবিক ; সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সূর্য্যকান্ত-মণি কি নিষ্প্রভ নয় না ? চন্দ্রের তিরোধানে কি চন্দ্রকান্তমণি কান্তিহীন হয় না ? (আমার সৌভাগ্য সূর্য্যের মূল পুণ্যশ্লোক বিক্রমাদিত্য অন্তর্গত) অতএব এখন আমি শান্তি সুখ লাভের আশায় পুণ্যধাম বারানসীতে গমন করিয়া দ্বিজজনোচিত সর্ব্ব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। এক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অভাবে মণিময় দীপের অন্তর্ধানের ন্যায় আমার নয়নে সমস্ত সংসার তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে অতএব আমি মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ভীত হইতেছি। এরূপ অবস্থায় বিষয় ভোগস্পৃহার অস্তিত্ব কিরূপে আমাতে সম্ভব ?

মাতৃগুপ্তের সময়োপযোগী উক্তি শ্রবণ করিয়া ধীর প্রবরসেনও বিস্মিত হইয়া যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন,—হে ভূপাল মাতা বসুমতি সত্যই রত্নপ্রসবিনী, কেননা তিনি আপনার মত অতি কৃতজ্ঞ মহাত্মা ধার্ম্মিকদিগকে প্রসব করিয়া দীপ্তি প্রাপ্ত ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমিও সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রশংসাভাজন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। কেন না এই সুর্ব হল বিস্তৃত জগতের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই শ্লাঘা ও যোগ্যপাত্র বলিয়া বরণ করিয়া তিনি লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হে ধীর আপনি যদি এই সংসারে আবির্ভাব না হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংসার চিরদিনের মত এই সুউচ্চ কৃতজ্ঞতার আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইত। কৃতজ্ঞতার পথগুলি নিশ্চয়ই বহুদিন রুদ্ধ থাকিত কেন না অ'চাশয় ব্যক্তিগণ উপকার প্রাপ্ত হইলে অনুদারতা বশতঃ মনে করে যে এই

ব্যক্তি যে আমার উপকার করিল ইহা আমারই কর্ম্মফল। তাহা না হইলে ইতঃপূর্ব্বেইত ঐ ব্যক্তির অনুগ্রহে আমি ইহা লাভ করিতে সমর্থ হইতাম। অথবা আমার দ্বারা কোন স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই সে আমার এইরূপ উপকার করিয়াছে; যদ্যপি তাহাই না হইবে কেন তবে সে আমার উপকার করিতে গেল। এ সংসারে কাহারও ত দরিদ্র বন্ধুর অভাব নাই, তাহাকে না সাহায্য করিয়া আমাকে কেন সাহায্য করিবে? নিজে লোভী অতএব তাহার স্বার্থের জন্যই সে আমার উপকার করিয়াছে।

যাঁহারা অতি গুণসম্পন্ন উদারপ্রকৃতি পুণ্যশীল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কেহ সামান্য উপকার করিলেও সেই সৎক্রিয়ার শতশাখা সমুদ্গত হয়, তাঁহারা এরূপ ভাবেই উপকারকে বৃহৎ বলিয়া মনে করেন। হে গুণগ্রাহি! আপনিই যথার্থই গুণীগণের অগ্রগণ্য, জ্ঞানীগণও আপনার প্রশংসায় শতমুখ। সদ্ব্যক্তিগণও পরীক্ষিত মণির ন্যায় আপনাকে সমাদর করিয়া থাকেন। অতএব হে মহান্ গুণবান্ ধার্ম্মিক রাজন্! আপনি আমাদের প্রতি দয়া করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। এক্ষণে আপনি সিংহাসনকে অলঙ্কৃত করিলে গুণবানের প্রতি আমারও যে পক্ষপাতিত্ব আছে, আমিও যে গুণগ্রাহী ইহা জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া আমাকেও যশস্বী করিবে। হে রাজন্! মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনাকে পূর্ব্বে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় যাহা দান করিয়াছিলেন আমিও পুনঃ তাহাই আপনাকে দান করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় আপনার কাশ্মীরকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করুন।

উদার প্রকৃতি রাজা প্রবরসেনের এইরূপ অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতৃগুপ্ত মৃদু হাস্যের সহিত ধীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন 'হে মহারাজ! নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে যে কয়েকটী বর্ণ উচ্চারণ না করিলে ভাব প্রকাশের উপায়ান্তর নাই আমি কিরূপে মহাশয়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইব, যদিও আমি মনে প্রাণে অনুভব করিতেছি যে আপনার ব্যবহার অকৃত্রিম ঔদার্য্যপূর্ণ তথাপি এক্ষণে আমি যাহা আপনার নিকট নিবেদন করিব হয়ত তাহা বিনীত বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। সকল ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব অবস্থার হীন ভাব স্মরণ করে এবং বর্ত্তমানের মাহাত্ম্যও মনে মনে অনুভব করে, অতএব আপনার পূর্ব্বকার অবস্থা আপনার অন্তরে নিশ্চয়ই জাগ্রত হইতেছে এবং আমরা উভয়েই উভয়ের মনোভাব অনুভব করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিমোহিত হইতেছি।

তাহা হইলেই বলুন আমার মত ব্যক্তি একবার মহামতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহেই রাজা হইয়া পুনরায় সেই সম্পদেই পুনঃ আপনার নিকট হইতে ভিক্ষা লইব! কিরূপ করিয়াই বা ঔচত্যকে এককালে ত্যাগ করিব? মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অসাধারণ ঔদার্যকে আমার ন্যায় ব্যক্তি সামান্য ভোগলালসার নিমিত্ত কিরূপে লঘু করিবে! হে নরনাথ, আর এক কথা বিষয় ভোগেই যদি আমার স্পৃহা থাকে তাহা হইলে যতক্ষণ আমার দেহে অভিমান বর্ত্তমান থাকিবে কে সে পর্য্যন্ত আমার সেই ভোগের পথ রোধ করিবে? যেরা। আমার উপকার করিয়াছেন আমি যদি তাহার প্রত্যুপকার না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার স্বকৃত অপরাধের জন্য আমার দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তিনি এক্ষণে মহাপ্রয়ান করিয়াছেন তাঁহার মহিমা অটুট রাখিয়া তাহার গরীমার গৌরবান্বিত হইতে হইলে আমাকে বহু কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে এক্ষণে আমি ভোগ লালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা প্রকাশ করিব।

ইহা বলিয়া মাতৃগুপ্ত নীরব হইলে ভূপতি প্রবরসেন বলিলেন 'মহাশয়, আপনি যখন কর্ত্তব্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভোগলালসা ত্যাগে কৃতকল্প আমিও সেই জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই নিবেদন করিতেছি মহাশয় যত দিন জীবিত থাকিবেন ততদিন আমি এই রাজ্যের ঐশ্বর্য্য সম্পদ আপনারই ইহা জ্ঞানে স্পর্শ করিব না।

অতঃপর সুকৃত মাতৃগুপ্ত গৈরিকবাস সংগ্রহ পূর্ব্বক বারানসী ক্ষেত্রে গমন করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ যতিব্রত অবলম্বন করিলেন। রাজা প্রবরসেনও প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সানন্দচিত্তে কাশ্মীরের উৎপন্ন সমস্ত ধন মাতৃগুপ্তকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণ মাতৃগুপ্ত স্বয়ং ভিক্ষালব্ধ অন্ন মাত্র গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরের সমুদয় অর্থ বিত্ত প্রার্থী-দিগকে দান করিতেন। তিনি এইরূপে আরও দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

ক্রমশঃ—

শ্রী—

স্ত্রী-শিক্ষা।

—:০:—

যে সরস্বতী, যাঁর পায়ের নূপুরে ছন্দ দিনরাত বাঁধা, যেন বেদান্ত সহচরীর মতো যাঁর সেবা করে চলেছে, সুর যাঁর হাতের বীণার গুঞ্জন করে চলেছে কোন দিন বেসুরে বলে না, সেই যে দেবী ভারতী তিনি কি পদ্ধতিতে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তো জানার উপায় নেই! কাছেই রয়েছেন যে সকল ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী তাঁদের সবাইকে কেমন শিক্ষা পদ্ধতি ধরে সুশিক্ষিতা করে তোলা হয়েছিল তার হিসেব কতকটা পরিষ্কার — কেউ তাঁরা আশ্রমের মধ্যে কেউ উত্তরা বাসবদত্তা মালবিকা জেবউন্নিসা — এঁদের মতো অন্তঃপুরে থেকে সুশিক্ষা পাচ্ছেন। শিল্প-শাস্ত্রের মধ্যেও দেখা যায় কুমারী অবস্থা থেকেই এক প্রস্থ কলা বিদ্যায় মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তার পরের যুগে, — অর্থাৎ অল্প দিন আগে দেখা যায় স্ত্রী-শিক্ষাটা গৃহিণী-পনা, পতিকে দেবতা বলে পূজা, এমনি কতকগুলো জিনিষে আটকেছে। অত্যন্ত আধুনিক কথা হল মেয়েরা এম-এ, বি-এ পাশ করছে, নবেল পড়ছে, গান গাইছে, বুট পরতে শিখছে, এবং সাহেবদের সঙ্গে কথা কইতে ও খানা খেতে শিখছে, আস্তে আস্তে পর্দা পার্টিতেও যাওয়া আসা করছে।

ছেলেদের বিদ্যা শেখার দ্বারা বাপকের জীবন-তরীটি চাকরীতে পৌঁছে দিয়ে গেল, এবং মেয়েদের শিক্ষা পাশ করা বর জুটিয়ে দিলে তো বহুৎ আচ্ছা! এই ভাবটা মনে রেখেই শিক্ষা দেওয়াচ্ছি আমরা অধিকাংশ ছেলে মেয়েকে; ছেলেকে চাকরী না করে দিলে সংসার চলবে না সুতরাং তার শিক্ষা যদি সেই দিকেই যায় তো তত দুঃখের কারণ নেই, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা এমন দিতে চল্লেম যে পরে সে যে ঘরের গৃহিণী হবে তার কাজ চালানোর পক্ষে সে একেবারেই অক্ষম রইলো শিক্ষার ফলে এবং তাড়াতাড়ি করে বিয়ে দেওয়ার দরুণ জ্ঞান অর্জ্জনের দিকেও তার অনেকখানি ঘাটতি থেকে গেলে তবে তো গোলযোগ।

সন্তান-পালন মেয়েরা আপনি শেখে, ঘরের কাজ তাদের শাশুড়ীর কাছে কুলাগত গঞ্জনা লাঞ্ছনা খেতে খেতে শিখতে হয়, অনেক আগুনে পুড়ে তবে হয় মেয়ে পাকা গিন্নি, এমন কোন

শিক্ষা তাদের কুমারী অবস্থা থেকেই দেওয়া কি চলে না যাতে করে এই আগুনে পোড়া থেকে তারা রক্ষা পায়!

নভেল-পড়া গিন্নি, সে তো ঘরের কাজে আসে না—আসে ঘর সাজাবার কাজে, তেমন শিক্ষা নাই দিলেম মেয়েদের, এর চেয়ে ঢের ভালো শিক্ষা চাই তবে বলবো মেয়েরা যথার্থ সুশিক্ষা পেলে। সংসারের কাজে সব দিক নিয়ে মেয়েটি সুপটু হলে, মন্দই বা কি নাই শিখলো গান বাজনা নভেল পড়া, চায়ের টেবিলে গাল-গল্প করতে শেখা, এমন কি মহিম্ন স্তব আওড়ানোটা, পতিকে দেবতা বলতে অভ্যাসটাও না হয় নাই হল!

সতী সাবিত্রী এসব মানুষের মন গড়া আদর্শ, সেই আদর্শে আমাদের স্ত্রীশিক্ষা ঠেকেছিল কি না তা জানতে কারু বাকি নেই, তবে সেগুলো এখনো আদর্শ লোকেই রয়েছে—বাস্তব জগৎ থেকে একটু তফাতে না হলে ওগুলোকে এখনো আদর্শ বলি কেন? সত্যি কথা হল সেকালের পাকা গিন্নি এবং একালের আধপাকা পণ্ডিতানী! এই দুয়ের সামঞ্জস্য যে শিক্ষার দ্বারায় হতে পারে সেটা আস্তে আস্তে আপনি আবিষ্কৃত হবে কিন্তু সে শিক্ষাও দু'চার দিনে মেয়েটিকে সুশিক্ষিতা করে দেবে এ আশা করা ভুল। বারো বছরের কোঠা পেরিয়ে অনেকদিন মেয়েকে অবিবাহিতা না রাখলে সুশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না কোন কালেই।

বিলাতে মেয়েদের জন্যে মাষ্টার আসে বই পড়া গান বাজনা শেখা ইত্যাদিতে কিন্তু তার আগে বাপ-মায়ে তাকে সুশিক্ষা দেয় অনেকখানি, এই গৃহ-শিক্ষা কোথায় হচ্ছে আমাদের মেয়েদের? বাপ-মা নিজে যেখানে অশিক্ষিত সেখানে ছেলে-মেয়েও অজ্ঞ, এ তো জানা কথা। আমরা নিজেদের শেখাবো যেদিন সেইদিন ছেলে-মেয়েদেরও কেমন করে শেখাতে হবে, কি বা শেখাতে হবে তা সহজেই বুঝবো। হয় তো বা তখন দেখবো, বালিকা বিদ্যালয় বলে একটি বাজে জিনিষ, দরকারই নেই, ঘরই যথেষ্ট মেয়েদের সুশিক্ষা দিবে!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্র সদনে।

১৯শে আগষ্ট রবিবার সকালে রবীন্দ্রনাথের কলকাতার বাড়ীতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং বর্ত্তমানে দেশের লোকের মনে যে সব প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জেনে আসি।

কবি বল্লেন কিছুদিন রোগে ভুগে তাঁর স্বাস্থ্য অনেকটা ভেঙে পড়েছে। আমিও দেখলাম তিনি অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন কিন্তু দেহটা যদিও শুকিয়েছে মনটা কিন্তু একটুকুও সজীবতা হারায়নি।

কিছুদিন অবধি তাঁর রাজনীতিক মত সাধারণের নিকট তিনি প্রকাশ করেননি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা তিনি বিশেষ মন দিয়ে বিচার করছেন এবং সমস্যার সমাধানকল্পে গভীর চিন্তা নিয়োগ করছেন। আজকার দিনের কতগুলি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে তিনি পরম আগ্রহভরে আলোচনা করলেন এবং সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাব তিনি প্রকাশ করলেন, তা তাঁর অন্তরের আবেগে ভরপুর।

সেদিন তাঁর কাছে যা আমি শুনে এসেছি, তা সাধারণে প্রকাশ করবার অনুমতি আমি তাঁর কাছে চাইনি তবুও নিজের দায়িত্বে আমি তা প্রকাশ করছি, কেননা আমি বিশ্বাস করি যে কবির কথা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। তিনি যে শুধু সূক্ষ্ম বিচারে পারদর্শী তাহাই নয়—দলাদলির বাইরে নিভৃতে থেকে তিনি দেশের অবস্থা যেমন স্থিরভাবে দেখতে পাচ্ছেন—দলাদলির দ্বন্দ্বে যাঁরা মত্ত হয়েছেন তাঁরা তা পাচ্ছেন না।

গড়ার কাজ—রবীন্দ্রনাথ বল্লেন, আমাদের গোড়া থেকেই সবটা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের নিজেদেরই কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। দেশে যে সব সরকারী অনুষ্ঠান হয়েছে, যাতে করে দেশের লোকের উপর সরকারী প্রভুত্বই বেশী করে স্থাপিত হচ্ছে, দেশের

জনসাধারণের মনের ভাব এমন করেই তৈরী করা হচ্ছে যাতে তারা বলতে পারে আমাদের মঙ্গল কামনায় সরকার এত সব কাজ করছেন। সাধারণে অগোচরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে লোকের মনের উপর সরকারের এই যে প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে, এ দূর করে আমাদেরই প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

কি করে আমরা তা করতে পারি? তা করবার প্রকৃষ্ট উপায়ই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের কর্ম্মকুশলতা দিয়ে সরকারী অনুষ্ঠানগুলিকে এমন অকেজো করে ফেলতে হবে, যাতে করে সরকার সেগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

তিনি মোটেও চান না যে, আমাদের সমস্ত উদ্যম নষ্ট করা হোক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করবারই উদ্দেশ্যে আর সেই জন্য বরাবরই তিনি নিজেদের অনুষ্ঠান গড়বার আগেই সরকারী শিক্ষালয় বা অপর অনুষ্ঠান বয়কটের বিরোধী।

কবি তারপর বল্লেন যে তিনি নবীন কংগ্রেস কর্ম্মীদের গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহের কাজ করতে দেখেছেন—সত্যিকার স্থায়ী ভাবের গঠন কার্য্য তাঁরা খুবই কম করেছেন। গত কয়েক বছর যাবৎ যে কাজ হয়েছে তা একেবারেই ভাসা ভাসা তাই এই আন্দোলনও একেবারেই ভাসা ভাসা ধরণের হয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা—কবি তারপর বল্লেন, আজ দেশের সর্ব্বত্রই সব চেয়ে প্রবল ভাবে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে হিন্দুমুসলমান মিলন-সমস্যা। তাঁর মনে হয় যে এখন পর্য্যন্ত নেতারা কার্য্যোপযোগী কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার সকল কেবল বিলাস-স্বপ্নই থেকে যাবে। কারু কারু মনে হিন্দুমুসলমানের মিলনের এমন একটা অস্পষ্ট ভাব রয়েছে, যাতে করে তাঁরা বলতে পারেন যে, বিদেশী প্রভুত্ব লোপ পেলেই মিলন সম্ভবপর হবে। কবির তেমন বিশ্বাস নেই। তিনি বল্লেন, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ ডেমোক্র্যাটিক মুসলমান কেন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় আভিজাত্য-গর্ব্বিত শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুর সঙ্গে এক আসন গ্রহণ করবে? মুসলমান শক্তিমান এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তারা জানে হিন্দু দুর্ব্বল।

মানব স্বভাব আজ যেমন রয়েছে, তাতে করে কবি বিশ্বাস করেন না যে, অহঙ্কার দাবী নয়, মনের উদারতা দিয়েই মুসলমান আজ হিন্দুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করে নেবে!

কবি বল্লেন যে যে মোপ্লা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন চারশ লাখ হিন্দু এক লাখ মুসলমানের ভয়ে ত্রাসাকুল রকমে অভিভূত। হিন্দু আজ এত দুর্ব্বল, এমনি অসহায় ভাবে মুসলমানের দয়ার উপর সে বেঁচে আছে!

“আমি বিশ্বাস করিতে পারি না,” কবি বল্লেন যে “মালাবারে ইংরেজের অবাধ শাসনের অধীনে থেকে যা সম্ভবপর হয়েছে, ইংরেজের শাসন অপসৃত হবার সঙ্গেই তা আর সম্ভবপর হবে না”

হিন্দুমুসলমানের মিলন অসম্ভব-প্রায় করে তুলছে আর একটি যে প্রধান ব্যাপার, তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ নেই। মসলেম জগৎ গঠিত হয়েছিল ধর্ম্মের সৌভ্রাত্র অবলম্বনে আর এই ধর্ম্মের বন্ধনই দুনিয়ার এক প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে অপর প্রান্তের মুসলমানের মিলন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

“আমি অনেক মুসলমান নেতাকে স্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করেছি”, কবি বল্লেন যে, “আফগান বা অপর কোন মুসলমান শক্তি যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহলে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত কি না। জবাব তারা যে দিয়েছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। আমি বলছি, মহম্মদ আলির মত লোকেও বলেছেন যে কোন অবস্থাতেই কোন মুসলমান, যে দেশেই তার জন্ম হোক না কেন, অন্য কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়াবে না।”

আঙ্গোরায় আজ বিরাট এক মোসলেম-শক্তি প্রবল হয়ে উঠছে। খিলাফৎ-আন্দোলন তাকে এই অভ্যুদয়ে অনেকটা শক্তি যুগিয়েছে। এর জন্য আমরা হিন্দুরা ততক্ষণই আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি যতক্ষণ দুই সম্প্রদায়ের সাহচর্য্যে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান হয়।

সমস্যার-সমাধান—এ সমস্যার সমাধান হবে না কেবলমাত্র হিন্দু খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে। অমিলের প্রধান একটা কারণ একটা পরম্পরা বর্ত্তমান।

বাইরের প্রলেপে কিছুই হবে না আর এতদিন পর্যন্ত কেবল আমরা তাই-ই করে আসছি।

"এই সমস্যা" কবি বল্লেন "মানব মনকে এমন করেই গুলিয়ে দেয় যে, সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, হাত পা ছেড়ে দেবার ভাবই প্রবল হয়ে উঠে।

কবি তারপর একটু হেসে বল্লেন—"আমার অনেক সময় মনে হয় এ সমস্যার সমাধান কেবল মাত্র তা হলেই সম্ভবপর হয়, যদি সব হিন্দু মুসলমান হয়ে যায় অথবা সব মুসলমান হিন্দু হয়ে উঠে।"

"তারপর একটু চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন—" একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করে একটা সত্যিকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করে তোলা যায় অন্য কোন ভাবে বা যায় না। এই-খানে আমাদের স্বর্থ এক, আমরা একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।

ক্ষুধা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দু'সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি। হিন্দু আর মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যে অর্থনীতিক অনুষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই কল্যাণ সাধন করবে, সেগুলই ক্রমশঃ দুই সম্প্রদায়ের ভিতরকার ব্যবধান কমিয়ে দেবে এবং মিলনের বেদী গড়ে তুলবে বা আর কোন মতে সম্ভব-পর হবে না।

পল্লী-সংগঠন ব্যাপারে এই ভাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।

হিন্দু মহাসভা—হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্র নাথ বল্লেন কেবল মাত্র রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন পড়ে থাকতে না চায়, তা হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।

"কিন্তু হিন্দুদের এই সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা কি মুসলমানরা সন্দেহের চক্ষে দেখবে না আর তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের অমিলের আর একটা কারণ কি বৃদ্ধি পাবে না?"—এ প্রশ্নের

জবাবে কবি বল্লেন—"হাঁ, তা হবে বৈ কি? কিন্তু সে বিপদের আশঙ্কা আমাদের মেনে নিতেই হবে। মুসলমানের যে স্বাধীনতায় আমরা বাধা দেই নি সে স্বাধীনতা আমাদের প্রাপ্য। তারা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, তারা ইচ্ছামত হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারে আর তারা তা করছে এবং এখনো করচে—আমরা তো কখো না বাধা দিতে দাঁড়াইনি। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাইলে তারা কেন বাধা দেবে?"

কবি তারপর মালকানা রাজপুতদের শুদ্ধি ব্যাপার সম্বন্ধে বল্লেন—"তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, মুসলমান যে স্বাধীনতার দাবী নিজে করছে, ঠিক সেই স্বাধীনতা অপরকে দিতে কেন নারাজ?"

"কিন্তু"—কবি তারপর বল্লেন—হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় কঠিন—যে সব বাধা বিপত্তি আছে তা অতিক্রম করা বড়ই শক্ত। সামাজিক ভেদ-নীতি হিন্দুকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিচ্ছে।

কবি তারপর বল্লেন "আমি আমার জমিদারীতে দেখছি হিন্দু প্রজা কোনরূপ সংস্কারই বরণ করে নিতে পারে না কিন্তু আমার মুসলমান প্রজারা সহজেই সকল সংস্কার আয়ত্ত করে নিতে পারে। ফলে মুসলমান সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাচ্ছে।"

কবি তারপর হিন্দুদের সামাজিক কতগুলি ব্যবস্থার দোষ দেখিয়ে বল্লেন যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হবার কারণ হচ্ছে ওই সব সামাজিক ব্যবস্থা।

প্রায় দু ঘণ্টা আলাপ করার পর আমি কবির নিকট বিদায় গ্রহণ করি। বিদায় দেবার সময় কবি আমায় হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করতে বল্লেন আর বল্লেন যে দেশের নেতাদের সবখানি মন দিয়ে আজ এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করাই দরকার।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

(২য় দফা)

গত ১৪ই ভাদ্র শুক্রবার বিকাল বেলায় হঠাৎ আর একবার রবিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। বিকেলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করছি এমন সময় স্কটিশচার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সেন এসে বল্লেন, চলুন একবার রবিবাবুর বাড়ীতে যাওয়া যাক্। তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই বোলপুর চলে যাবেন, আবার কবে আসবেন ঠিক নেই, একবার মোলাকাত করে আসা যাক্। একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। কারণ আগের বার অরুণবাবু, আমি যাব সে খবরটা রবিবাবুকে দিয়ে রেখেছিলেন। যাঁরা কাজের লোক খবরাখবর না দিয়ে হঠাৎ তাঁদের উপর চড়াও করাটা আমি বরাবরই অপছন্দ করি। কিন্তু অরুণবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি ভরসা দিলেন, যে আমি গেলে রবিবাবু অসন্তুষ্ট হবেন না। যদি হন তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। কাজেই বেরিয়ে পড়লাম।

রবিবাবুর সঙ্গে দেখা হল। কুশল প্রশ্নে জানলাম তিনি ভালই আছেন। বিজলীতে তাঁর গতবারের Interview যা বেরিয়েছিল তার কথা তুল্লেন যে তা ঠিকই হয়েছে। তবে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে আর দুএকটা কথা বলে' তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করতে চান। তিনি বল্লেন যে "হিন্দু মহাসভায় পণ্ডিত মালব্যজী মুসলমান গুণ্ডাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য হিন্দুদের শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক বলেছেন।" আমি তাতে আপত্তি করে বল্লাম যে মালব্যজী ঠিক ও কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন যে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, আততায়ীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার শক্তি মনুষ্য মাত্রেরই থাকা উচিত, এবং হিন্দুদেরও থাকা উচিত। তবে একথা ঠিক নয় যে ও যুক্তপ্রদেশে, বিভিন্নস্থানে, অত্যাচার হিন্দুদের উপরই হয়েছে, এবং হিন্দুরা তার প্রতিরোধ করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অত্যাচার করেছে, একথাটা মালব্যজীর মনে গ্রথিত থাকা অসম্ভব নয়। এবং হিন্দু মহাসভায় যে সব উদ্দেশ্যে আবাহন তার অন্যতম হচ্ছে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করা ও শারীরিক শক্তি ও সাহস অর্জ্জনে তাদের প্রবৃত্ত করা। এই হিসেবে হিন্দু মহাসভায় হিন্দুদিগের শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের কথা পণ্ডিত মালব্য ও অন্যান্য বক্তারা বা

বলেছিলেন তাতে মুসলমানদের কারো কারো মনে এটা উদয় হওয়া বিচিত্র নয় যে হিন্দু-মহাসভা-আন্দোলন মুসলমান বিদ্বেষে দূষিত।

গায়ের জোর—রবিবাবু বল্লেন যে, গায়ের জোর, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, সকলেরই থাকা উচিত এবং তা অর্জ্জন করবার চেষ্টা মনুষ্য মাত্রেরই করা উচিত। শুধু মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন, সর্ব্বপ্রকার আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়তে পারার শক্তি মানব মাত্রেরই থাকা আবশ্যক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই, শুধু গায়ের বল থাকলে বা তা অর্জ্জনের চেষ্টা করলেই সজ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না, অর্থাৎ organisation গড়ে ওঠে না।

পঞ্জাবে বা যুক্তপ্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়, ওরাও ছাতুটাতু খায়। কিন্তু হিন্দুই পড়ে মার খায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই। মুসলমান মুসলমানের ডাকে সাড়া দেয়, হিন্দু দেয় না। মুসলমানের এই organising spirit কোথা থেকে এসেছে? তার ধর্ম্মই তাকে organise করেছে। মুসলমানের ধর্ম্ম সাম্যবাদমূলক। মুসলমানে মুসলমানে যে সহানুভূতি, তার sanction বা বনিয়াদ মুসলমান ধর্ম্মে। হিন্দুর ধর্ম্ম, অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলি বুঝি তা organisaiton এর পরিপন্থী। সাম্যবাদের উপর এ প্রতিষ্ঠিত নয়। সেদিন এক বন্ধু সীমান্ত প্রদেশের এক গল্প বলছিলেন। আফ্রিদীরা প্রায়ই সীমান্তের ব্রিটিশ থানাদের উপর চড়াও করে মেয়ে পুরুষ ধরে নিয়ে যায়। একবার একটি হিন্দুর মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। যে বন্ধু এই গল্প বলেছিলেন তাঁর বাসা এই ঘটনাস্থলের অতি নিকটে ছিল। তিনি দেখলেন যে হিন্দু প্রতিবেশী কেউ মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হ'ল না, তাতে তিনি একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি রকম? আপনারা যে টুঁ শব্দটি করলেন না। তাতে ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন, "উয়োঃ ত বেনিয়াকা লেড়কী!"

কবি বল্লেন এই ত হিন্দুর mentality. মুসলমান কিন্তু কখনও এ রকম জবাব দেবে না।

অস্পৃশ্যতা দোষ—হিন্দুর অস্পৃশ্যতা বা untouchability শুধু দৈহিক বা physical নয়, তার চেয়ে প্রবল হচ্ছে moral untouchability বাংলাদেশে physical untouchability হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ নেই কিন্তু moral untouchability খুবই আছে। বংশে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ সব বর্ণের মধ্যেই আছে।

গান্ধীজী ও মালবীয়জীর ভুল এই হয়েছে যে, তাঁরা মনে করেন—উচ্চ বর্ণের নিম্ন বর্ণ সম্বন্ধে untouchability অর্থাৎ physical untouchability বা দৈহিক অস্পৃশ্যতা দূর করলেই অস্পৃশ্যতা দোষ দূর হবে। অর্থাৎ ডাল পালা কিছু ছাঁট কাট কল্লেই সব ঠিক হয়ে যাবে—সঙ্ঘবদ্ধ বা organised হতে পারবে।" কবি বল্লেন "আমি তা মনে করি নি। হিন্দুদের দুর্ব্বলতার কারণ আরও Fundamental বা মূলগত। হিন্দুসমাজ মানুষের জন্মগত ভেদ ক'রে রেখেছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেওয়া যায় না। জগতে কোনো জাত উন্নতি কর্ত্তে পারে নি যারা পারিবার্শ্বিক অবস্থা বুঝে নিজেদের ধর্ম্মগত বা অভ্যাস-গত আচার ব্যবহার না পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পেরেছে। কবে মনুসংহিতায় সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করে গিয়েছে আর যতই অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক না কেন তাই আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে হবে, এ বিশ্বাস না বদলালে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। অবশ্য সব জাতেরই কতকগুলি সংস্কার আছে এবং সংস্কার-গত আচার ব্যবহার আছে যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখানো যায় না। কিন্তু উন্নতিশীল জাতি মাত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সংস্কার ও আচার ব্যবহার উন্নতির পরিপন্থী তা ত্যাগ করতে পেরেছে। জগতে আমরা অর্থাৎ কেবল হিন্দুরাই তা ত্যাগ কর্ত্তে পারি। তাই আমরা মানুষে মানুষে জন্মগত বা অনৈসর্গিক প্রভেদ, যা হয় ত কোনো কালে, কোনোও উপযুক্ত কারণে বা নিষ্কারণে করা হয়েছিল, তা এখনও বজায় রাখতে চাই। বাস্তবিক ভগবান মানুষে মানুষে এমন কোন ভেদ করে দেন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সত্য সম্বন্ধ তার ব্যতিক্রম কোরে কখনও সত্যিকার মিলন গড়ে উঠতে পারে না।

হিন্দু মহাসভা—কবি বল্লেন যে "হিন্দু মহাসভা যদি হিন্দু সমাজের কীট স্বরূপ, Physical ও Moral untouchability দূর কর্ত্তে পারেন তা হলে, মুসলমানরা চটে গেলেও, কাজের মত এক কাজ হোতো। কিন্তু ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল এই যে হিন্দু মহাসভা তার কিছু কর্ত্তে পাল্লে না। হিন্দু যেখানেই ছিল সেখানেই থাকলো এক পদও অগ্রসর হোলো না অথচ মুসলমানদের চটিয়ে দেওয়া হোলো। এখন যেখানে কুস্তির আখড়া হবে—মুসলমান অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বলবে, ঐ দেখ হিন্দুরা আমাদের মারবার জন্য গায় জোর কচ্ছে।

হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ত্তে হলে তাদের মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি করে জোর কর্ত্তে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঘরের গলদ দূর কর্ত্তে পাল্লে অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা (Physical ও moral) দোষ আছে তা নিরাকরণ কর্ত্তে পাল্লে হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবে। শুধু মাংসপেশী ফোলাবার চেষ্টা কল্লে কিছু হবে না, মুসলমানও হিন্দুদের দেখা-দেখি গায়ের জোর আরও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা কর্ত্তে পারে। এ রকম চেষ্টা ও Counter চেষ্টা কেবল এক vicious circle ঘুরতে থাকবে। তাতে ফল হবে কি? কবি বল্লেন যে "শরীরিক শক্তি মানুষ মাত্রেরই অর্জ্জন করা দরকার সেত চিরন্তন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজদেহের যে ব্যাধি তার কারণ নির্দ্দেশ করে তাই উৎপাটন করার চেষ্টাই হচ্ছে গোড়ার কথা।"

(৩য় দফা)

পল্লী-গঠনে হিন্দু-মুসলমান।

হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় পল্লীসমাজ কি করে গড়া হতে পারে, এবং সেই সমবেত চেষ্টার বনিয়াদে হিন্দু-মুসলমানের সত্যিকার মিলন কি করে হতে পারে কবি তাই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ বল্লেন যে, এ দেশটা বাস্তবিক হিন্দু-মুসলমান, কারুর নয়। কারণ হিন্দু বা মুসলমান কেউ আমরা এদেশের জন্য বিশেষ কিছু করি নি। শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সবারই প্রেরণা আসে বিদেশীর কাছ থেকে। তারাই ব্যবস্থা করে, আমরা ঘাড় পেতে মেনে নিই। তারা রাস্তাঘাট করে দেয়, আমরা চলি। তারা স্কুল খোলে দেয় আমরা পড়ি; তাদের ম্যালেরিয়া তাড়ানোর প্রতীক্ষায় আমরা বসে থাকি। তারা যদি ভাল পানীয় জল সরবরাহ করে, আমরা পান করে বাঁচি, যদি না করে আমরা লাখে লাখে মরি। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে আমাদের কিছু নেই। যদি তা থাকত, তা হলে প্রত্যেকে সেগুলোর জন্য এবং পরে ক দেশের জন্য আমাদের মমতা আসতো।

দেশাত্মবোধ—দেশাত্মবোধ কিসে জাগে? দেশ একটা abstract কিছু নয়। দেশের শত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উপর মমতা থেকেই দেশাত্মবোধ জাগে। মুসলমানের দেশাত্ম-বোধ নেই, সে কথা আগের বারেই বলা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরও যে বিশেষ আছে তা নয়। দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই পল্লীগঠনে মন দিতে হবে। যখন পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় এক বা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে,—তখনই জানবে সাত্যকারের দেশাত্মবোধের সূচনা হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষা করবার জন্য তখন হিন্দু-মুসলমান আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়বে। কবি বল্লেন, "সেদিন যে আমি বলেছিলেম, মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মুসলমানের বাড়ীতে যদি ডাকাত পড়ে এবং সে ডাকাত যদি মুসলমান হয় তাহা হইলেই কি সে মুসলমান ডাকাতের বিরুদ্ধে হাত তোলে না বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না? সেই রকম হিন্দু-মুসলমানের গড়া প্রতিষ্ঠান যদি আক্রান্ত হয় এবং আক্রমণ-কারী যদি মুসলমানও হয় তা হলে তা রক্ষা করবার জন্য মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ হবে না। এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুসলমানরা এসে যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করে, তা হলেও মুসলমান তাকে বাধা দিতে কুণ্ঠিত হবে না। সারা ভারতের পল্লীতে পল্লীতে যখন এই রকম প্রতিষ্ঠান সব গড়ে উঠবে তখন দেখবে সত্যিকার দেশাত্মবোধ জেগেছে। তখন যদি বহিঃশত্রু—মুসলমান—এসে ভারত আক্রমণ করে তাহা হলে, মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মিলে তার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়বে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'এটা কি অসম্ভব যে, বহিঃশত্রু মুসলমান এদেশের মুসল-মানদের বলবে যে এদেশটা জয় করে তোমাদেরই দেওয়া যাবে, হিন্দুদের সঙ্গে কেন সরিকানে দখল করবে? মুসলমানের কাছে তখন কোন্‌টা বড় বলে বোধ হবে? ধর্ম্মের টান, না হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য?"

কবি বল্লেন, "অবশ্য সেটা যে একেবারে অসম্ভব তা আমি বলতে পারেন না। লোকে ক্রোধান্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। ধর্ম্মান্ধ হয়েও নিজের স্বার্থ বলি দিতে পারে। তবে আমি বলি এই যে, এই রকম ভাবে ঐক্য গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো

উপায় দেখছি নে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ঐ রকম সঙ্কটকালে মুসলমানের দেশ অবোধই জয়লাভ করবে।

স্বাদেশিকতা ও পল্লী-গঠন—আমি প্রশ্ন তুললেম যে, যদি ধরেই নেওয়া যায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টায় সংগঠিত পল্লী প্রতিষ্ঠান, উভয় সম্প্রদায়ের আদরের জিনিস হয়ে থাকবে, তা হলেও এতে যাকে আমরা Nationalism বলি তা কি করে হবে, অর্থাৎ—village patriotism কি করে national patriotism-এ transcend করবে? প্রাচীন ভারতেও তো পল্লী-সমাজ ছিল। পল্লীর লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা সকল বা স্বাই করে নিত। কিন্তু তাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা হয় নি এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য সমবেত চেষ্টাও হয় নি। কবি বল্লেন, "আমি যে পল্লী-সংগঠনের কথা বলছি সে isolated পল্লী নয়, পল্লীতে পল্লীতে রীতিমত সংযোগ থাকবে। এক পল্লীর যে জিনিসের অভাব অন্য পল্লী তা পূরণ করবে। প্রাচীন ভারতে যা ছিল সে অন্য রকম, তাতে এক পল্লীর অভাব মোচন হয়ে যা থাকত তা সেই পল্লীতেই ব্যাবৃত হ'ত। এক পল্লীর সহিত অন্য পল্লীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু আমি যে প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি, সে হবে অন্য রকম। কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক organisation হবে এবং সেই organisation আবার বৃহত্তর organisation এর অংশ হবে। প্রত্যেক পল্লীর স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু সে স্বাধীনতার ফলভোগী শুধু সেই পল্লীই হবে না, সব পল্লীই তার অংশ পাবে। একের অভাব অন্যে পূরণ করবে, এই রকম এক সহানুভূতির সূত্রে দেশের সমস্ত পল্লী গ্রথিত হবে। এই প্রকারে Local patriotism থেকে national patriotism-এর স্বাভাবিক বিকাশ হবে। কারণ কোনো এক পল্লীর ক্ষতি হলেই সকল পল্লী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সেই রকম এক পল্লীর সম্পদে অন্য পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হবে। সম্পদ আপদের ঐ ঐক্য বোধ থেকেই সঙ্কীর্ণতা দূর হবে এবং যাকে আপনি village patriotism বলছেন তা national patriotism-এ পরিণত হবে।

সময়ের কথা—আমি বললেম, "কাগজে আপনার এই Scheme বেশ ভালই দেখা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, উৎসাহ উদ্যম ও শক্তি থাকলে ভারতব্যাপী এই রকম মহা অনুষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে সে সব কোথায়? এই বাঙলা দেশের কথাই ধরুন

না কেন। ম্যালেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে গেছে এবং যাচ্ছে। যারা এখনো বেঁচে আছে তারা জীবন্মৃত। এদের দিয়ে আপনি কি মনে করেন যে, এই বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্ভব হবে? সে শক্তি ও সামর্থ্য এদের কোথায়?"

কবি বল্লেন "ওকথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি নে যে, এ কাজ এদেশের লোকের দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় হতে পারে না। আয়র্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদেরও অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল ছিল না। তবুও তারা এই রকম অনুষ্ঠান গড়ে তুলেছিল।" আমি বল্লেম "আয়র্ল্যাণ্ডের কথা বলতে পারিনে, সে দেশের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা হয় হয় কি না তাও জানিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি যে রকম অনুষ্ঠানের কথা বলছেন তা খুব কম জায়গায় করা সম্ভব হবে। এবং অন্যান্য জায়গায় এই সব অনুষ্ঠান কাজে পরিণত করবার বহু পূর্ব্বেই লোক মরে ভূত হয়ে যাবে।"

কবি বল্লেন, "তা হলে আপনি কি কর্ত্তে চান?"

আমি বল্লেম, "আপনার পল্লী-সংগঠন কাজ কর্ত্তে থাকুন তা ভালই। যতদূর করতে পারেন করুন কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এই বিদেশী গবর্ণমেণ্ট যতদিন না আমরা হাত কর্ত্তে পাচ্ছি ততদিন আমাদের গঠনমূলক কার্য্য অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের টাকা নিয়ে পুলিশ মিলিটারী সিভিল সার্ভিস ও বিদেশী ব্যবসাদারের পেট মোটা হচ্ছে আর আমরা পেটের জ্বালায় মারা যাচ্ছি। গবর্ণমেণ্ট আমাদের হাতে এলে ব্যুরোক্রেসির পোষণের জন্য যে টাকাটা যাচ্ছে তা আমরা আমাদের নিজেদের মঙ্গলকর বহু প্রয়োজনে ব্যয় কর্ত্তে পারতাম। দেখুন জাপান কত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যে, বাহুবলে জগতের প্রবল পরাক্রান্ত জাতিদের মধ্যে আসন করে নিয়েছে। যদি জাপানের গবর্ণমেণ্ট বিদেশী হত তা হলে কি বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কোন আশা থাকত?"

কবি বল্লেন "এই গবর্ণমেণ্টকে কি করে আপনি হাত করবেন? যা করে আপনি হাত করবেন—violence-ই হোক বা Non-violent Non-Cooperation-ই হোক, সেটা আমি যে ভাবে কাজ কর্ত্তে বলছি তার চেয়ে অনেক শক্ত।

"গবর্ণমেণ্টকে হাত করা যে শক্ত তা সত্যই কিন্তু আপনার প্রোগ্রামে আমার এই আপত্তি যে, প্রথমতঃ খুব কম জায়গাতেই এটা কার্য্যে পরিণত করা যাবে, এবং দ্বিতীয়তঃ যে সব বাঁধা বিঘ্ন বিপত্তি আছে বা উপস্থিত হবে তাতে কাজ বড় বেশীদূর এগুবে না, আর তৃতীয়তঃ সেটা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ যে, তার পূর্ব্বে এই মরণোন্মুখ জাতির আরও সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হবে। আয়র্ল্যাণ্ডেও, আপনি জানেন যে, শুধু অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কো অপারেটিভ Organisation-এ স্বাধীনতা আসে নি। স্বাধীনতার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন কর্ত্তে হইয়াছিল।"

কবি বল্লেন, "আমি বলছিনে যে, Government হাত করবার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করবার দরকার নেই। আমি বলি এই যে, সে চেষ্টাও হতে থাকুক এবং যাদের temperament আমার মত তাঁরা আমার প্রণালী অনুসারে কাজ করবার চেষ্টা দেখুন।"

আমি বল্লেম, "তথাস্তু; এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।"

এইরূপ বোঝাপড়া হবার পর কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেম।

শ্রীমৃণালকান্তি বসু।

কলাবিদ্যা ও বস্তু-তান্ত্রিকতা।

শৈব-তন্ত্র মতে কলাবিদ্যা ৬৪টী। সে হিসাবে ইহার denotation—অর্থাৎ ব্যাপ্তি প্রসারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগই ধরা পড়ে। চিত্রাঙ্কন, কাব্য-রচনা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, ইত্যাদিই শুধু তান্ত্রিক কলাবিদ্যা নয় পানসাজা, চুলবাঁধা, পানপাওয়া এমন কি বিছানাপাতা, রন্ধন, বন্ধনও ঐ কলাবিদ্যা—চুম্বনও তাই কি না জানি না। জানিবার প্রয়োজনও কম কারণ আমরা ঐ উনকোটী অত শত কলার লীলা নাচাইয়া

দেখাইবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। এখানে আমরা বলিব কলার মৌলিক সত্তা,—যাহা তাহার মর্ম্মের ধর্ম্ম ও বাণী তাহারই কথা—কলা শিল্প বা আর্টের কথাই আমাদের প্রধান আলোচ্য আর তাহার সহিত বস্তুতন্ত্রের সম্বন্ধ কি সেই প্রসঙ্গে তাহাও নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আর্ট হইতেছে অন্তরের উপলব্ধিতে পাওয়া একটী ঋতম্ যাহা সত্যম সুন্দরম্—নিপুণ ভঙ্গিমায় তাহাকে আকার দিয়া রূপের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা। আর্ট একটা বৈচিত্র্য রেখা বিন্যাসের শিল্প কারু;—প্রকাশের রুচির চারু লাঞ্ছনায় সত্যের সুবলিত লীলাভিব্যঞ্জনা। একটী সৃষ্টির কাজ। কিন্তু এই সৃষ্টিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইলে চাই আবার একটা প্রতীক—একখানা কাঠাম। সেই কাঠাম-কঙ্কালের উপর ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, রস, মজ্জা বসাইয়া আর্ট একটী সত্যম সুন্দরম্ গড়িয়া তুলিবে—তারপর আর্টই আনিয়া দিবে Revelataion দৃষ্টি।

এই দৃষ্টিই বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দিয়া বুঝিতে দেয় জানিতে দেয় সেখানে কি ভাবের স্পন্দন কোন দ্রুত তালে কেমন করিয়া নাচিয়া আর্টের সৃষ্টিটাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। আবার এই কাঠামের উপর অবয়ব গড়িয়া তুলিতে হইলেই অস্থি মজ্জার—মাংস পেশী এ সকলের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পুরণ করিতেছে বস্তু—বিষয়—উপলক্ষ্যের আবয়বী সত্তা। সুতরাং আর্টের সহিত বস্তুর একটা অঙ্গাঙ্গিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে—বস্তু লইয়াই আর্ট শিল্প গড়িয়া তোলে।

এখন তাহা হইলে বস্তু-তান্ত্রিকতটা কি? আর্ট যখন তাহার সৃষ্টির মূলে যে বস্তুটী প্রকৃতির বক্ষ হইতে যে ভাবে লইয়াছে সেটীকে ঠিক তাহই রাখে অবিচ্ছিন্ন অসংস্কৃত ভাবে বস্তুর জন্ম, জীবন, মরণের ছেদ ও ক্রমের মধ্যে বিবর্ত্তন নির্দ্দেশক চিহ্নের দিকে লক্ষ্য দৃষ্টি না দিয়া তাহার কোনো অংশ এতটুকুও পরিবর্ত্তন না করিয়া যতখানি সে পুরাপুরি সত্য উপাদান ও উপকরণটীকে একেবারে হুবহু তাই বলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেয় তখনই আর্টের সৃষ্টির কলা হইল বস্তুতান্ত্রিকতা। অর্থাৎ আর্টিষ্ট বা শিল্পী যখন আদিম প্রভাতে প্রথম আদমের মূর্ত্তিটী আঁকিয়া ইভের পার্শ্বে দাঁড় করাইতেছেন—তখন তাঁহার তুলিকা সোজা সরল স্বচ্ছন্দটানে একটা উলঙ্গ মূর্ত্তি বিনা বিচার বিবেচনায় আঁকিয়া তুলিতেছে—নারীর সম্মুখে

উলঙ্গ পুরুষ বলিয়া নীতি বা রুচি বিকারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আদমের অঙ্গে একখানি বসন টানিয়া দিতেছেন না তখনই সে সৃষ্টি হইল বস্তু-তান্ত্রিক। প্রসব ঘরে শিশুর জন্মের সময় মাতৃমূর্ত্তির ছবি আঁকিতে হইলে মাব অঙ্গে কসা বডিস পেটিকোট সেমিজ পরাইয়া দিলে—নীতি বজায় থাকিতে পারে কিন্তু আর্ট ম'ঠে মারা যাইবে। সত্য সেখানে চাপা পড়িবে। যে সত্য উপলব্ধি -যে ঋতম্ শিল্পীকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহা প্রকাশিত হইল না—মিথ্যা লজ্জার আচ্ছাদনে একটা সত্য সুন্দরম্ ঢাকা পড়িয়া রহিল যে সত্যের সৃষ্টিই ছিল—আর্টিষ্টের উদ্দেশ্য মাথা কুটিয়া খুঁজিলেও তাহার সন্ধান আর সেখানে পাওয়া যাইবে না।

তবে কথা হইতেছে—এই দৃষ্ট বস্তুর কোন মতে স্থাপনা করিয়া গেলেই কি আর্টের কাষ শেষ হইল? আর্টের কি আর কোনো কর্ত্তব্যই নাই? আছে। বস্তুকে ঠিক তেমনি করিয়া সোজাসুজি ধরি। দেওয়া ফুট করিয়া তোলা তো সাধারণ ফটোগ্রাফ। বস্তুর ঠিক ফটোগ্রাফটা তুলিয়া ধরা আর্টের প্রকৃত উদ্দেশ্যও নয়—কাজও নয়। আর্ট শুধু নগ্ন নারীর অঙ্গের সম্মুখে ফোকাস করিয়া রাসায়নিক ছবি একখানা তুলিয়া লইয়া ক্ষান্ত হইবে না—সে ফুটাইয়া তুলিয়া দেখাইবে তাহারা অন্তরের রহস্যটা—যে অপরূপ লাঞ্ছনায় ঐ বসনবিহীনতার মধ্যে নারীর নারীত্ব সকল অবয়বের পূর্ণ সৌন্দর্য্য বোধের মধ্যে সত্য সৃষ্টির চরম সার্থকতাটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—সেই স্নিগ্ধ কাজলবিহীন মহিমময় মহত্ত্বটাকে সে নিমন্ত্রণ করিবে সৃষ্টির পুলকের মধ্য দিয়া—শ্রদ্ধার পূর্ণ স্তনখানিকে লালসার নীচ সঙ্কোচতার মধ্যে ডুবাইয়া ধরিবার জন্য আর্ট প্রলোভন সৃষ্টি করিবে না—এ সৃষ্টি ফটোগ্রাফের শিল্পের নয়—প্রকৃত কলার নয়। আবার ফটোগ্রাফও একটা কলা তাহাকেও কিন্তু স্বীকার না করিলে চলিবে না। এই আর্টের পরিচয় আমরা পাইতেছি—রবীন্দ্রনাথের কড়ি কোমলের অনেক কয়টী সনেটে। "স্তনে" কবি বলিতেছেন:—"সুমেরু বটে" "কনক অচল" 'উন্নত সতীর স্তন'—ইত্যাদি—শেষ করিতেছেন স্তনকে এই বলিয়া—

"হের গো কমলাসন-জননী লক্ষ্মীর,
হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।"

"দেবশিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।" বিদ্যাপতির "কনক কটোরা"—বা চণ্ডীদাসের ঐ রকমের মেরুচূড়ার বর্ণনার সঙ্গে—এ কবিতার তফাৎ—এখানে আর্ট অন্বর্থ—আর সেখানে ফটোগ্রাফ মাত্র।

তদুতেঃ—

"ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।"

বলিয়াই কিন্তু "স্মৃতিতে" বলিতেছেন :—

যেন গো আমার তুমি আত্ম-বিস্মরণ
অনন্ত কালের মোর সুখ, দুঃখ, শোক

তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

সত্যকার আর্ট বলিব তাহাকেই যেখানে বস্তু-তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া একটা অনির্দ্দিষ্টের সুন্দরতম ভঙ্গিমার অনন্তের অপরিসীম বিকাশ—একটা অপূর্ব্ব দ্যোতনা সে ফুটাইয়া ধরিবে। বিদ্যাপতি যখন বলিতেছেন ;—

"ধনি অলপ বয়সী বালা
জানি গাঁথলি পুহপ মালা
থোরি দরশনে আশা না পুরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা।"

এখানে আর্ট যদি কিছু থাকে সে রচনা-কলার দিক দিয়া বাস্তব সত্য কথনের মধ্য দিয়া কিন্তু আর্টের যাহা আর্ট সে দিক দিয়া নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখনবলেন ;—

ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি
হতাশ পথিক সেযে আমি সেযে আমি।

সেখানে এই বলিবার ভঙ্গিমাটীর মধ্যে আমরা—পাই একটা অপরূপের নির্দ্দেশ ইহার ছন্দের মধ্যে শুনি অন্য একটা অবাঙ্ময় জগতের দিগ্বালয়ের নীচ রক্ত বরণ অস্ত কিরণের মধ্যে মহিমময়ী পথিক বধূর অন্তর্বেদনার করুণ ধ্বনিটী—সেখানে ঐ বাণীর মধ্য দিয়া আর্ট নিজেই রূপ লইয়া ফুটিয়াছে—ইহার মধ্যে যেন রহিয়াছে একটা inmensite বৃহত্তর বৈচিত্র্যের আভাস। এই বৃহৎকেই আবার বিদ্যাপতিতে পাই;—ওখন শুনি:—

"শুন মাধব, রাধা স্বাধীনা ভেল"

অথবা— জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু

নয়ন না তিরপিত ভেল—

কিন্তু সেখানেও বৃহৎ—এত বৃহৎ নয় যে আমরা ঐ সঙ্গীতের ধ্বনিতে অসীম মুক্তির ছন্দে শুনব; "ক্রন্দ তু জাফা"—সকল অসীমের সংকেত ডাক—সেখানে পাইব—সেই মহিমময় অনুভব—

হাত মাজফের আঁবিনাৎ

এ দে শেজের্দ্দ সোর—

"চলিত বাতাসে মাখামাখি—ভগিনী ভগিনীর চুম্বনের" মধ্যে যাহা পাই—"এ ই" র

Eternal beauty wandering on her way এর মধ্যে যাহা দেখি।—ইহা পড়িয়া মনে হয় না:—'was it a vision or awaking dream—এমন কি Dido stood—upon the wild sea banks and waved her love to come again to carthage—এতটুকুও বুঝি পাওয়া যায় না—তথাপি এখানে একটা বৃহত্ত্বের ভাব আছে, তাহা বিরাট না হইতে পারে কিন্তু বিপুল নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কথা হইতেছে সোজাসুজি যাহা বস্তু-তন্ত্র তাহাকে কি কাব্য-জগৎ হইতে নির্ব্বাসন করিতে হইবে?

"পিঠে আলিঙ্গনে কত সুখ পাব

পানিক পিয়াস চথে কিরে যাব।"

চণ্ডীদাসের— গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী

নাহিতে দেখিনু ঘাটে।

স্নান সারিয়া সে যখন ;—চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি

পরাণ সহিত মোর—

তখন কি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিব না ? "গোপন চুমের জাফরাণি ছোপ" শুধু কি আকাশেই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইব—"ঢল ঢল যৌবন বাঁধা বসনে" রাখিয়া নীল শাড়ীর আড়ালের কিছু মনে করিতেই নাই, সেই কালিদাসের ;—

"শ্রোণিভার দন্তসাগমনাকে খবরদার দেখিতে মানা"

কিম্বা—সেই মৃণালসূত্রান্তর মপি অলভ্যম—বক্ষের পার্শ্বে গৌরবকে ঘৃণা করিয়া বসনে মুখ ঢাকিয়া রহিব ? না। তাহা হইলে ত রসসৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ আছে তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইবে। রসধারার নির্ঝর গতি উপলাহত হইয়া মরিবে।

কাব্যসৃষ্টির গোড়ার কথা হইল রস—সৃজন। আর রস যাহা তাহা বিভিন্ন বস্তুর হইতে পারে কিন্তু তাহার উপলব্ধি ভোগের সার্থকতা তাহার আনন্দ একই !

"নলিনী দলগত জলমতি তরলম্

তদ্বজ্জীবনম্ অতিশয় চপলম্ ।"

ইহা পড়িয়া উপাচার্য্য যে প্রসাদ যে সত্যানুভূতি পাইলেন—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর"—

এ কবিতা পড়িয়া অবিবাহিত তরুণও সেই একই রকমের প্রসাদ ও সার্থকতা বোধ করেন। পরমার্থ সম্ভোগ আর রমণী সম্ভোগের তৃপ্তির মধ্যে রসের দিক দিয়া কোনো প্রভেদ আছে কিনা—খুঁজিয়া দেখার বড়ই কঠিন। আমার তো মনে হয় একটুও প্রভেদ নাই। ঋষি তপস্যায় যে তৃপ্তি পাইতেছেন—ভোগী সম্ভোগে সেই তৃপ্তিই পায়। শ্রুতিও বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না। এই জন্যই বোধ হয় কালিদাস প্রেমের শিশু থাকিলেও তাঁহার মনের কথাই লিখিয়াছিলেন যে—"নীবিবন্ধ উন্মোচন করিলেই আমি মুক্তি লাভ করি—আমার মুক্তির জন্য অন্য তপস্যার প্রয়োজন নাই।" প্রকৃত পক্ষে রসের প্রবাহ সত্য। অনুভব ও উপলব্ধির মধ্যেই সত্যের অস্তিত্ব। আর্ট সেই সত্যকে প্রকট করে।

ঈশ্বর সাধনায় মুক্তি পাইতে হয় ইহা যেমন সনাতন সত্য—যৌবন আসিয়া অঙ্গে জাগিয়া উঠিলে তরুণীর সঙ্গ লাভের উন্মাদনা, তরুণীকে চাহিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রেম করিবার কৌতূহল সেও তো চিরন্তন সত্যই। সুতরাং এ সত্যটাকে বাদ দিয়া শুধু ঐ এক ঈশ্বরই সত্য—জগৎ মিথ্যা, তাহার যা কিছু সব মিথ্যা এই আদর্শ লইয়া চলিলেই বা সংসারের চলে কেমন করিয়া?

এই কারণেই কাব্যের স্রষ্টা যাঁহারা কবি, লেখক বা ঔপন্যাসিক তাঁহারা এই দিকটা সত্যের এই লঘুতর মধুময় দিকটা ধরিয়া চলিয়াছেন। শিল্পী বা কবি যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি অন্য একটা সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার গৃহীত ও কথিত সত্যটাকেই যে একমাত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে চান তা তো নয়।

তিনি প্রামাণ করিতে চান সেটাও একটা সত্য এই মাত্র। নীতিবাদী বলিতে পারেন বটে যে কবি তুমি, নারীর রূপ বর্ণনা করিও না কারণ ইহা মদিরা—লালসার নেশা বাড়াইয়া আনিবে কিন্তু কবি কখন বলেন না যে নীতিবাদি,—চুপ কর তোমার উপদেশে আমার কাজ নাই তোমার সত্য নিয়া তুমি সরিয়া যাও। তিনি বলেন হাঁ।—তুমিও থাক কিন্তু আমাকেও ঘৃণা করিও না আমারও বাণী আছে—আমারও Message আছে—আমিও সেই এক রস স্বরূপ সত্য সনাতন পরম পুরুষের ভাণ্ডার হইতেই বস্তু ও সত্য আনিয়া রস সৃষ্টি করিতে বসিয়াছি। তপস্যাও তাঁরই ইঙ্গিত প্রেমও তাঁর ভাণ্ডারেরই ধন।

এখন কথা হইতেছে বস্তু-তান্ত্রিকতা বা Realism-এর সত্যিকার অর্থ হইতেছে—জিনিষটী যেমন তাহার আকার যেমন, চোখে যাহাকে যা দেখি স্পর্শ করিয়া যাহাকে যেমন অনুভব পাই ঠিক তেমনি করিয়া বস্তুটী ধরিয়া দেওয়া।

আর আমরা আগে বলিয়াছি—আর্টের কাজ সেইটীকে ঠিক সেইটী করিয়া গড়া। এই আর্টের যিনি আর্টিষ্ট আর্টকে যিনি আর্ট বলিয়াই জানেন—তাহার মধ্যে তিনি নৈতিক বিচার বিবেচনা বিধি নিষেধকে টানিয়া আনিয়া আর্টকে অযথা রুচির ভারে ভারাক্রান্ত করেন না। তিনি আপন মনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সৃষ্টিকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। প্রকৃত শিল্পীর রাজ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধ, পাপ অশ্লীলতা ইত্যাদির বিচার নাই। সৃষ্টিকে তিনি

শিবম্ করিয়াই সব কথা গড়িতে চান না—তিনি চান শুধু সুন্দরম্। অভিরাম অপরূপ রাঙ্গনায় তাহাকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতে। শিল্পী সেখানে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নীচ, সঙ্কীর্ণতার অতীত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য যাহা তাহা ভোগের বস্তু হইলেও প্রকৃত শিল্পী নীতির দোহাই দিয়া সে বস্তুকে সত্যের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন না। এই জন্যই শিল্পীকে অনেক সময় নিছক চরিত্র অর্থাৎ গোলাখুলি যেমনটি আমাদের চোখে পড়ে ঠিক তেমনি করিয়া সেইটি খাড়া করিতে হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসি নাট্যকার মোলিয়্যার নাকি নারীচরিত্র লিখিয়া তাঁহার বাড়ীর ধাত্রীকে পড়িয়া শুনাইতেন। সে যেখানে যে-কথাটি বদলাইয়া লিখিতে বলিত—মোলিয়্যার ঠিক তাহাই সেখানে বসাইয়া দিতেন। শ্লীলতা বা অশ্লীলতার তর্ক তুলিয়া চরিত্রটিকে স্ফুট স্বাভাবিকতার মধ্যে যে সত্য আছে তাহাকে নষ্ট করিতেন না। মোলিয়্যারের চরিত্রগুলিতে তাই দেখিতে পাই—একেবারে হুবহু মানুষ—আমাদের চারিপাশে প্রতিদিন যাহাদিগকে দেখি সেই সব লোক—তাহাদের মুখের উচ্চারিত প্রভাত-সন্ধ্যার নিত্য সাবলীল সুখ-দুখের বাণী। মোলিয়্যারের সগানারেল—তার ফাম দো সগানারেল মার্ত্তা—তার স্ত্রী—একেবারে মাটীর সংসারের মানুষ Tere à tere—কাঠুরিয়া সগনারেল। তার স্ত্রী বলিতেছে;—

"পেস্ত দ্যু ফিফে।"

"তোর মড়া মরুক—শিংএ নিস্পে।"

সগানারেল উত্তর দিতেছে—"পেস্ত দা' লা কারোগ্ন—"

"তুই মর মাগি খান্‌কী।"

রুচিবাগীশ মুখ বাঁকাইতে পারেন—স্বামীস্ত্রীর এই রকম আলাপ কথাবার্ত্তা? কিন্তু আর্ট মৃদু হাসিয়া বলিতেছে—হাঁ—স্বামীস্ত্রীর এই কথাবার্ত্তা। কারণ কাঠুরিয়ার ঘরের কথা আমি বলিতেছি যখন কাঠুরিয়া দম্পতিতে ঘরসংসারের কথা লইয়া বিবাদ লাগিয়াছে। যখন কাঠুরিয়া তার স্ত্রীর নিকট হইতে তার নেশার পয়সা বাহির করিতে চাহিতেছে।

Shekespeare এই নীতিতেই Iago গড়িয়াছেন ওথেলোর—সৃষ্টি করিয়াছেন—বুঝিতে দিয়াছেন যে ওথেলো যাহাই হউক না কেন জন্ম হইয়াছিল তাহার বর্ব্বর মুরের ঘরে। রাফেল ম্যাডোনা আঁকিয়াছেন—কিন্তু তরুণীর ছবি আঁকা কি একেবারে পাপ বলিয়া তাহা

হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন? অবনীন্দ্রনাথের মাতৃমূর্ত্তিও আছে মালিনীও আছে। হাফেজের মুক্তির পাশে আছে ওমর খৈয়ামের রক্তরঙীন অঙ্গুর রসের গান—তাঁর—"আয়ু-বিহঙ্গ উড়ে চলে যায়" দেখিয়া তিনি প্রাণের আবেগে ভিক্ষা করিতেছেন। "হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধর।"

শিল্পসূত্রের এই নজীরেই শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী, সাবিত্রী আবার বিন্দু ও গুণী দা। বিনোদ বৌঠানের চুম্বন পিপাসা-কাতর প্রসারিত ওষ্ঠ যুগল রবীন্দ্রনাথ—বিহারীর সম্মুখে ধরিয়াছেন—কারণ তাহা ধরিবার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিধবার কামনাকে কি আর তুমি নিয়মের শাসন দিয়া মানাইয়া থামাইয়া রাখিতে পার—সেষে সত্য। কিন্তু অপরাধ তো কিছু তাতে করেন নাই শিল্পী—বিহারী যে সে ওষ্ঠযুগল—প্রত্যাখ্যান করিল। আবার সেই বিহারীই আশা বৌঠানকে মনে মনে যদিও—কিন্তু ভাল না বাসিয়া যদিও সে মহীনদার বিবাহিতা স্ত্রী—পারিল না,—ইহাও সত্য। বিহারী মহৎ শিক্ষিত, তাই সে তার কামনাকে সংযমে দমাইয়া আনিল কিন্তু বিনোদিনী কিছুটা যেন—প্রাকৃত। কিন্তু প্রাকৃত বলিয়াই সে প্রকৃত যে নয়—তাহা নহে। বরং বিনোদিনীই তুলনায় বেশী প্রকৃত। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত রকম নীতি ঔষধই ব্যবস্থা করুন না কেন—সাহিত্য তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারিবে না। তাঁর তিক্ত অ্যালোপ্যাথি অনেকের কাছে ফলপ্রদ ও অব্যর্থ বলিয়া লাগিবে না—অনেকে হয় ত ইউনানী হাকিমী মতে মিঠা ঔষধে পুষ্ট কুন্দীস্তানের তুর্কী মেয়ে—কুর্ত্তিপরা গায়—দেখিতে চাহবে—তার আঁট-কাঁচুলির ভাবে বিভোর হইয়া যাইবে। কারণ শুধু নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চন্দ্রশেখরকে লইয়া পৃথিবী নয়, সেখানে শৈবলিনিও আছে প্রতাপও আছে। নাট হামশনের Hungerকে যদি নীতির নিক্তিতে ওজন করিয়া লইতে হয়—তবে নোবেল প্রাইজ পায় কে? জুডারম্যানের Song of songs যদি বিশ্বসাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত হয় তবে এ রাজ্যে থাকে কার কি? টলষ্টয়—ঋষি—কিন্তু Realismকে কি তিনি তুচ্ছ করিতে পারিয়াছেন?

সুতরাং ইন্দ্রিয়কে চাপিয়া মারিয়া—অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে গেলে শিল্পীর চলিবে না—সাধকের চলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু সাধনাই জগতের একমাত্র সত্য নয়। লেখক

হইতেছেন একাধারে সঙ্গীতবিদ্ চিত্রকর—আর বাণীর স্রষ্টা। তাঁর রচনার মধ্যে সুর, রূপ, অক্ষর তিনেরই সন্ধান পাওয়া চাই। তিনি শুধু তুরীয়ের তীর্থযাত্রায় শূন্যবিহার করিতে চান যদি—তবে তাঁহাকে নিতান্তই ব্যর্থ হইতে হইবে। তিনি ভোগের মধ্যে দিয়াছেন ত্যাগ আর ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই অতীন্দ্রিয়ের নির্ব্বিকার বিভূতি লাভ করিবেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রতীক্ষমানা।

(১)

বিদায় বেলার হতাশ কাঁদন গুম্‌রে মরে
হিয়ার পরে,
হায় গো উদাস পথিক প্রিয় অশ্রুর ধারায়
নয়ন ঝরে;
কণ্ঠে আমার নাই যে ভাষা মনের বেদন
কইতে নারি—
লুটাই ধুলায় ক্রৌঞ্চী সমান বক্ষে বাজে
আঘাত তারি;
কাল সারথির রথের চাকা ঘর্ঘরি যায়
ধরার বুকে,
বিফল যে মোর সকল পূজা হায় প্রিয়তম
তোমার দুখে!

(২)

বাদ্‌লা হাওয়া লাগায় কাঁপন জাগায় ব্যথা
চিরন্তন,
তড়িৎ শিখায় বজ্র রবে গর্জ্জে মরুৎ
সরিৎ বন ;
নীড় হারা মোর মন-বিহগী অন্তঃ বিহীন
অন্ধকারে—
খুঁজ্‌ছে কেবল আপন সাথী দিগন্তরের
সুদূর পারে ;
শঙ্কা-সরস নেইকো আমার নেইকো প্রিয়
মরণ ভয়,
জানি তোমার অমল পরশ করে সকল
বাঁধন ক্ষয় !

(৩)

তরুণ হাসির অরুণ আলো লুটিয়ে পড়ে
আঁখির ভায়,
প্রথম চুমোর পরশ কাঁপন শিউরে উঠে
সকল গায় ;
আজও রণে অন্তরে মোর কুণ্ঠা কাতর
বিদায় বাণী—
কণ্টকিছে ক্লিস্ট জীবন স্মৃতির কাঁটায়
বেদন হানি ;
শূন্য আমার বাসক শয়ন সঙ্গী বিহীন
দিবস রাতি,
নিমেষ-হারা পথ চেয়ে রই হায় প্রিয়তম
পরাণ-সাথী !

শ্রীসরোজকুমার সেন।

মরণ আড়াল।

—:০:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একি ব্যবস্থা তোমার। মধ্য পথেই একদম পূর্ণচ্ছেদ—দাঁড়ি। প্রলয়ের বিষাণে জাগ্রত হইয়া যুদ্ধ সজ্জার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ। বিন্দুতে মহা-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত করাইয়া গর্জ্জনেই প্রভঞ্জনের লয়, প্রতিহিংসার বাড়বাগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতে না করিতেই তাহার মহা-নির্ব্বাণের ব্যবস্থা! অসহ্য! এ ব্যবস্থা অসহ্য! মহা শত্রু যে,—জীবনের জীবন্ত মূর্ত্তিমান শনি যে, যে আমার সুখের পথে কণ্টক—তাহাকে করিতে হইবে ক্ষমা! হৃদয় উৎসারিত করিয়া আমার যাহা কিছু অর্পণ করিতে হইবে তাহার মঙ্গল উদ্দেশে! অসম্ভব! এত মহৎ আমি নই যে অবতারের গৌরব-লালসায় আমি প্রলুব্ধ হইব! রক্ত মাংসে গঠিত এ দেহ,—বক্ষের শোণিত এখনো শত্রুর অত্যাচারে, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির আলোড়নে টক্ বক্ করিয়া ফুটিতেছে,—আর আমি করিব শত্রুকে ক্ষমা! কি কঠোর নির্ম্মম আদেশ। অপরাধীকে ক্রোড় দিতে,—প্রশ্রয় দিতে—আরও দলিত করিতে চাও উৎপীড়িতকে! দয়াময় নাকি তুমি? সর্ব্বদর্শী বিচারক নাকি তুমি? এই কি বিচার আদালতের বিচারক একবার মিথ্যা সাক্ষ্যে দিশাহারা হইয়া জেলে পুরিয়াছিল আমাকে—সহ্য হইয়াছে তাহা; আর সর্ব্বদর্শী তুমি—কোন মোহে আত্মহারা হইয়াছ আজ তাহা অপেক্ষাও এ কঠোর—শাস্তির বিধান করিতেছ! মন চাহিতেছে যাহার মুণ্ডপাত—সেই রাজচন্দ্রকে করিতে হইবে ক্ষমা! প্রতিহিংসার সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া আমার উপরই প্রতিহিংসার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে দেবতা! ধিক সমাজ, ধিক সংস্কারে, সমাজের বিধানেই না আজ দুরাত্মা রাজচন্দ্র নিভার ন্যায় দেবী-প্রতিমার স্বামী! ঐ এক সর্ব্বকলুষনাশিনী গঙ্গার সম্মিলনে পাপাত্মার সমস্ত দুষ্কার্য্য আমার চক্ষে আজ দোষ আখ্যার অতীত,—রাজচন্দ্র ক্ষমার্হ! মহাশত্রু হইয়াও রক্ষণীয়!

ভাবিয়াছিলাম আপদের শান্তি হইবে সহজেই! আব্বাসই রাজচন্দ্রকে একদিন শেষ করিবে। তাহারই সুব্যবস্থা করিবার জন্যই আরও আগ্রহে এখানে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম,—কিন্তু শেষ—সব শেষ! রাজচন্দ্র অবধ্য! পাষণ্ডের মতি পরিবর্ত্তিত হইবার নয় কিন্তু উহার গতি ফিরাইতে হইবে! নরহরিদা, না, বলিল—'পাষণ্ডের হাত পড়লে যা হয়'—সেই দশা হইয়াছে নিভার, ছেলেটী পর্য্যন্ত তার অনাদৃত। নিভার অদৃষ্টে লেখা ছিল অবশেষে এই!

নিভাকে একবার দেখিবার জন্য মন অধীর হইয়া উঠিল,—এতদিন পরে, এত কাছে আসিয়াও তাকে না দেখিয়া যাইব,—এ সুযোগে দেখা না হইলে এ জীবনে আর দেখা হইবে কিনা কে জানে! যে জীবন আমার—বিপদ পদে পদে!

কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া বলিলাম, "নরহরিদা নিভার সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে! কতকাল দেখি নি! বাড়ীতে ওদের আর কে আছে? বুঝ্‌ছই ত সকলেই সামনে আমার দেখা করারও উপায় নেই—অথচ দেখা ত করতেই হবে!"

বৃদ্ধ বলিল "বাড়ীতে ওদের বড় কেউ নেই,—একটা চাকরাণী! কিন্তু এবারে না হয় দেখা না-ই করলে,—বুঝতেই ত পারছ জানাজানিটা সুবিধের হবে না! রাজচন্দ্র তোমার বন্ধু নয়—তার বাড়ী ত......।"

আমি বলিলাম—"হ'ক না তাতে কি,…।" বলিতে যাইতেছিলাম—'রাজচন্দ্র উপস্থিত নাই'—কথাটা ভাবিতেই অন্তরে কে কষাঘাত করিল—অন্যের গৃহে তাহার অনুপস্থির সুযোগ লইয়া উপস্থিত হইব—নিভা যে পর-স্ত্রী! মন দৃঢ় করিলাম—নিভা,—আমার বাল্য সঙ্গিনী স্নেহের নিভা—হক সে পর-স্ত্রী—আমারও যে সংসারের প্রিয়তম বস্তু,—তার সামীপ্য লাভে হইবে আমার অপরাধ!"

একটু থামিয়া বলিলাম—"তাতে কি,—নরহরিদা, নিভার সঙ্গে আমার সাক্ষাতে দোষের কি হতে পারে, আমার নিজের বোন থাকলে কি এ অবস্থায়ও দেখা না করে ফিরতে পারতেম নিভা কি আমার বোনের চেয়ে কোন অংশে কম!"

বৃদ্ধ বলিল—"যা ভাল বোঝ ভাই! আমার ত বড় ভয় হয়,—ভুলে যাচ্ছ কেন রাজচন্দ্রের পূর্ব্বাপর ব্যবহার সে বিপদ আজও কাটে নি!"

বলিলাম—"ভুলিনি নরহরিদা, কিন্তু ভুলে যেতে হবে—এই নিভার জন্যই ভুলে যেতে হবে,—ও যাই করুক, আমি আর ওর অপকারের মধ্যে নাই,—লোকটাকে সুপথে আনতে হবে—নৈলে নিভার যে সুখ নেই!"

"রাজচন্দ্র আসবে সুপথে! নিভার হবে সুখ!"

নিভা এমনি বিপন্ন উপায় নাই,—তাহাকে সুখী করিবার পথ নাই—এ সমাজে অদৃষ্টই প্রবল,—শক্তি যেখানে একবারে শক্তিহীন পরমুখাপেক্ষী সেখানে আবার পুরুষকার! মন দমিলেও নিরাশ হইলাম না। আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ বাধা দিল না। উপস্থিত হইলাম রাজচন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখে। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ—ডাকিলাম—"কে আছ? নিভা! নিভা!"

দ্বার খুলিতেই দেখি—নিভা! আমাকে প্রণাম করিল,—পায়ে হাত থাকিতেই জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ বিনোদ দা'!"

বলিলাম—"কেমন আছিস্ নিভা। এত কাল পরে চিনতে পেরেছিস্—ভুলিস্ নি তা হলে আমায়!"

নিভা কোন উত্তর দিল না।

বলিলাম "বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস নিভা!"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "হয়ে থাকি ত ভাল কথা! শরীর কি আর চিরদিনই এক রকম থাকবে যাক ও কথা,—তুমি এসেছ কবে,—এখন ত এখানেই থাকবে!"

বুঝিলাম নিভা শুনিতে কি চায়—কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা ত এক কথায় বলিবার নয়,—বুঝাইবারও নয়। বলিলাম—"নিভা—জন্মভূমিতে বাস করবার অদৃষ্ট নিয়ে জন্মিনি বোন—জেনে রাখ, আমি আজও কয়েদী—পলাতক কয়েদী, কেবল তোকে দেখব বলেই এখানে এ অবস্থাতে এসেছি!"

অকম্পিত কণ্ঠে নিভা উত্তর করিল—"দেখা ত হয়েছে—এখন তা হলে আর তোমার আপশোষ নেই,—এখানের কাজও শেষ হয়েছে বোধ হয়—বিনোদ দা!"

কি নির্ম্মম উত্তর—এই কি নিভা! বলিলাম—"আমি আসায় বিরক্ত হয়েছিস নাকি নিভা! তুই আমার কে ভুলে গেলি বোন! আমার যে কেউ নাই নিভা!"

এবারে সে আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মাটিতে বসিয়া পড়িল! "কেন আর সে কথা মনে কর দাদা, যা হবার হয়েছে—ভাল যাও ভাই! জেনে যাও আমি বেশ আছি—সুখে আছি—আমি সন্তানের মা আমার আর অভাব কি!"

একটু থামিয়া বলিল "আর এখানে অপেক্ষা কর না বিনোদ দা—ওরা এখানে এসেছে,—বাজারে গেছে—কখন বা আবার এসে পড়বে--তা হলেই বিপদ! শত দোষী তোমার চরণে,—ক্ষমা কর দাদা,—ছোট বোনের দোষ নিও না!"

মনে মনে বলিলাম "দোষ নেব তোমার!" বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া বিদায় লইলাম। বিদায় বাক্য উচ্চারণেরও শক্তি হইল না! নিভার সন্তানকে পর্য্যন্ত দেখিবারও ভাগ্য হইল না। রাজচন্দ্র আসিয়াছে—শত্রুর পথ পরিষ্কার করিয়া অন্তর্হিত হইতে হইল আমাকে,—সেই শত্রুই আমার রক্ষণীয়।

বিদায় কালে কর্ণে আসিল, চাপা ক্রন্দনের দীর্ঘশ্বাস কি মর্ম্মভেদ বেদনা। সহ্য হয় না আর! দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক!

স্নেহের হ'ক জয়।

ক্রমশঃ